ছন্দ

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -সম্পাদিত
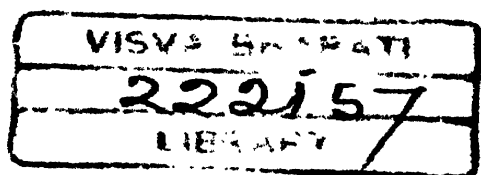
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

বিজ্ঞপ্তি

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যত কিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা গেল। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আমার কিছু তর্ক প্রাসঙ্গিক হয়েছে, এবং তাঁদের যুক্তি ও উত্তর এই গ্রন্থে সংকলিত করেছি। এই উপলক্ষ্যে বলা আবশ্যক, বাংলা ছন্দের বিচারে তাঁদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে থাকি। তাঁদের সঙ্গে কিছু কিছু মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কৃতজ্ঞতাকে আমি সম্মান করি। ইতি ২০ শ্রাবণ

১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

প্রকাশকের নিবেদন

'ছন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকসমাজের কাছে আশাতীত সমাদর লাভ করেছিল। ফলে ওই সংস্করণ অতি অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু নানা অনতিক্রম্য বাধায় তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রণে বিলম্ব ঘটায় বইখানি যথা-সময়ে পুনঃপ্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। এ দিকে নানা শ্রেণীর পাঠকের প্রবল চাহিদা বেড়েই চলেছে। তাই আর কালব্যয় না করে বর্তমানে আংশিক গ্রন্থপরিচয় সহ মূলগ্রন্থখানি প্রকাশ করা গেল। তার সঙ্গে একটি বিস্তৃত নির্দেশিকাও (শুধু মূলগ্রন্থের) যুক্ত হল। আশা করি তাতে আগ্রহী পাঠকের আশুপ্রয়োজন মিটবে। তা ছাড়া, বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থের সর্বাংশেই প্রভূত উন্নতিসাধনের যে প্রয়াস করা গিয়েছে তার ফলে এটি উৎসুক পাঠকের প্রত্যাশাপূরণে অধিকতর সহায়ক হবে, এমন আশা করাও অন্যায় নয়।

গ্রন্থপরিচয়ের বাকি অংশ (পাঠপরিচয় : দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব, পাণ্ডু-লিপি-পরিচয়, দৃষ্টান্ত-পরিচয়, উদ্ধৃতি-পরিচয়, সংজ্ঞা-পরিচয়) সহ পূর্ণাঙ্গ পুস্তক সত্বর প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গ্রন্থপ্রকাশে এই অনিবার্য বিলম্বের জন্য পাঠকসমাজের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

জানুআরি ১৯৭৬

সম্পাদকের নিবেদন

তৃতীয় সংস্করণ

আমার বিবেচনায় এই গ্রন্থসম্পাদনই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ, সর্বাধিক আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের ফল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিকতম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

অন্ততঃ ষাট বৎসরের অনুচিন্তন ও অধ্যবসায়ের পরিণাম হিসাবে 'ছন্দ' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। ১৯১৪ সালে 'বাংলা ছন্দ' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রপ্রবন্ধ (সবুজপত্র ১৩২১ বৈশাখ) পড়ে তাঁর ছন্দচিন্তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় স্থাপিত হয়। তার পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিল্প সম্বন্ধে আমার চিন্তা উদ্রিক্ত হয়েছিল আমাদের ইস্কুল-পাঠ্য পুস্তকে সংকলিত 'শরতে বঙ্গভূমি' নামে তাঁর একটি কবিতা পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার চিন্তা তখন সবেমাত্র অঙ্কুরিত, রীতিমত রূপ ধরে উঠতে আরও কয়েক বৎসর সময় লেগেছিল। সে চিন্তা সক্রিয় হয়ে আপন পথে চলতে শুরু করে ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার প্রবর্তনায়। সে সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে আমার চিন্তা এবং কবির ছন্দচিন্তা সম্বন্ধে আমার উপলব্ধি, এই দুই ধারা সমান্তরালভাবে চলতে থাকে ক্রমবর্ধমান পরিসরে ও গভীরতায়। তারই পরিণামে কালক্রমে প্রকাশিত হয় আমার 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৩৫২ আষাঢ়) এবং রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৯ কার্তিক), এই যুগল গ্রন্থ। 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশের দায়িত্বগ্রহণ এবং আমার উপরে 'ছন্দ' গ্রন্থ সম্পাদনের দায়িত্ব-অর্পণ, এই উভয় কারণেই আমি বিশ্বভারতীর কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

'ছন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পরেও আমার মন তৃপ্ত হয় নি। এটির অনেক অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ত্বরিত প্রকাশের তাড়ায় এটিকে তখন আশানুরূপ পূর্ণতা দানের অবকাশ পাওয়া যায় নি। এই তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ ও দায়িত্বমুক্ত বলে বোধ

করেছি। শুধু মূলগ্রন্থ নয়, গ্রন্থপরিচয় অংশটিকেও পুনর্বিন্যস্ত ও যথাভীষ্ট সমগ্রতাদানে চেষ্টিত হয়েছি।

বর্তমান সংস্করণের বিশিষ্টতা কি কি, তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে গ্রন্থপরিচয়-বিভাগের 'মুখবন্ধ' অংশে। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই সংস্করণে মূলগ্রন্থের আয়তন বেশি বাড়ে নি। নয়টি মাত্র রচনা এবার প্রথম সংকলিত হল। আয়তন বেশি না বাড়লেও নূতন বিন্যাসব্যবস্থায় ও অন্য নানাভাবে গ্রন্থের উপযোগিতা বহুল্ পরিমাণে বেড়েছে বলেই আমার ধারণা। আশা করি রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার স্বরূপ উপলব্ধি ও তার বিবর্তনধারা অনুধাবনের পক্ষে এই সংস্করণ অনেক বেশি সহায়ক হবে। মোট কথা, বর্তমান সম্পাদনার ফলে 'ছন্দ' গ্রন্থের এই তৃতীয় সংস্করণ পূর্ববর্তী সংস্করণের তুলনায় সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ বলেই বিবেচিত হতে পারে— অবশ্য উপস্থাপনগত উৎকর্ষ ও বোধসৌকর্যের বিচারে, বিষয়বস্তুর বিচারে নয়। অতএব আমার বিবেচনায় পূর্ববর্তী দ্বিতীয় সংস্করণকে এখন অগ্রাহ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে।

তা ছাড়া, এই তৃতীয় সংস্করণে দুইখানি নতুন চিত্রলিপিও সংযোজন করা গেল। আশা করি তাতে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের গুরুত্ব বা তাৎপর্য উপলব্ধির সহায়তা হবে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটো-বড়ো সব রচনাকে বর্তমান সংস্করণে তিনটি প্রধান কালপর্বে বিভক্ত করা গেল এবং রচনাগুলির পারস্পরিক ভাবসংগতি অব্যাহত রেখে সেগুলিকে যথাসম্ভব কালানুক্রমে সাজানো হল। কেবল তৃতীয় পর্বের রচনাগুলিকে পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দ নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা গেল, আর প্রবন্ধ-মর্যাদালাভের যোগ্য নয় এমন পরিপূরক রচনাগুলিকে স্থান দেওয়া হল চারটি 'অনুষঙ্গ' বিভাগে। প্রথম দুটি অনুষঙ্গ প্রথম দুই পর্বের অনুবর্তী, আর বাকি দুটি অনুষঙ্গের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে তৃতীয় পর্বের পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দ বিভাগের পরে।

দীর্ঘকালব্যাপী সম্পাদনার ফলে স্মৃতির ম্লানতা ও অনবধানতা-বশতঃ আটটি ছোটো রচনাকে যথাস্থানে স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। এই আটটি রচনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে মূলগ্রন্থের দুটি 'সম্পূরণ' অংশে। কিন্তু 'বিষয়ক্রম' নামে গ্রন্থের সূচিপত্রে এগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট স্থানেই বসানো হল। আর গ্রন্থের 'পাঠপরিচয়' বিভাগেও এই বিষয়ক্রমই অনুসরণ করা গেল। পাঠক যদি এই

অভিপ্রেত ক্রম অনুসারে গ্রন্থপাঠ করেন তা হলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার অনুবর্তন সহজতর হবে, এই আমার বিশ্বাস।

এ প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, আমার বিবেচনায় এক হিসাবে প্রথম পর্বের রচনাগুলির গুরুত্বই সর্বাধিক। একমাত্র 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' ছাড়া এই পর্বের আর কোনো রচনাই রীতিমত ছন্দপ্রবন্ধ হিসাবে লিখিত নয়, নানা আলোচনার প্রাসঙ্গিক উপমন্তব্য হিসাবে লিখিত। কিন্তু এগুলির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ছন্দোমননের নানা মূল্যবান্ সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। আর, এ পর্বের ছন্দচিন্তার ভিত্তির উপরেই রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উত্তর জীবনের বিচিত্র ছন্দচিন্তা ও ছন্দশিল্পের বহুতল সৌধ। এই ঐতিহাসিক গুরুত্ববিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধমর্যাদার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও এগুলিকে গ্রন্থের পুরোভাগে স্থাপন করা গেল, আর 'পাঠপরিচয়' বিভাগেও যথোচিত যত্ন সহকারে এগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব-নিরূপণের চেষ্টা করা গেল। প্রথম পর্বের রচনাসংগ্রহ আর এগুলির সযত্ন পাঠপরিচয়, আশা করি এই দুটি বিভাগই চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে বর্তমান সংস্করণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হবে।

সময়াভাবের তাড়নায় দ্বিতীয় সংস্করণের নির্দেশিকা তৈরি করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে নিতে পারি নি, কিছু পরিমাণে অন্যের উপরে নির্ভর করতে হয়েছিল। ফলে আমার মনে কিছু অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিল। এবার দৃষ্টি-ক্ষীণতাজনিত অক্ষমতা সত্ত্বেও সে দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে নিজেকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। তাই এবারও এই নির্দেশিকার ত্রুটিহীনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারি নি। তবু আশা করি এই নির্দেশিকা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে একেবারে অনির্ভরযোগ্য হবে না।

এই উপলক্ষে আরও বলা উচিত যে, এই গ্রন্থের ছন্দ বিষয়টা বর্তমান সম্পাদনার মুখ্য লক্ষ্য হলেও একমাত্র লক্ষ্য নয়। ছন্দ-আলোচনার সূত্রে জ্ঞাতব্য এবং কবিকর্তৃক উত্থাপিত বিবিধ প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও গ্রন্থসম্পাদনার পরিধিভুক্ত বলে গণ্য হয়েছে। এক কথায়, 'ছন্দ' গ্রন্থের সামগ্রিক সম্পাদনাই বর্তমান প্রচেষ্টার অভিপ্রায়। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণেই এই আদর্শ প্রথম স্বীকৃত হয়েছিল। বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে সে আদর্শ অনুসৃত হল আরও একটু ব্যাপক ও সতর্কভাবে। এই সর্বাঙ্গীণ সম্পাদনা-প্রচেষ্টার

কিছু-কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে গ্রন্থের পাঠনিরূপণ থেকে নির্দেশিকার বিষয়-নির্বাচন পর্যন্ত সর্বত্রই।

এক সময়ে বর্তমান সম্পাদকের সঙ্গে ছন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল, এ বিষয়ে তাঁর সব উত্তর তিনি নিজেই এই গ্রন্থের অন্তর্গত করে গিয়েছেন। এ কথা জানা যায় এ গ্রন্থের প্রথম সম্পাদনার 'বিজ্ঞপ্তি' থেকে। উক্ত ছন্দবিতর্ক উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জানা যায় প্রধানতঃ 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম তিন পর্যায় ও 'ছন্দ-বিচার' দুই পর্যায় থেকে। বর্তমান সংস্করণে এই রচনাগুলি কালক্রমের বিচারে স্থান পেয়েছে গ্রন্থের তৃতীয় পর্বের পুরোভাগে। আর, বর্তমান সম্পাদকের বক্তব্য অনতিকাল পূর্বে সংকলিত হয়েছে তাঁর 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের (১৮৮১ বৈশাখ) দ্বিতীয় পর্বে। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' এবং উক্ত 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' পরস্পরের পরিপূরক বলে গণ্য হতে পারে। উক্ত ছন্দ-বিতর্কের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে তৃতীয় পর্বের প্রবন্ধাবলীর 'পাঠ-পরিচয়' বিভাগে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সম্পাদক হিসাবে এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমার কৃত্য যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করতে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। আর, এই গ্রন্থের ভাবী সম্পাদকের জন্য কোনো গুরু দায়িত্ব অবশিষ্টও রাখি নি। অবশ্য আমার জ্ঞাতসারেই মুদ্রণঘটিত ও অন্তবিধ সামান্য কিছু ত্রুটি ও অসমতা থেকে গেছে। এগুলি এতই গৌণপ্রকৃতির ও স্বল্পসংখ্যক যে, অনেকের চোখেই তা ধরা পড়বে না, আর পড়লেও যে-কোনো পাঠক এসব ত্রুটি ও অসমতা সহজেই শুধরে নিতে পারবেন। তাই সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সবশেষে সবিনয়ে বলা উচিত যে, আমি নিজেকে অভ্রান্ত বলে মনে করি না; আমার জ্ঞানবুদ্ধির সীমা আছে, তার পরিসরও খুব বড়ো নয়। 'বলবদপি শিক্ষিতানাম্ আত্মন্য-প্রত্যয়ং চেতঃ'— কালিদাসের এই উক্তির সত্যতাও বিস্মৃত হই নি। তাই আমি বিশ্বাস করি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্ন-সত্ত্বেও আমার অজ্ঞানতা, অনবধানতা ও স্মৃতির দুর্বলতা-বশতঃ এই গ্রন্থসম্পাদনায় অল্পাধিক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সহৃদয় পাঠক যদি ও-রকম ত্রুটিবিচ্যুতি আমার জ্ঞানগোচর করেন তা হলে আমি তাঁর কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকব এবং ভাবী সম্পাদকের জন্য যথাযোগ্য নির্দেশ রেখে যেতে পারব।

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৯ কার্তিক) সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকের কাছেই কিছু-কিছু সহায়তা পেয়েছিলাম। তার মধ্যে যাঁদের সহায়তার স্থায়ী ফল বর্তমান সংস্করণেও সঞ্চারিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আমার প্রাক্তন ছাত্র ও সহকর্মী শ্রীমান্ অমিয়কুমার সেনের অকুণ্ঠ সহকারিতার কথা সর্বাগ্রে স্মরণ করছি। তার পরেই উল্লেখযোগ্য আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ রামবহাল তেওয়ারী ও রবীন্দ্রভবনের পূর্বতন সহকর্মী শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। তৎকালে শ্রীসুকুমার বসু মহাশয়ের কাছে যে সহায়তা পেয়েছিলাম তার স্থায়ী ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা স্মরণ করে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি।—

"শ্রীসুকুমার বসু মহাশয় তাঁর কাছে রক্ষিত 'বিচিত্রা' ক্লাবের আমন্ত্রণ লিপিগুলি আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন দীর্ঘকাল পূর্বেই। এই আমন্ত্রণলিপিগুলির সহায়তা পেয়েই সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' ও রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধ পাঠের তারিখ নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। 'পাঠপরিচয়' প্রসঙ্গে যথাস্থানে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় কয়েকখানি আমন্ত্রণলিপির ফোটোচিত্র তুলতে সম্মতি দিয়েও আমাকে উপকৃত করেছেন। ইদানীং আমার অনুরোধে তিনি 'বিচিত্রা'-র স্মৃতিকথা লিখে আমার হাতে দেন। উক্ত আমন্ত্রণলিপির দুখানি চিত্রসহ তা প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৬৯ বৈশাখ-আষাঢ়)। এই প্রবন্ধটি নানা দিক্ থেকেই গবেষকদের কাজে লাগবে। 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধের পাঠপরিচয় প্রসঙ্গে এটির কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। বিচিত্রার আমন্ত্রণলিপি তথা ছন্দপাণ্ডুলিপির সবগুলি চিত্রই তুলে দিয়েছেন স্কুল অব প্রিন্টিং টেক্‌নোলজি প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক সুদক্ষ ফোটোশিল্পী শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন।"

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনকালে উল্লিখিত পাঁচ জনের কৃত সহায়তা বর্তমান সংস্করণেও অনুবৃত্ত হয়েছে।

তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদনার কাজে একান্তভাবে নিজের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। কারও কাছেই সক্রিয় সহযোগিতা বা অবিরত সহায়তা পাওয়া যায় নি। তবু কোনো-না-কোনো পর্যায়ে যাঁদের কাছে কিছু-না-কিছু সহায়তা

পেয়েছি তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য শ্রীমান্ অমিয়কুমার সেন ও শ্রীমান্ রামবহাল তেওয়ারীর নাম। আমার ছাত্রী শ্রীমতী পম্পা মজুমদার, ছাত্র শ্রীমান্ জয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, আমার কন্যা শ্রীমতী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বভারতীর তরুণ অধ্যাপক শ্রীমান্ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বিভিন্ন পর্যায়ে যে আন্তরিকতার সঙ্গে আমার শ্রমলাঘব করেছেন, এ প্রসঙ্গে তাও পরম তৃপ্তি ও প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করছি। তা ছাড়া, শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকানাই সামন্ত ও প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র সাহা, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের এই চার জন কর্মীর কাছেও কোনো কোনো বিষয়ে যে সহায়তা পেয়েছি, পরিমাণে বেশি না হলেও আমার কাছে তার মূল্য কম নয়।

এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রীসুশীল রায়, শ্রীরণজিৎ রায় ও শ্রীমানবেন্দ্র পালের কাছে যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি, আমার পক্ষে তা বিশেষ আনন্দের বিষয়। আর মুদ্রণ-প্রকাশনের শেষ পর্যায়ে পাঠপরিচয়ের ভাষাপরিমার্জনায় ও অন্যান্য বিষয়ে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সতর্ক বিচারবুদ্ধি, আন্তরিক কর্মনিষ্ঠতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে আমি শুধু যে প্রীত হয়েছি তা নয়, নানাভাবে উপকৃতও হয়েছি।

এঁদের সকলের এই সহযোগিতা না পেলে বর্তমান সংস্করণে বইখানিকে এমন প্রায়-ত্রুটিহীন করে প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

উল্লিখিত সকলকেই যথাযোগ্যভাবে আন্তরিক স্নেহ, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৬ ফাল্গুন ১৩৮১ — প্রবোধচন্দ্র সেন

অনুলেখ

'ছন্দ' গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনার কাজ শুরু হয় ১৩৭২ সালের ফাল্গুন (১৯৬৫ মার্চ) মাসে। তার পরে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মুদ্রণের কাজ চলতে থাকে মন্থর গতিতে, মাঝে মাঝে স্তব্ধও থেকেছে। এভাবে দশ বছরের অধিক কাল ধরে কাজ চলার ভালো-মন্দ দু-রকম ফলই হয়েছে। এই দীর্ঘকালে এক দিকে চিন্তার অগ্রগতি হয়েছে, দৃষ্টির গভীরতা বেড়েছে

এবং কিছু-কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। গ্রন্থসম্পাদনায় স্বভাবতঃই এসবের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। অপর দিকে দীর্ঘকালের ব্যবধানে তথ্য ও বক্তব্যগত নানা খুঁটিনাটি বিষয় অনিবার্যরূপেই কখন যে স্মৃতির জাল কেটে নিরুদ্দেশ হয়েছে তা বোঝাও যায় নি। পরিণামে এই গ্রন্থে সর্বত্র সমতা রক্ষা সম্ভব হয় নি। এমন কি, পূর্বাংশ ও অপরাংশের মধ্যে অলক্ষিতভাবে কিছু স্ববিরুদ্ধতা থেকে যাওয়াও অসম্ভব নয়। তবে আমার বিশ্বাস এ-রকম বিরোধ থেকে গেলেও খুব সামান্যই আছে। যদি সম্পাদনার কাজে কোথাও পরিভাষা ও অভিমতগত এ-রকম কোনো অসমতা বা বিরুদ্ধতা লক্ষিত হয় তবে পরবর্তী সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়, পাঠকদের প্রতি এই অনুরোধ।

নূতন তথ্যপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের দুখানি চিঠির উল্লেখ করতে পারি। চিঠি দুখানি অল্পদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় (১০ শ্রাবণ ১৩৮২। ২৬ জুলাই ১৯৭৫)। এই দুখানি চিঠি (৮ ও ১০ আশ্বিন ১৩৩৫) থেকে 'ছন্দ-ধাঁধা' (দ্বিতীয় পর্যায়) রচনার উৎস ও তারিখ নিরূপণের কিছু সহায়তা হয়েছে। প্রথম চিঠিখানিতে ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়ের ধাঁধা ও আদর্শ-সমেত মোট আটটি রচনার (৮, ৯, ১০ ও ১৩-সংখ্যক) সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ছন্দ গ্রন্থে গৃহীত রচনার সঙ্গে এগুলির পাঠগত ও অন্যবিধ কিছু পার্থক্যও লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় পর্বের পাঠপরিচয়-প্রসঙ্গে তার বিশদ পরিচয় দেওয়া গেল।

এখানে বলা উচিত যে, এই গ্রন্থের 'নির্দেশিকা' সংকলনের দায়িত্ব সর্বতোভাবেই আমার নিজের। কিন্তু ছন্দের ন্যায় প্রাকরণিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশিকামুদ্রণ-পর্যায়েও শেষরক্ষার যে কঠিন দায়িত্ব স্বভাবতঃই সম্পাদকের উপরে ন্যস্ত থাকে, আমাকে তার থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিয়েছেন বিশ্বভারতীর উৎসাহী তরুণ কর্মী শ্রীমান্ সুবিমল লাহিড়ী। এ জন্য তিনি শুধু আমার নয়, এই গ্রন্থের পাঠকমাত্রেরই আশীর্বাদভাজন হয়েছেন। বর্তমান সম্পাদকের 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের দুখানি লিপিচিত্রের ('ছন্দবিচার আলোচনার একটি অংশ' এবং 'ছন্দের মাত্রাগণনায় স্থিতিস্থাপকতা বিচার') ব্লক ও সে-দুটি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে জিজ্ঞাসা-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড আমার আন্তরিক সাধুবাদ অর্জন করেছেন। আর, 'তাপসী' প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ব্যক্তিগতভাবে যে সযত্ন আগ্রহ নিয়ে এই

গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করেছেন, তাও আমার প্রতি তাঁর সহৃদয় আনুকূল্য বলে আদরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে রইল।

সর্বশেষে সুগভীর আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই খণ্ডিত গ্রন্থের ত্বরিত প্রকাশনার ব্যাপারে বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের যে সক্রিয় আগ্রহের পরিচয় পেয়েছি তা আমার পক্ষে বিশেষ স্বস্তি ও তৃপ্তির বিষয়। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর, যদি অদূর ভবিষ্যতে এই গ্রন্থের অখণ্ড তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের যথোচিত দ্রুত ব্যবস্থা হয় তবে তা-ই হবে আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু যদি অতিবিলম্ব হেতু অথবা অন্য যে-কোনো কারণে আমার সে সৌভাগ্য লাভের সুযোগ না ঘটে তবে এই সংস্করণের অবশিষ্টাংশ (পাঠপরিচয় : দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব, পাণ্ডুলিপি-পরিচয়, দৃষ্টান্ত-পরিচয়, উদ্‌ধৃতি-পরিচয়, সংজ্ঞা-পরিচয়) তথা পরবর্তী সংস্করণ সম্পাদনার এবং মুদ্রণসৌষ্ঠব সাধনের দায়িত্বভার যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত ও বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের কর্মী শ্রীমানবেন্দ্র পাল ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর উপরে অর্পিত হলে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে। এই উদ্দেশে পূর্ণাঙ্গ 'ছন্দ' গ্রন্থের আদর্শরূপ সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় এই তিন জনের গোচর করে রাখলাম। নিজের পরিণত বয়স ও সম্ভাব্য অক্ষমতার কথা মনে রেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুধু কর্তব্যবোধের প্রেরণায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তথা সহৃদয় পাঠক-সমাজের অবগতির জন্য আমার এই মনোগত অভিপ্রায়ের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখতে বাধ্য হলাম। আশা করি আমার এই কুণ্ঠিত নিবেদনটুকুর জন্য আমি আমার স্বদেশবাসীর কাছে আন্তরিক মার্জনালাভে বঞ্চিত হব না।

'রুচিরা', পূর্বপল্লী,
শান্তিনিকেতন
২০ পৌষ ১৩৮২

প্রবোধচন্দ্র সেন

সম্পাদকের নিবেদন

দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রাসঙ্গিক অংশ)

প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞপ্তি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যতকিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হল'। বস্তুতঃ বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তিনি 'যতকিছু' আলোচনা করেছিলেন সব ছিল না সে সংস্করণে। ১৩২১ সালের পূর্ববর্তী কোনো আলোচনাই ছিল না। পরবর্তী কালেরও কিছু-কিছু আলোচনা বাদ পড়েছিল। বর্তমান সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক সমস্ত আলোচনা সংকলনের প্রয়াস করা গেল। ১৩২১ সালের পূর্ববর্তী এবং গ্রন্থপ্রকাশের (১৩৪৩) পরবর্তী অনেক রচনাই প্রথম সংকলিত হল। অনেকগুলি চিঠিপত্রও প্রথম প্রকাশিত হল। তবে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ছন্দবিষয়ক টুকরো-টুকরো প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সংগ্রহের কোনো প্রয়াস করা হয় নি।

প্রথম প্রকাশের সময়ে প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজানো ছিল না। বর্তমান সংস্করণে অনেকাংশেই রচনার কালক্রম অনুসৃত হল। "যে মানুষ সুদীর্ঘ কাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।'— রবীন্দ্রস্বীকৃত এই নীতি অনুসারেই প্রবন্ধগুলিকে নূতন করে সাজানো হল। তবে বিষয়বস্তুর সংগতিরক্ষার প্রয়োজনে কোনো কোনো স্থলে এই নীতির কিছু ব্যতিক্রম করা হয়েছে।...

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করতে করতে লেখা, সুপরিকল্পিতভাবে একসঙ্গে লেখা নয়। ফলে চিন্তায় এবং ভাষায় সর্বত্র সংগতি রক্ষিত হয় নি। তৎসত্ত্বেও এই রচনাধারার মধ্যে একটি অনতিলক্ষিত ঐক্যসূত্র আছে। কালক্রম অনুসরণ করে অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করলে সে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থসম্পাদনাকালে সে দিকেই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। আমার বিশ্বাস পৃথিবীর আর কোনো দেশেই রবীন্দ্রনাথের মতো ছন্দস্রষ্টার আবির্ভাব হয় নি। এ হেন মহা-ছন্দশিল্পীর ছন্দবিশ্লেষণ যে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনীয় তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি ছন্দবিচারের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে মতভেদ ঘটা অসম্ভব নয়। পরম রবীন্দ্রানুরাগী জে. ডি. এণ্ডারসন এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথকেও এ-রকম মতভেদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এসব কারণে 'ছন্দ' গ্রন্থখানি সম্পাদন করা ও পাঠকের কাছে সুগম

করা সহজসাধ্য নয়। তথাপি চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নি। বহুসংখ্যক পাদটীকা এবং সুবিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় ও নির্দেশিকার সাহায্যে বইখানিকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার এবং জিজ্ঞাসু পাঠকের অধিগম্য করার যথাসাধ্য প্রয়াস করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে।

এক, পরিভাষা। ছন্দবিশ্লেষণ করা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বহু পারিভাষিক, অর্ধপারিভাষিক ও অপারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করতে হয়েছে। অনেকগুলি পরিভাষাই তাঁর স্বকৃত। কিন্তু এগুলি সর্বত্র সমভাবে একই অর্থে প্রযুক্ত হয় নি। তা ছাড়া, একই অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। এসব কারণে তাঁর মূল অভিপ্রায়টি পাঠকের কাছে অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। এই অস্পষ্টতা ও বিভিন্নার্থকতা থেকে মুক্ত করে তাঁর অভিপ্রায়কে সুব্যক্ত করার প্রয়াস করা হয়েছে পাদটীকায় ও 'সংজ্ঞাপরিচয়' বিভাগে। নির্দেশিকার অন্তর্গত 'পরিভাষা' অংশ এবং উক্ত 'সংজ্ঞাপরিচয়'-এর সহায়তা নিয়ে অনুধাবন করলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ হবে বলে আশা করি। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষা ও ছন্দোনীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক স্থলেই স্বকীয় পরিভাষার সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছি। ফলে শেষোক্ত পরিভাষাগুলিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হয়েছে। এই নীতি অবলম্বন না করলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দতত্ত্বের সামগ্রিক ব্যাখ্যা অসম্ভব হত।

দুই, ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিষয়ক অধিকাংশ (বিশেষতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের) প্রবন্ধের পিছনেই রয়েছে কোনো-না-কোনো উপলক্ষের প্রেরণা। স্বতঃপ্রবৃত্ত রচনার সংখ্যা খুব কম। সেই উপলক্ষের ইতিহাস জানা থাকলে প্রবন্ধগুলি অনুধাবন করা সহজ হবে, এই বিবেচনায় 'পাঠপরিচয়' বিভাগে সে ইতিহাস যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে চেষ্টিত হয়েছি। আশা করি তাতে পাঠকের শুধু ছন্দজিজ্ঞাসা নয়, কৌতূহল-নিবৃত্তিরও সহায়তা হবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনের পত্রাবলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিদেশী বাংলাসাহিত্যানুরাগী ছন্দজিজ্ঞাসুর পত্রাবলী শুধু রবীন্দ্রনাথের ছন্দচর্চার ইতিহাস জানার পক্ষে নয়, বাংলা ছন্দের স্বরূপ অনুধাবনের পক্ষেও বিশেষ মূল্যবান্। বস্তুতঃ তাঁকেই বাংলার প্রথম যথার্থ ছান্দসিক বলে অভিহিত করা যায়। এই গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডারসনের পত্রাবলীর বহু প্রাসঙ্গিক অংশ 'পাঠপরিচয়' বিভাগে উদ্ধৃত

করা গেল। আশা করি তাতে বাংলার ছন্দচিন্তা সমৃদ্ধতর হবে।

এই গ্রন্থের সম্পাদনায় ব্রতী হয়ে প্রতিপদেই এ কাজের দুঃসাধ্যতার বিষয় উপলব্ধি করতে হয়েছে। তা ছাড়া, দীর্ঘকাল ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে হয়েছে। এসব কারণে কোনো-কোনো বিষয়ে কিছু-কিছু অপূর্ণতা ও অসমতা থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে পূর্ণতা- ও সমতা- বিধানের প্রয়াস করা যাবে।…

রবীন্দ্রভবন
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
বিজয়া দশমী, ২২ আশ্বিন ১৩৬৯

প্রবোধচন্দ্র সেন

বিষয়ক্রম

প্রথম সংস্করণে গৃহীত তেরোটি রচনা তারকা-চিহ্নিত, তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংকলিত নয়টি রচনা ছুরিকা-চিহ্নিত, আর দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংকলিত তেতাল্লিশটি রচনা অচিহ্নিত। দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়-মুখবন্ধের 'কালক্রম' অংশ।

প্রথম পর্ব : ১২৮৮-১৩১৯

অনুষঙ্গ-১

দ্বিতীয় পর্ব : ১৩২০-১৩৩৮

১ কালক্রমের (১৩৩৮ কার্তিক) হিসাবে এটি দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত।

তৃতীয় পর্ব : ১৩৩৮-১৩৪৭

পদ্যছন্দ

অনুষঙ্গ-৩

গদ্যছন্দ

১ তিনটি স্বতন্ত্র রচনা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির মধ্যে তৃতীয়টি প্রথম সংস্করণে ছিল, বাকি দুটি প্রথম সংকলিত হয় দ্বিতীয় সংস্করণে।

অনুষঙ্গ-৪

গ্রন্থপরিচয়

পাঠপরিচয়

প্রথম পর্ব : ১২৮৮-১৩১৯

১ কালক্রমের (১৩২৫ বৈশাখ) হিসাবে এটি দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত।

অনুবন্ধ-১

নির্দেশিকা

চিত্রক্রম

শুদ্ধিনির্দেশ

১। ৭২ ও ১৮৯-সংখ্যক পৃষ্ঠায় অনুষঙ্গ ১ ও অনুষঙ্গ ২ হবে যথাক্রমে অনুষঙ্গ ২ ও অনুষঙ্গ ৩ এবং পত্রধারা এক ও পত্রধারা দুই, এই শিরোনাম-দুটি বাদ দিতে হবে।

২। ১৭২-সংখ্যক পৃষ্ঠার তৃতীয় পাদটীকায় প্রথম বাক্যের 'নামে' শব্দের স্থলে বসবে 'ভাবে', দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য বাদ যাবে এবং চতুর্থ বাক্যের শেষ দুটি শব্দের বদলে বসাতে হবে— 'আসলে সাধুরীতির মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃত্ত শাখার অন্তর্গত'— এই বাক্যাংশটি। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য নির্দেশিকা : দৃষ্টান্ত-সংকলনের মুখবন্ধ, তৃতীয় অনুচ্ছেদ, পৃ ৩১৯।

১৬ পৌষ ১৩৮২ — প্রবোধচন্দ্র সেন

বাংলা ছন্দের দশটি নীতিসূত্র

১। ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।... যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।— ১২৯০ শ্রাবণ : পৃ ৪-৫

২। প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ ছন্দ রচনা করিতে হয়।— ১৩২১ শ্রাবণ : পৃ ৩১

৩। বাংলা স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়।— ১৩৩৮ পৌষ : পৃ ৯৪

৪। আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র।— ১৩৩৮ মাঘ : পৃ ১০১

৫। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে।... ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে।... এইজন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।— ১৩৩৮ মাঘ : পৃ ১০২

৬। ইংরেজি ছন্দে অ্যাক্‌সেন্টের প্রভাব; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘহ্রস্বের সুনির্দিষ্ট ভাগ। বাংলায় তা নেই, এইজন্যে লয়ের দাবিরক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর কোনো বাধা নেই।— ১৩৩৯ কার্তিক : পৃ ১৩৩

৭। ধ্বনির দুই মাত্রা এবং তিন মাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান। তার পরে এই দুই এবং তিনের যোগে যৌগিক মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি।— ১৩৪১ বৈশাখ : পৃ ১৬৫

৮। দ্বৈমাত্রিক এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনো পর্যন্ত এই দুই জাতের মাত্রাকে নানাপ্রকারে সাজিয়ে বাংলায় ছন্দের লীলা চলছে।··· তার রূপের বৈচিত্র্য ঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে এবং নানা ওজনের পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে। এইরকম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পঙ্‌ক্তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলি বেড়ে চলেছে।— ১৩৪৫ কার্তিক : পৃ ১৮৭

৯। চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্ত রূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ।··· সাধু ভাষার কবিতায় বাংলা শব্দের হসন্ত রীতি যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু তাদের পরস্পরকে ঠোকাঠুকি ঘেঁষাঘেঁষি করতে দেওয়া হয় না।— ১৩৪৫ কার্তিক : পৃ ১৮৪-৮৫

১০। চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্ত-সংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। সেটা পয়ার হলেও অক্ষরগোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রাগোনা পয়ার। কিন্তু··· সাধু ভাষার পদ্য উচ্চারণকালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না, অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।— ১৩৪৫ কার্তিক : পৃ ১৮৭

কল্যাণীয়

শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়কে

প্রথম পর্ব : অবতারণা

১২৮৮ - ১৩১৯

বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ

প্রকাশক সিন্ধুদূত[1]-এর ছন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "সিন্ধুদূতের ছন্দঃ প্রচলিত ছন্দঃসকল হইতে একরূপ স্বতন্ত্র ও নূতন। এই নূতনত্বহেতু অনেকেরই প্রথম-প্রথম পড়িতে কিছু কষ্ট হইতে পারে।... বাঙ্গালা ছন্দের প্রাণগত ভাব কি ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে এবং কি প্রণালীতেই বা ইচ্ছামতে উহার সুন্দর বৈচিত্র্যসাধন করা যায়, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব সিন্ধুদূতের ছন্দঃ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে।"

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের ছন্দ পড়িতে প্রথম-প্রথম কষ্ট বোধ হয় সত্য; কিন্তু ছন্দের নূতনত্ব তাহার কারণ নহে, ছত্রবিভাগের ব্যতিক্রমই তাহার একমাত্র কারণ। নিম্নে গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে সাগরের তীরে ?
দিবস হয়েছে গত, না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য জগৎ পাশরে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর ; সব ত্যজেছে আমারে।

রীতিমত ছত্রবিভাগ করিলে উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকটি নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ পায়।

এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে
সাগরের তীরে ?
দিবস হয়েছে গত,
না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য
জগৎ পাশরে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর ; সব
ত্যজেছে আমারে।

১ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভার' (১৮৭৫-৭৭) কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -প্রণীত। 'সিন্ধুদূত' (১৮৮৩) এঁর তৃতীয় কাব্য।

মাইকেল-রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি যাঁহাদের মনে আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন সিন্ধুদূতের ছন্দ বাস্তবিক নূতন নহে।

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু-পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?

একটি ছত্রের মধ্যে দুইটি ছত্র পুরিয়া দিলে পর প্রথমত চোখে দেখিতে খারাপ হয়, দ্বিতীয়ত কোন্‌খানে হাঁপ ছাড়িতে হইবে পাঠকরা হঠাৎ ঠাহর পান না। এখানে-ওখানে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অবশেষে ঠিক জায়গাটা বাহির করিতে হয়। প্রকাশক যে বলিয়াছেন, বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব কী ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে তাহা সিন্ধুদূতের ছন্দ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে, সে-বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়, কিন্তু বর্তমান কোনো কাব্যগ্রন্থে (এবং সিন্ধুদূতেও) তদনুসারে ছন্দ নিয়মিত হয় নাই।[১] আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই। এইজন্য যেখানে চোদ্দটা অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, বাস্তবিক বাংলার উচ্চারণ-অনুসারে পড়িতে গেলে তাহা হয়তো আট বা নয় অক্ষরে পরিণত হয়। রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত ছন্দটি পাঠ করিয়া দেখো।

মন্ বেচারির্ কি দোষ্ আছে,
তারে যেমন্ নাচাও তেম্‌নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্রের 'তারে' নামক অতিরিক্ত শব্দটি[২] ছাড়িয়া দিলে দুই ছত্রে এগারোটি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু উহাই আধুনিক ছন্দে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ হয়।

১ এই স্বাভাবিক ছন্দের সচেতন ও বহুল প্রয়োগ সর্বপ্রথমে দেখা দেয় 'ক্ষণিকা' কাব্যে (১৯০০)।

২ এ রকম 'অতিরিক্ত' শব্দকে আধুনিক ছন্দ-পরিভাষায় বলা হয় 'অতিপর্ব'।

মনের কি দোষ আছে,
যেমন নাচাও নাচে।[১]

ইহাতে দুই ছত্রে আটটি অক্ষর হয়; তাল ঠিক সমান রহিয়াছে অথচ অক্ষর কম পড়িতেছে। তাহার কারণ শেষোক্ত ছন্দে আমরা হসন্ত শব্দকে আমল দিই না। বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের ছন্দেও আটটির অধিক অক্ষর নাই।

মন্বেচারি কিঁ দোষাছে,
যেমন্নাচা তেম্নি নাচে।[২]

দ্বিতীয় ছত্র হইতে 'নাচাও' শব্দের 'ও' অক্ষর ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহার কারণ এই ও-টি হসন্ত ও, পরবর্তী তে-র সহিত ইহা যুক্ত।[৩]

উপরে দেখাইলাম বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ কী।[৪] আর, যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।[৫]

ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০ : 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : সিন্ধুদূত'

১ তুলনীয় : বারি ঝরে ঝরঝর।—'ছন্দের অর্থ' : প্রথম পর্যায়।

২ তুলনীয় : অচিণ্ডাকে নদীর্বাঁকে…এবং এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা— 'বাংলাপ্রাকৃত ছন্দ' : তৃতীয় পর্যায়।

৩ হসন্ত মানে ব্যঞ্জনান্ত। সুতরাং স্বরবর্ণ হসন্ত হতে পারে না। 'হসন্ত ও' বলার উদ্দেশ্য এই স্বরবর্ণটির স্বাতন্ত্র্য নেই, হস্‌বর্ণের মতো অন্য বর্ণের আশ্রিত। অই আই অও আও প্রভৃতি যুগ্মস্বর (diphthong) মাত্রেরই শেষাংশ স্বাতন্ত্র্যহীন। 'দাও' শব্দের 'ও' স্বাতন্ত্র্য-হীন, কিন্তু 'দিও' শব্দের 'ও' তা নয়। স্বাতন্ত্র্যহীন আশ্রিত স্বরকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন 'ভাংটা' স্বর (ছন্দ-সরস্বতী : ভারতী, বৈশাখ ১৩২৫ পৃ ১১)।

৪ এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা "রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ" প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১) দ্রষ্টব্য।

৫ তুলনীয় : 'এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।'—'ছন্দের প্রকৃতি' : তৃতীয় বিভাগ।

বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর

এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে।[১] সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।[২] যথা—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল ;
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।[৩]

'নিম্নে, স্বচ্ছ এবং ঊর্ধ্বে', এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কেবল বাংলা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ-অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর স্বরূপে গণনা করা যায় নাই।[২] পাঠকেরা এইরূপ আরো দুই-একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন।

মানসী (প্রথম সং, পৌষ ১২৯৭) : 'ভূমিকা'

১ 'মানসী' কাব্যে প্রবর্তিত এই নূতন ছন্দোরীতির প্রচলিত নাম 'মাত্রাবৃত্ত'।

২ সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে যুক্তাক্ষরকে নয়, যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষরকে, দীর্ঘ (অর্থাৎ দ্বিমাত্রক) বলে গণ্য করা হয়। সেজন্যই 'শব্দের আরম্ভ-অক্ষর' যুক্ত হলেও দ্বিমাত্রক হয় না। উক্ত নিয়ম -অনুসারে 'নিম্ন' ও 'স্বচ্ছ' শব্দের 'নি' ও 'স্ব' দ্বিমাত্রক। আসলে ও-দুই শব্দের 'নিম্' ও 'স্বচ্' এই দুটি যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রক বলে গণনীয়। এই নূতন ছন্দে ঐ, ঔ প্রভৃতি যুগ্মস্বরও দ্বিমাত্রক বলে স্বীকৃত হয়।

৩ 'নিষ্ফল উপহার' থেকে উদ্ধৃত। এর ছন্দ মাত্রাবৃত্ত পয়ার।

বাংলা শব্দ ও ছন্দ

বাংলা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক[১] নাই, অথবা যদি থাকে সে এত সামান্য যে, তাহাকে নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এইজন্যই আমাদের ছন্দে অক্ষর গনিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়াছে। কথার প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা সমান। কারণ কোনোস্থানে বিশেষ ঝোঁক না থাকাতে অক্ষরের বড়ো ছোটো প্রায় নাই। সংস্কৃত উচ্চারণে যে দীর্ঘহ্রস্বের নিয়ম আছে তাহাও বাংলায় লোপ পাইয়াছে। এই কারণে উচ্চারণ-হিসাবে বাংলাভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তরভূমির মতো সর্বত্র সমান।[২] জিহ্বা কোথাও বাধা না পাইয়া ভাষার উপর দিয়া যেন একপ্রকার নিদ্রিত অবস্থায় চলিয়া যায়; কথাগুলি চিত্তকে পদে পদে প্রতিহত করিয়া অবিশ্রাম মনোযোগ জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে না।[৩] শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সংগীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণত বাংলা ভাষায় অসম্ভব; কেবল একতান কলধ্বনি ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চেতনা লোপ করিয়া দেয়।[৪] একটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ংগম হইবার পূর্বেই অবিলম্বে আর-একটি কথার উপরে স্খলিত হইয়া পড়িতে হয়। বৈষ্ণবকবির একটি গান আছে—

মন্দপবন, কুঞ্জভবন,
কুসুমগন্ধ-মাধুরী।

১ এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা 'বাংলা ছন্দ' : প্রথম পর্যায় প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

২ তুলনীয় : বাংলা দেশটি যেমন সমভূমি… ।—'বাংলা ছন্দ' : প্রথম পর্যায়।

৩ তুলনীয় : 'মন চলে যায় ঘুমিয়ে-পড়া গাড়োয়ানকে নিয়ে রাতের বেলার গোরুর গাড়ির মতো।'—'ছন্দের প্রকৃতি' : দ্বিতীয় বিভাগ।

৪ এই উক্তি সাধু বা সংস্কৃত বাংলার সম্বন্ধে প্রযোজ্য, চলতি বা প্রাকৃত বাংলার সম্বন্ধে নয়। প্রাকৃত-বাংলার প্রকৃতি সমতল নয় এবং তাতে শব্দের সংঘাতজাত সংগীতবৈচিত্র্যও আছে, এ কথা বহুস্থলেই বলা হয়েছে।

এই দুটি ছত্রে অক্ষরের গুরুলঘু নিরূপিত হওয়াতে এই সামান্য গুটিকয়েক কথায় মধুর ভাবে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু এই ভাব সমমাত্রক[১] ছন্দে নিবিষ্ট হইলে অনেকটা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। যেমন—

মৃদুল পবন, কুসুমকানন,
ফুলপরিমল-মাধুরী।

ইংরেজিতে অনেক সময় আট-দশ লাইনের একটি ছোটো কবিতা লঘুবাণের মতো ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাংলায় ছোটো কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না। বোধ করি কতকটা সেই কারণে আমাদের ভাষার এই খর্বতা আমরা অত্যুক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি। একটা কথা বাহুল্য করিয়া না বলিলে আমাদের ভাষায় বড়োই ফাঁকা শুনায় এবং সে কথা কাহারো কানে পৌঁছায় না। সেইজন্য সংক্ষিপ্ত সংহত রচনা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। কোনো লেখা অত্যুক্তি পুনরুক্তি বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আড়ম্বরপুর্ণ না হইলে সাধারণত গ্রাহ্য হয় না।

বাংলা পড়িবার সময় অনেক পাঠক অধিকাংশ স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়েন।[২] নচেৎ সমমাত্র হ্রস্বস্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ কুলাইয়া উঠে না। বাংলার বক্তারা অনেকেই দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা বৃহৎ ও গম্ভীর করিয়া তোলেন। ভালো ইংরেজ অভিনেতার অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, এক-একটি শব্দকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিরূপ উদ্দামগতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাংলা অভিনয়ে শিথিল কোমল কথাগুলি হৃদয়স্রোতের নিকট সহজেই মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এইজন্য তাহাতে সর্বত্রই একপ্রকার দুর্বল সমায়ত সানুনাসিক ক্রন্দনস্বর ধ্বনিত হইতে থাকে। এইজন্য আমাদের

১ অন্যত্র সম, অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দের কথা বলা হয়েছে। সেখানে সম-মাত্রার ছন্দ মানে জোড়মাত্রার ছন্দ। এখানে সে অর্থ নয়। এখানে সমমাত্রক ছন্দ মানে সমতল অর্থাৎ ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতা বা উচ্চনীচতা -হীন ছন্দ। 'সমমাত্র হ্রস্বস্বর' লক্ষিতব্য।

২ তুলনীয়: কবিতা পড়িতে হইলে আমরা সুর করিয়া পড়ি।— 'বাংলা ছন্দ': প্রথম পর্যায়, প্রথম বিভাগ।

অভিনেতারা যেখানে শ্রোতাদের হৃদয় বিচলিত করিতে চান সেখানে গলা চড়াইয়া অযথাপরিমাণে চিৎকার করিতে থাকেন এবং তাহাতে প্রায়ই ফললাভ করেন।

মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড়ো বড়ো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন— শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' দুর্বোধ হইতে পারে, কিন্তু 'সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়' দুর্বল; 'উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে', ইহার পরিবর্তে 'উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া' ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।

বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়। এবং গানে এক কথা বারবার ফিরিয়া গাহিলে ক্ষতি হয় না। যতক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে ততক্ষণ সংগীত ছাড়ে না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া কবিতা নাই বলিলে হয়।

সংস্কৃতে ইহার বিপরীত দেখা যায়। বেদ ছাড়িয়া দিলে সংস্কৃত ভাষায় এত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য সত্ত্বেও গান নাই। শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে যে দুই-একটি প্রাকৃত গীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কাব্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। বাঙালি জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক এবং তাহাকে একহিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষালালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না; বরং আমার বিশ্বাস সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দনিহিত সংগীতের লাঘব করে। কিন্তু

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি, আর বলা হল না।[১]

ইহা কাব্যকলায় অসম্পূর্ণ, অতএব সুরের প্রতি ইহার অনেকটা নির্ভর। সংস্কৃত

---

১ কবিওয়ালা রাম বসুর (১৭৮৬-১৮২৮) গান। দ্রষ্টব্য : ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিজীবনী' (১৯৫৮), পৃ ২৩৫।

শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ। সুতরাং সংস্কৃতে কাব্যরচনার সাধ গানে মিটাইতে হয় নাই, বরং গানের সাধ কাব্যে মিটিয়াছে। মেঘদূত সুরে বসানো বাহুল্য।

হিন্দিসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু এ কথা বলিতে পারি, হিন্দিতে যে-সকল ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি পদ শুনা যায় তাহার অধিকাংশই কেবলমাত্র গান, একেবারেই কাব্য নহে। কথাকে সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া সুর শুনানোই হিন্দিগানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাংলাগানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুরসংযোগ গৌণ। এই-সকল কারণে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন যাহা-কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।

সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯ : 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ'

বিহারীলালের ছন্দ

সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর-একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা। ভাষার প্রতি আমাদের অনেক কবির কিয়ৎপরিমাণে অবহেলা আছে। বিশেষত মিত্রাক্ষর ছন্দের মিলটা তাঁহারা নিতান্ত কায়ক্লেশে রক্ষা করেন। অনেকে কেবলমাত্র শেষ অক্ষরের মিলকে যথেষ্ট জ্ঞান করেন এবং অনেকে 'হয়েছে, করেছে, ভুলেছে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের মিলকে মিল বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে— এক তাহা কর্ণতৃপ্তিকর, আর-এক অভাবিত-পূর্ব। অসম্পূর্ণ মিলে কর্ণের তৃপ্তি হয় না, সেটুকু মিলে স্বরের অনৈক্যটা আরো যেন বেশি করিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে কবির অক্ষমতা ও ভাষার দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদের মিল যত ইচ্ছা করা যাইতে পারে, সেরূপ মিলে কর্ণে প্রত্যেকবার নূতন বিস্ময় উৎপাদন করে না, এইজন্য তাহা বিরক্তিজনক ও 'একঘেয়ে' হইয়া উঠে। বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমান নির্ঝরের মতো সহজ সংগীতে অবিশ্রাম ধ্বনিত হইয়া

চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত, অক্ষমতা-জনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথাও এ কথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।

…প্রথম উপহারটি ব্যতীত 'বঙ্গসুন্দরী'র অন্য সকল কবিতার ছন্দই পর্যায়-ক্রমে বারো এবং এগারো অক্ষরে ভাগ করা। যথা—

স্মঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা-কুসুম-ভরে ;
চাঁচর চিকুর নীরদ-মালিকা,
লুটায়ে পড়েছে ধরণী 'পরে।

এ ছন্দ নারীবর্ণনার উপযুক্ত বটে, ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝংকৃত হইয়া উঠে। কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত-অক্ষরের স্থান নাই। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লেখকের এবং পাঠকের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। অক্ষরের মাত্রাগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে ইচ্ছামত বাড়াইবার কমাইবার অবকাশ আছে। প্রত্যেক অক্ষরকে একমাত্রার স্বরূপ গণ্য করিয়া একেবারে এক-নিশ্বাসে পড়িয়া যাইবার আবশ্যক হয় না। দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

হে সারদে দাও দেখা,
বাঁচিতে পারি নে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয় ;
কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কানে,
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময়।

ইহার মধ্যে প্রায় যুক্ত-অক্ষর নাই। নিম্নলিখিত শ্লোকে অনেকগুলি যুক্তাক্ষর আছে, অথচ উভয় শ্লোকই সুখপাঠ্য এবং শ্রুতিমধুর।

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গনিবারে পারে ;

সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

এই দুটি শ্লোকই কবির রচিত 'সারদামঙ্গল' হইতে উদ্ধৃত। এক্ষণে 'বঙ্গসুন্দরী' হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করা যাক।

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুর-নদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

ইহার সহিত নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকটি একসঙ্গে পাঠ করিলে প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে।

অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে
ধরিয়ে ললিত করুণা-তান,
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।

"অপ্সরী কিন্নরী" যুক্ত-অক্ষর লইয়া এখানে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছে।[১] কবিও এই কারণে বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত-অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।[২]

কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত-অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত-অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত-অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না।[৩] সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে

১ তুলনীয়: 'বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া', 'লৌহশৃঙ্খলের ডোর' এবং 'রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা'।— 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত': প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়।

২ মানসীপূর্ব যুগের রবীন্দ্রসাহিত্যেও যুক্তাক্ষরবর্জনের প্রয়াস দেখা যায়। লক্ষণীয়: 'সেইজন্যে যুক্ত-অক্ষর··· সমতল করে যাচ্ছিলুম'।— 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত': দ্বিতীয় পর্যায়।

৩ তুলনীয়: জিহ্বা কোথাও··· জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে না।— 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ'।

থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত-অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।[১]

আর্যদর্শনে বিহারীলালের সারদামঙ্গল-সংগীত যখন প্রথম বাহির হইল, তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্তেই প্রতীয়মান হইল। সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী[২]; কিন্তু কবি তাহা সংগীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্গসুন্দরীর ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতসৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নহে।

সাধনা. আষাঢ় ১৩০১ : 'বিহারীলাল'

আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭) : 'বিহারীলাল' (অংশ)

সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ

সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র উপদেশ অথবা নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে[৩] এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অর্পণ করিয়া থাকে।[৪] কিন্তু বাংলায় তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়ে। বাংলা উচ্চারণে যুক্ত-অক্ষরের ঝংকার, হ্রস্বদীর্ঘ-স্বরের তরঙ্গলীলা, এবং বাংলা পদে ঘনসন্নিবিষ্ট

১ তুলনীয় : মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে… পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।—'বাংলা শব্দ ও ছন্দ'।

২ দৃশ্যত ত্রিপদী হলেও এ ছন্দ আসলে চৌপদী।

৩ তুলনীয় : 'সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারুকার্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহতভাবে গঠিত'। — 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ' প্রবন্ধ।

৪ তুলনীয় : 'সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ'। — 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধ।

বিশেষণবিন্যাসের প্রথা না থাকাতে সংস্কৃত কাব্য বাংলা অনুবাদে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর শুনিতে হয়। যতিপঞ্চকের[১] নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশেষ কোনো কাব্যরস আছে তাহা বলিতে পারি না—

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

তথাপি ইহাতে যে শব্দযোজনার নিবিড়তা ও ছন্দের উত্থানপতন আছে তাহাতে আমাদের চিত্ত গুণী-হস্তের মৃদঙ্গের ন্যায় প্রহত হইতে থাকে। কিন্তু ইহার বাংলা পদ্য অনুবাদে তাহার বিপরীত ফল হয়।··· এক তো আমরা পাঠকদিগকে ভিক্ষাশী ও কৌপীনধারী হইতে উপদেশ দিই না, দ্বিতীয়ত বাংলার নিস্তেজ পয়ার ছন্দে সে উপদেশ শুনিতেও শ্রুতিমধুর হয় না।

সাধনা, মাঘ ১৩০১ : 'সমালোচনা : সাধনসপ্তকম্'

পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করা নিরতিশয় কঠিন কাজ; কারণ সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারুকার্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহতভাবে গঠিত,[২]— বাংলা অনুবাদে তাহা বিশ্লিষ্ট এবং বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু নবীন[৩] বাবুর রঘুবংশ অনুবাদখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূল গ্রন্থখানি পড়া না থাকিলেও এই অনুবাদের মাধুর্যে পাঠকদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অনুবাদক সংস্কৃত কাব্যের লাবণ্য বাংলা

১ 'যতিপঞ্চক' শংকরাচার্যের রচনা বলে পরিচিত।

২ তুলনীয় : 'প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল'।— 'প্রাচীন সাহিত্য': কাদম্বরীচিত্র।

৩ নবীনচন্দ্র দাস।

ভাষায় অনেকটা পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চদশ সর্গে তিনি যে দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণে ভালো ঠেকিল না। বাঙলার পয়ার ছন্দে প্রত্যেক ছত্রে যথেষ্ট বিশ্রাম আছে, তাহা চতুর্দশ অক্ষরের হইলেও তাহাতে অন্যূন ষোলোটি মাত্রা আছে।[১] এইজন্য পয়ার ছন্দে যুক্ত-অক্ষর ব্যবহার করিবার স্থান পাওয়া যায়; কিন্তু দ্বাদশাক্ষর ছন্দে যথেষ্ট বিশ্রাম না থাকাতে যুক্ত-অক্ষর ব্যবহার করিলে ছন্দের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়; যেন কুঠির পানসিতে মহাজনী নৌকার মাল তোলা হয়। দ্বাদশাক্ষর ছন্দে ধীরগমনের গাম্ভীর্য না থাকাতে তাহাতে সংস্কৃত কাব্যসুলভ ঔদার্য নষ্ট করে। আমরা সমালোচ্য অনুবাদ হইতে একটি পয়ারের এবং একটি দ্বাদশাক্ষরের শ্লোক পরে পরে উদ্ধৃত করিলাম।—

প্রসবান্তে কৃশা এবে কোশলনন্দিনী,
শয্যায় শোভিছে পাশে শয়ান কুমার—
শরদে ক্ষীণাঙ্গী যথা সুরতরঙ্গিণী
শোভিছে পূজায় পদ্ম পুলিনে যাঁহার।[২]

সে প্রভামণ্ডলী মাঝে সমুজ্জ্বলা
ফণীন্দ্রের ফণা-উৎক্ষিপ্ত আসনে
রাজিলা বসুধা স্ফুরিত কিরণে,
কটিতটে যাঁর সমুদ্র-মেখলা।[৩]

শেষোদ্ধৃত শ্লোকটির প্রত্যেক যুক্ত-অক্ষরে রসনা বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত পয়ারে প্রত্যেক যুক্ত-অক্ষরে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

১ তুলনীয়: 'দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছয়টি উচ্চারিত মাত্রা এবং দুটি অনুচ্চারিত অর্থাৎ যতির মাত্রা।'—'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধ: প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় বিভাগ। 'অন্যূন' কথার দ্বারা বোঝা যায় পয়ারে ষোলোর বেশি মাত্রাও ধরা যায়। পয়ারে চোদ্দর বেশি মাত্রার স্থান হয়, কারণ এ ছন্দ 'দ্বিতিস্থাপক'। দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধ: দ্বিতীয় বিভাগ।

২ রঘুবংশ ১০।৬৯। ৩ রঘুবংশ ১৫।৮৩।

এমন-কি, দ্বিতীয় ছত্রে আর-একটি যুক্ত-অক্ষরের জন্য কর্ণের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়।

সাধনা, বৈশাখ ১৩০২ : 'গ্রন্থসমালোচনা : রঘুবংশ'

বাংলা ছন্দে অনুপ্রাস

সৌন্দর্যের সরলতায় যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, ভাবের গভীরতায় যাহাদের নিমগ্ন হইবার অবসর নাই, ঘনঘন অনুপ্রাসে অতি শীঘ্রই তাহাদের মনকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। সংগীত যখন বর্বর অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে রাগরাগিণীর যতই অভাব থাক, তালপ্রয়োগের খচমচ কোলাহল যথেষ্ট থাকে। সুরের অপেক্ষা সেই ঘনঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া উঠে। একশ্রেণীর কবিতায় অনুপ্রাস সেইরূপ ক্ষণিক ত্বরিত সহজ উত্তেজনার উদ্রেক করে। সাধারণ লোকের কর্ণ অতি শীঘ্র আকর্ষণ করিবার এমন সুলভ উপায় অল্পই আছে। অনুপ্রাস যখন ভাব ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয় তখন তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু সে-সকলকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া উঠিয়া যখন মূঢ়লোকের বাহবা লইবার জন্য অগ্রসর হয় তখন তদ্দ্বারা সমস্ত কবিতা ইতরতা প্রাপ্ত হয়।

কবিদলের গানে অনেক স্থলে অনুপ্রাস, ভাব ভাষা এমন-কি ব্যাকরণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রোতাদের নিকট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়।...

একে বাংলা শব্দের কোনো ভার নাই, ইংরেজি প্রথামত তাহাতে একসেন্‌ট্‌ নাই, সংস্কৃত প্রথামত তাহাতে হ্রস্বদীর্ঘ রক্ষা হয় না[1], তাহাতে আবার সমালোচ্য কবির গানে সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধন না থাকাতে এই-সমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য ঘনঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা দেওয়ালের উপর লতা উঠাইতে

১ তুলনীয় : 'বাংলা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে... লোপ পাইয়াছে'।— 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', 'সংস্কৃত' ভাষায়... জানান দেবার।'— 'ছন্দের প্রকৃতি' : দ্বিতীয় বিভাগ।

গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেইরূপ ঘনঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া। অনেক নির্জীব রচনাও এই কৃত্রিম উপায়ে অতি দ্রুতবেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করিয়া বসে। বাংলা পাঁচালিতেও এই কারণেই এত অনুপ্রাসের ঘটা।[১]

সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ : 'গুপ্তরত্নোদ্ধার'
লোকসাহিত্য (১৯০৭) : 'কবিসংগীত' (অংশ)

কৌতুককাব্যের ছন্দ

পদ্যকে সমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোনো হেতু নাই।[২] ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না, বরঞ্চ কমিয়া যায়। কারণ কবিতা পড়িবার সময় পদ্যের নিয়ম রক্ষা করিয়া পড়িতে স্বতই চেষ্টা জন্মে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।

বায়রনের ডন জুয়ানে কবি অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ কৌতুকের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু নির্দোষ ছন্দের সুকঠিন নিয়মের মধ্যেই সেই অনায়াস অবলীলাভঙ্গি পাঠককে এরূপ পদে পদে বিস্মিত করিয়া তোলে। ইন্‌গোল্‌ড্‌স্‌বি-কাহিনী[৩] প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কৌতুককাব্যেও ছন্দের অস্খলিত পারিপাট্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

বস্তুত ছন্দের শৈথিল্যে হাস্যরসের নিবিড়তা নষ্ট করে। কারণ হাস্যরসের প্রধান দুইটি উপাদান অবাধ দ্রুতবেগ এবং অভাবনীয়তা। যদি পড়িতে গিয়া

১ দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য 'বাংলা ছন্দ' : প্রথম পর্যায় প্রবন্ধে।

২ এই রচনাংশটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আষাঢ়ে' (১৩০৫) কাব্যের ছন্দ-সমালোচনা। উক্ত কাব্যের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন, "এ কবিতাগুলির... ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সংগত"।

৩ বস্তুত 'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলি Rev. R. A. Burham-রচিত *Ingoldsby Legends*-এর অনুকরণেই লেখা। দ্রষ্টব্য নবকৃষ্ণ ঘোষের 'দ্বিজেন্দ্রলাল', একাদশ পরিচ্ছেদ।

ছন্দে বাধা পাইয়া যতিস্থাপন সম্বন্ধে দুই-তিন বার দুই-তিন রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্যের তীক্ষ্ণতা আপন ধার নষ্ট করিয়া ফেলে।[১]

অবশ্য কোনো নূতন ছন্দ প্রথম পড়িতে কষ্ট হয় এবং যাঁহাদের ছন্দে স্বাভাবিক কান নাই তাঁহারা পরের উপদেশ ব্যতীত তাহা কোনো কালেই পড়িতে পারেন না। কিন্তু আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা তাহার নূতনত্ব নহে। তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই, এইজন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যকমত কোথাও টানিয়া কোথাও ঠাসিয়া কমি-বেশি করিয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া বরঞ্চ মনে মনে পড়া চলে, কিন্তু কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে হইলে পদে পদে অপ্রতিভ হইতে হয়।...

অথচ ছন্দ এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিলবর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারে না, তাহারও অনেক উদাহরণ আছে। কবি নিজেই তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনাগুলিকে নিয়মিত ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্থায়িত্ব এবং উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার 'বাঙালিমহিমা,' 'ইংরেজস্তোত্র', 'ডিপুটিকাহিনী' ও 'কর্ণবিমর্দন' সর্বত্র উদ্ধৃত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে। এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে।

ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫ : 'আষাঢ়ে'
আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭) : 'আষাঢ়ে' (অংশ)

১ তুলনীয় : 'কোন্‌খানে হাঁপ ছাড়িতে হইবে... বাহির করিতে হয়'।—'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ'।

জাপানি ছন্দ

জাপানি কবিতার ও ছন্দের অনুকরণে নিম্নের কবিতা-তিনটি রচিত হইয়াছে। জাপানি কবিতা সাধারণত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে মিলেরও কোনো লক্ষণ দেখি না, কেবল অত্যন্ত সরল মাত্রার নিয়ম আছে। এই কারণে কাব্যরচনার চর্চা জাপানের আপামর-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে পারিয়াছে এবং এই কারণেই জাপানি কবিতার বিষয় ও ভাব অনেক সময় আমাদের কাছে অতিরিক্ত মাত্রায় সাদাসিধা ঠেকে। কিন্তু বিদেশী কাব্যের রস ঠিকভাবে গ্রহণ করা সহজ নহে— দু-চারটে তরজমা পড়িয়া কোনো কথাই বলা চলে না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সরল কাব্যরচনার রীতি অন্যত্র দেখা যায় না। ইহাদের অসমান মাত্রার তিন লাইনের কবিতাকণাগুলি দেখিলে বেদের ত্রিষ্টুভ্[১] ছন্দের শ্লোক মনে পড়ে।

বাঙালি পাঠকের অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজের অনুকৃতিগুলির মধ্যে একটু মিলের আভাস রাখা গেছে।

সেদোকা ছন্দ

সাগরতীরে
শোণিত-মেঘে হল
নিশীথ অবসান।
পুবের পাখি
পুরব মহিমারে
শুনায় জয়গান॥

১ যে ছন্দোবর্গের প্রতি পাদে এগারো অক্ষর থাকে, সংস্কৃত ছন্দ-পরিভাষায় তার নাম 'ত্রিষ্টুভ্'।

২

চোকা ছন্দ

সাহসী বীর
দেখেছি কত অরি
করেছে জয়।
দেখি নি তোমা সম
এমন ধীর—
জয়ের ধ্বজা ধরি
স্তবধ হয়ে রয়॥

৩

ইমায়ো ছন্দ

গেরুয়া বাস পরি
ধর্মগুরু
শিখাতে গিয়েছিল
তোমার দেশে।
আজি সে শিখিবারে
কর্মনীতি
তোমার দ্বারে ধায়
শিষ্যবেশে॥

ভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩১২ : 'জাপানের প্রতি'
জাপানযাত্রী (১৯৬২ সং), গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১৪৪-৪৫

সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ

একসময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম। এইরূপে যখন আপনমনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেই-সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।

একটা স্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল, কবিযশের পাকা সেহায় সেগুলি জমা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে মনে হিসাব মিলাইবার একটা চিন্তা ছিল, কিন্তু স্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। স্লেট জিনিসটা বলে— ভয় কী তোমার, যাহা খুশি তাহাই লেখো-না, হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে।

কিন্তু এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি-একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল— বাঁচিয়া গেলাম, যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।...

এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটা খালের মতো সিধা চলে না, আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানামূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম, কিন্তু এখন লেশমাত্র সংকোচ বোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে ; তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।...

বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে যে-ছন্দের প্রবর্তন

করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক। যেমন—

> একদিন দেব তরুণ তপন
> হেরিলেন স্বর-নদীর জলে,
> অপরূপ এক কুমারীরতন
> খেলা করে নীল নলিনীদলে।

তিনমাত্রা জিনিসটা দুইমাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়।[১] তাহার এই বেগবান্ গতির নৃত্য যেন ঘনঘন ঝংকারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিক্‌ল্‌-এ ধাবমান হওয়ার মতো। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।[২] ...

কোনোপ্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই। সেইজন্যই হাতটাকে যেমন-খুশি ব্যবহার করিতে পারি, এই আনন্দটাকে প্রকাশ করিবার জন্যই হাতটাকে যথেচ্ছ ছুঁড়িয়াছি।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৯ : 'জীবনস্মৃতি : সন্ধ্যাসংগীত'
জীবনস্মৃতি (১৯১২) : 'সন্ধ্যাসংগীত' (অংশ)

১ তুলনীয় : 'তিনমাত্রা তালটা যেন গোল গড়নের, গড়িয়ে চলে।'—'ছন্দের প্রকৃতি' : দ্বিতীয় বিভাগ।

২ তুলনীয় : 'বঙ্গসুন্দরীর ছন্দোলালিত্য... বন্ধন ছেদন করা কঠিন।'—'বিহারীলালের ছন্দ'।

দ্বিতীয় পর্ব

১৩২০ – ১৩৩৮

বাংলা ছন্দ

প্রথম পর্যায়

আপনি বলিয়াছেন আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা বাক্যের আরম্ভে পড়ে। ইহা আমি অনেক দিন পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। ইংরেজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই আপনাদের ছন্দ সংগীতে মুখরিত হইয়া উঠে। সংস্কৃত ভাষায় ঝোঁক নাই, কিন্তু দীর্ঘহ্রস্ব স্বর ও যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রাবৈচিত্র্য আছে। তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ঢেউ খেলাইয়া উঠে। যথা—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা

উক্ত বাক্যের যেখানে যেখানে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ বা দীর্ঘস্বর আছে সেখানেই ধ্বনি গিয়া বাধা পায়। সেই বাধার আঘাতে আঘাতে ছন্দ হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

যে ভাষায় এইরূপ প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ বেগ আছে সে ভাষার মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেক শব্দটিই নিজেকে জানান দিয়া যায়, কেহই পাশ কাটাইয়া আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া যাইতে পারে না। এইজন্য যখন একটা বাক্য (sentence) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তাহার উচ্চনীচতার বৈচিত্র্যবশত একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে একসঙ্গে অনেকগুলা শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়; তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না।[১] ঠিক যেন আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের মতো। বাড়ির কর্তাটিকেই স্পষ্ট করিয়া অনুভব করা যায়। কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার কত পোষ্য আছে, তাহারা আছে কি নাই, তাহার হিসাব রাখিবার দরকার হয় না।

১ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধ।

এইজন্য দেখা যায়, আমাদের দেশে কথকতা যদিচ জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আমোদ দিবার জন্য, তথাপি কথকমহাশয় ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত সমাসের আমদানি করিয়া থাকেন। সে-সকল শব্দ গ্রাম্য-লোকেরা বোঝে না। কিন্তু এই-সমস্ত গম্ভীর শব্দের আওয়াজে তাহাদের মনটা ভালো করিয়া জাগিয়া ওঠে। বাংলাভাষায় শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু বলিয়া অনেক সময় আমাদের কবিদিগকে দায়ে পড়িয়া অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।[1]

এইজন্যই আমাদের যাত্রার ও পাঁচালির গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রথা আছে।[2] সে অনুপ্রাস অনেক সময় অর্থহীন এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ; কিন্তু সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে তাহার প্রয়োজন এত অধিক যে, বাছবিচার করিবার সময় পাওয়া যায় না। নিরামিষ তরকারি রাঁধিতে হইলে ঝালমসলা বেশি করিয়া দিতে হয়, নহিলে স্বাদ পাওয়া যায় না। এই মসলা পুষ্টির জন্য নহে; ইহা কেবলমাত্র রসনাকে তাড়া দিয়া উত্তেজিত করিবার জন্য। সেইজন্য দাশরথি রায়ের রামচন্দ্র যখন নিম্নলিখিত রীতিতে অনুপ্রাসচ্ছটা বিস্তার করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন—

অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম।—

তাহাতে শ্রোতার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আমাদের বন্ধু দীনেশবাবুকর্তৃক পরম-প্রশংসিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারের আবর্জনা ঝুড়ি ঝুড়ি চাপিয়া আছে। তাহাতে কাহাকেও বাধা দেয় না।

পুনঃ যদি কোনক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে
যতনে করে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।

এখানে কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে এ-কার যোগ করা একেবারেই নিরর্থক; কিন্তু অনুপ্রাসের বন্যার মুখে অমন কত এ-কার উ-কার স্থানে অস্থানে ভাসিয়া বেড়ায় তাহাতে কাহারো কিছু আসে যায় না।

---

১ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' (১২৯৯) এবং 'ছন্দবিচার' (১৩৩৯) প্রবন্ধে মধুসূদনের 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' ইত্যাদি ধরনের শব্দপ্রয়োগ-প্রসঙ্গ।

২ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা ছন্দে অনুপ্রাস' নিবন্ধ।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে কীর্তিত হইত। এই-জন্য শব্দের মধ্যে যাহা-কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যাহা-কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সুরে ভরিয়া উঠিত; সঙ্গে সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত। সেই-সমস্ত বাদ দিয়া যখন আমাদের সাধু-সাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই একে তো প্রত্যেক কথাটিতে স্বতন্ত্র ঝোঁক নাই, তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। [যেমন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

ইহাতে চোদ্দটি অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা। সকল শব্দই মাথায় সমান। বাংলা দেশটি যেমন সমভূমি তাহার পয়ার ত্রিপদী ছন্দগুলিও সেইরূপ; কোথাও ওঠানামা করিতে হয় না।]

গানের পক্ষে ইহাই সুবিধা। বাংলার সমতল ক্ষেত্রে নদীর ধারা যেমন স্বচ্ছন্দে চারি দিকে শাখায়-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়াছে, তেমনি সমমাত্রিক[১] ছন্দে সুর আপন প্রয়োজনমত যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারে। কথাগুলা মাথা হেঁট করিয়া সম্পূর্ণ তাহার অনুগত হইয়া থাকে।

কিন্তু সুর হইতে বিযুক্ত করিয়া পড়িতে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মতো হইয়া পড়ে। এইজন্য আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা পড়িতে হইলে আমরা সুর করিয়া পড়ি। এমন-কি, আমাদের গদ্য-আবৃত্তিতেও যথেষ্টপরিমাণে সুর লাগে। আমাদের ভাষার প্রকৃতি-অনুসারেই এরূপ ঘটিয়াছে। আমাদের এই অভ্যাসবশত ইংরেজি পড়িবার সময়েও আমরা সুর লাগাই; ইংরেজের কানে নিশ্চয়ই তাহা অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই যে বস্তুত একমাত্রার এ কথা সত্য নহে। যুক্ত বর্ণ এবং অযুক্ত বর্ণ কখনোই একমাত্রার হইতে পারে না।

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

"পুণ্যবান্" শব্দটি "কাশীরাম" শব্দের সমান ওজনের নহে। কিন্তু আমরা প্রত্যেক বর্ণটিকে সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়ি বলিয়া আমাদের শব্দগুলির মধ্যে

১ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধে 'সমমাত্রিক' ছন্দের প্রসঙ্গ ও পাদটীকা।

এতটা ফাঁক থাকে যে, হালকা ও ভারী দুইরকম শব্দই সমমাত্রা অধিকার করিতে পারে। [যে সভায় চৌকি পাতিয়া মানুষ বসে, সেখানে প্রত্যেক চৌকির পরিমাপ সমান, সেই চৌকিতে যে মানুষগুলি বসে তাহারা মোটাই হউক, আর রোগাই হউক, সমান জায়গা জোড়ে। কিন্তু ফরাশের উপর গায়ে গায়ে যদি বসিতে হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন লোক আপনার দেহের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণমত স্থান দখল করে। আমাদের পয়ার-ত্রিপদীতে শব্দগুলি অত্যন্ত সভ্য হইয়া চৌকির উপর বসিয়া গেছে।]

Equality, Fraternity প্রভৃতি পদার্থগুলি খুব মূল্যবান্ বটে, কিন্তু সেই-জন্যই ঝুটা হইলে তাহা ত্যাজ্য হয়। আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য দেখা যায় তাহা গানের সুরে সাঁচ্চা হইতে পারে, কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেকদিন আমার মনে বাজিয়াছে। কোনো কোনো কবি ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষ জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রে তাহার দুই একটা নমুনা আছে। যথা—

মহারুদ্র রূপে[1] মহাদেব সাজে।

বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এরূপ অনেক দেখা যায়। [যেমন—

সুন্দরি রাধে, আওয়ে বনি
ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি!]

কিন্তু এগুলি বাংলা নয় বলিলেই হয়। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াছেন, সেখানে তিনি বাংলা শব্দ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মৈথিলী ভাষার বিকার।

আমার বড়োদাদা মাঝে মাঝে এ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কৌতুক করিয়া। যথা—

ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণ-গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ুউড়ু, এ কি দৈবেরি শাস্তি!

বাংলায় এ জিনিস চলিবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ

১ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের মূলপাঠে আছে 'রূপে'। প্রথম সংস্করণে ছিল 'বেশে'।

সুব্যক্ত নহে। কিন্তু যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ বাংলাতেও না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। [এই কথা মনে রাখিয়া বহুকাল হইল আমি 'মানসী'-নামক কাব্যগ্রন্থে বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণকে দুইমাত্রা গণ্য করিয়া ছন্দ রচিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। এখন তাহা প্রচলিত হইয়াছে।]

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার একটা প্রভেদ এই যে, বাংলার প্রায় সর্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন— ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত একমাত্রার[১] কথা। অথচ সাধু বাংলা ভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপে বাংলা সাধুছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি-উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুত। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না বলিয়া পরবর্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাজাইয়া তোলে। 'করিতেছি' শব্দটা ভোঁতা। উহাতে কোনো সুর বাজে না। কিন্তু 'কর্ছি' শব্দে একটা সুর আছে। "যাহা হইবার তাহাই হইবে", এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলা; সেইজন্য ইহার অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন বলা যায় "যা হবার তাই হবে" তখন 'হবার' শব্দের হসন্ত 'র' 'তাই' শব্দের উপর আছাড় খাইয়া একটা জোর জাগাইয়া তোলে; তখন উহার নাকী সুর ঘুচিয়া গিয়া ইহা হইতে একটা 'মরিয়া' ভাবের আওয়াজ বাহির হয়। বাংলার হসন্তবর্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল; চর্বির স্তরে তাহার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে, এবং তাহার চিক্কণতা যতই থাক, তাহার জোর অতি অল্পই।

২

কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত

১ এখানে 'মাত্রা' শব্দটা সিলেব্‌ল্ (আধুনিক পরিভাষায় 'দল') অর্থে প্রযুক্ত

কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরিয়া সে ভদ্র-সাহিত্যসভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই। সেই-সব মেঠো-গানের ঝরনার তলায়, বাংলা ভাষার হসন্ত-শব্দগুলা নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্রসাহিত্যপল্লীর গম্ভীর দিঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই; সেখানে হসন্তর ঝংকার বন্ধ।

আমার শেষবয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে, তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে। 'গীতাঞ্জলি'[১] হইতে আপনি আমার যে লাইনগুলি তুলিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের চলতি ভাষার হসন্ত সুরের লাইন।

আমার্ সকল্ কাঁটা ধন্য করে
ফুট্‌বে গো ফুল্ ফুট্‌বে।
আমার্ সকল্ ব্যথা রঙিন্ হয়ে
গোলাপ্ হয়ে উঠ্‌বে।

আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গি আছে। 'ধন্য' শব্দটার মধ্যেও একটা হসন্ত আছে। উহা 'ধন্ন্' এই বানানে লেখা যাইতে পারে। এইটে সাধুভাষার ছন্দে লিখিলাম—

যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠিবে।

অথবা যুক্তবর্ণকে যদি একমাত্রা বলিয়া ধরা যায় তবে এমন হইতে পারে—

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুম স্তবক ফুটিবে।
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।

এমনি করিয়া সাধুভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তর বাঁশির ফাঁকগুলি সীসা দিয়া ভরতি করিয়াছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর-

১ উদ্ধৃত লাইনগুলি আসলে আছে 'গীতিমাল্য' কাব্যে।

যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার জরিজহরতের ঝালরওয়ালা দেড়-হাত দুইহাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধুলোকেরা জরির আঁচলটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশি; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্যপাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।

অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনকে লিখিত পত্র : ৬ ফাল্গুন ১৩২০
সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ : 'বাংলা ছন্দ'

দ্বিতীয় পর্যায়

সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু—

এই বাক্যটি আবৃত্তি করিবার সময়ে আমরা 'সম্মুখ' শব্দটার উপরে ঝোঁক দিয়া সেই এক-ঝোঁকে একেবারে 'বীরবাহু' পর্যন্ত গড়গড় করিয়া চলিয়া যাইতে পারি। আমরা নিশ্বাসটার বাজে-খরচ করিতে নারাজ, একনিশ্বাসে যতগুলা শব্দ সারিয়া লইতে পারি ছাড়ি না।

আপনাদের ইংরেজি বাক্যে সেটা সম্ভব হয় না, কেননা আপনাদের শব্দগুলা বেজায় রোখা মেজাজের। তাহারা প্রত্যেকেই ঢুঁ মারিয়া নিশ্বাসের শাসন ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। She was absolutely authentic, new, and inexpressible— এই বাক্যে যতগুলি বিশেষণপদ আছে সব-কটাই উঁচু হইয়া উঠিয়া নিশ্বাসের বাতাসটাকে ফুটবলের গোলার মতো এক মাথা হইতে আর-এক মাথায় ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া চালান করিয়া দিতেছে।

প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়। এখন দেখা যাক আমাদের ভাষার চাল-চলনটা কী রকম।

আপনি বলিয়াছেন, বাংলা বাক্য-উচ্চারণে বাক্যের আরম্ভে আমরা ঝোঁক দিয়া থাকি। এই ঝোঁকের দৌড়টা যে কতদূর পর্যন্ত হইবে তাহার কোনো বাঁধা নিয়ম নাই, সেটা আমাদের ইচ্ছা। যদি জোর দিতে না চাই তবে সমস্ত বাক্যটা একটানা বলিতে পারি, যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্বে পর্বেই ঝোঁক দিয়া থাকি। "আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখো"—এই বাক্যটা আমরা এমনি করিয়া পড়িতে পারি যাহাতে উহার সকল শব্দই একেবারে মাথায় মাথায় সমান হইয়া থাকে। আবার উত্তেজনার বেগে নিম্নলিখিত মতো করিয়াও পড়া যাইতে পারে—

।　　।　　।　　।　　।
আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখো।

এই বাংলাশব্দগুলির নিজের কোনো বিশেষ দাবি নাই, আমাদের মর্জির উপরেই নির্ভর। কিন্তু "Realize the riotous animality of primitive man"—এই বাক্যে প্রায় প্রত্যেক শব্দই নিজ নিজ এক্‌সেণ্টের ধ্বজা গাড়িয়া বসিয়া আছে বলিয়া নিশ্বাস তাহাদিগকে খাতির করিয়া চলিতে বাধ্য।

বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করিয়া ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তাহার পিছন-পিছন কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান তালে পা ফেলিয়া কুচ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ এক-একটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে কয়টা করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে, ছন্দের নিয়ম-অনুসারে তাহার বরাদ্দ হইয়া থাকে।

পয়ারের রীতিটা দেখা যাক। পয়ারটা চতুষ্পদ ছন্দ। আমার বিশ্বাস, পয়ার শব্দটা পদ-চার শব্দের বিকার। ইহার এক-একটি পদ এক-একটি ঝোঁকের শাসনে চলে।

মহাভারতের কথা | অমৃতসমান |
কাশীরামদাস কহে | শুনে পুণ্যবান্ |

"অমৃতসমান" ও "শুনে পুণ্যবান্", এই দুই অংশে ছয়টি অক্ষর দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু মাত্রাগণনায় ইহারা আট। ঐখানে লাইন শেষ হয় বলিয়া দুইটিমাত্রা-পরিমাণ জায়গা ফাঁক থাকে। যাহারা সুর করিয়া পড়ে তাহারা 'মান' এবং 'বান্' শব্দের আকারটিকে দীর্ঘাকার করিয়া ঐ ফাঁক ভরাইয়া দেয়।

এক-একটি ঝোঁকে কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে তাহা দেখিয়াই ছন্দের বিচার করিতে হয়। নতুবা যদি মোটা করিয়া বলি যে, এক-এক লাইনে চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে নানা ভিন্ন-প্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। নিম্নলিখিত ছন্দে প্রত্যেক লাইনে চোদ্দটা অক্ষর আছে—

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে।
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে।

ইহাকে যে পয়ার বলি না তাহার কারণ ইহার এক-একটি ঝোঁকের দখলে ছয়টি করিয়া মাত্রা। ইহার ভাগ নীচে লিখিলাম—

ফাগুন যামিনী | প্রদীপ জ্বলিছে | ঘরে।

চোদ্দ-অক্ষরী লাইনের আরো দৃষ্টান্ত আছে —।

পুরব মেঘমুখে | পড়েছে রবি-রেখা |
অরুণ রথচূড়া | আধেক গেল দেখা |

এখানে স্পষ্টই এক-এক ঝোঁকে সাতটি করিয়া মাত্রা। সুতরাং পয়ারের তুলনায় প্রত্যেক পদে ইহার একমাত্রা কম।

তবেই দেখা যাইতেছে, আটমাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আটমাত্রাকে দুখানা করিয়া চারমাত্রায় ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুত লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্যাদা। চার-চারমাত্রায় পা ফেলিয়া পয়ার যখন দুলকি চালে চলে তখন তাহার পায়ে পায়ে মিল থাকে। যেমন—

বাজে তীর, পড়ে বীর ধরণীর পরে।

এরূপ ছন্দ হালকা কাজে চলে; ইহা যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না এবং সাত-কাণ্ড বা অষ্টাদশ পর্ব জুড়িয়া লম্বা দৌড় ইহার পক্ষে অসাধ্য। চৌপদীটা পয়ারের সহোদর বোন। আটমাত্রায় তাহার পা পড়ে, কেবল তাহার পায়ে মিলের মলজোড়ার ঝংকারটা কিছু বেশি।

বাহিরের চেহারা দেখিয়া ছন্দের জাতিনির্ণয় করায় যে প্রমাদ ঘটিতে পারে তাহার একটা দৃষ্টান্ত এইখানে দিই। একদিন আমার মাথায় একটা ছয়মাত্রার ছন্দ আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহার চেহারাটা এইরকম—

প্রথম শীতের মাসে, শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে, হিহি করে কাঁপে গাত্র।

গোটাকয়েক শ্লোক যখন লেখা হইয়া গেছে তখন হঠাৎ হুঁশ হইল যে, আকারে-আয়তনে চৌপদীর সঙ্গে ইহার কোনো তফাত নাই, অতএব পাঠকেরা আটমাত্রার ঝোঁক দিয়াই ইহা পড়িবে। তখন আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া চৌপদীর দস্তুরেই লিখিতে লাগিলাম। এই ছন্দটিকে ছয়মাত্রার কায়দায় পড়িতে হইলে নিম্নলিখিতমত ভাগ হয়—

।　　　　　　।
প্রথম শীতের | মাসে—।

।　　　　　　।
শিশির লাগিল | ঘাসে—।

আমাদের দেশের সংগীতের তাল যদি আপনার জানা থাকে তবে এক-কথায় বলিলেই বুঝিবেন চৌপদীতে কাওয়ালির লয়ে ঝোঁক দিতে হয় এবং আমি যে ছন্দটা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছিলাম তাহার তাল একতালা। কাওয়ালি দুইবর্গ মাত্রার তাল, এবং একতালা তিনবর্গ মাত্রার।

ত্রিপদীরও মোটের উপর আটমাত্রার চাল। যথা—

।　　　　　　　।
ভবানীর কটুভাষে | লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে |

।　　　　　　　।
ক্ষুধানলে কলেবর | দহে।

তৃতীয় পদে দুটা মাত্রা বেশি আছে; তাহার কারণ, যে চতুর্থ পদটি থাকিলে এই ছন্দের ভারসামঞ্জস্য থাকিত সেটি নাই। 'ক্ষুধানলে কলেবর' পর্যন্ত আসিয়া থামিতে গেলে ছন্দটা কাত হইয়া পড়ে, এইজন্য 'দহে' একটা যোগ করিয়া ছোটো একটি ঠেকা দিয়া উহাকে খাড়া রাখা হইয়াছে। চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের তেলোটা চওড়া হয় না, কিন্তু মানুষের খাড়া শরীরের টলটলে ভারটা দুই পায়ের পক্ষে বেশি হওয়াতেই তাহার পদতলটা গোড়ালি ছাড়াইয়া সামনের দিকে খানিকটা বিস্তীর্ণ; সেইটুকুই ত্রিপদীর ঐ শেষ দুটো অতিরিক্ত মাত্রা।

এইরূপ অনেকগুলি ছন্দ দেখা যায় যাহাতে খানিকটা করিয়া বড়ো মাত্রাকে

একটি করিয়া ছোটো মাত্রা দিয়া বাধা দিবার কায়দা দেখা যায়। দশমাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত। ইহার ভাগ আট+দুই, অথবা চার+চার+দুই।

।　　　　　।　　　　।
মোর পানে | চাহ মুখ | তুলি |

।　　　　।　　　　।
পরশিব | চরণের | ধূলি।

ছয়মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়ো-ছোটোর ভাগ চলে। সেই ভাগ ছয়+দুই অথবা তিন+তিন+দুই। যেমন—

আঁখিতে | মিলিল | আঁখি।
হাসিল | বদন | ঢাকি।
মরম-বারতা শরমে মরিল কিছু না রহিল বাকি।

উক্ত ছন্দে তিনের দল বুক ফুলাইয়া জুড়ি মিলাইয়া চলিতেছিল, হঠাৎ মাঝে মাঝে একটা খাপছাড়া দুই আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে। এইরূপে গতি ও বাধার মিলনে ছন্দের সংগীত একটু বিশেষভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই বাধাটি গতির অনুপাতে ছোটো হওয়া চাই। কারণ, বড়ো হইলে সে বাধা সত্য হয় এবং গতিকে আবদ্ধ করে, সেটা ছন্দের পক্ষে দুর্ঘটনা। তাই উপরের দুইটি দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি চারের দল ও তিনের দলকে দুই আসিয়া রোধ করিয়াছে, সেইজন্য ইহা বন্ধনের অবরোধ নহে, ইহা লীলার উপরোধ। দুইয়ের পরিবর্তে এক হইলেও ক্ষতি হয় না। যেমন—

।　　　　　　।　　　　　　।
প্রতিদিন হায় | এসে ফিরে যায় | কে?

অথবা

।　　　　　।　　　　।
মুখে তার | নাহি আর | রা।

।　　　　　।　　　　।
লাজে লীন | কাঁপে ক্ষীণ | গা।

২

বাংলা ছন্দকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুই-বর্গের মাত্রা, তিন-বর্গের মাত্রা এবং অসমান মাত্রার ছন্দ।

দুই-বর্গ মাত্রার ছন্দ, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী। এই-সমস্ত ছন্দ বড়ো বড়ো বোঝা বহিতে পারে, কেননা দুই, চার, আট মাত্রাগুলি বেশ চৌকা। এইজন্য পৃথিবীতে পা-ওয়ালা জীবমাত্রেরই, হয় দুই, নয় চার, নয় আট পা। বাংলাসাহিত্যে ইহারাই মহাকাব্যের বাহন।

চাকার গুণ এই যে, একবার ধাক্কা পাইলে সেই ঝোঁকে সে গড়াইয়া চলে, থামিতে চায় না। তিনমাত্রার ছন্দ সেই চাকার মতো। দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।

নবীন | কিশোরী | মেঘের | বিজুরী | চমকি | চলিয়া | গেল।

এখানে তিনমাত্রার শব্দগুলি একটা আর-একটার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িয়া ঠেলা দিয়া চলিয়াছে, থামানো দায়। অবশেষে একটি দুইমাত্রা আসিয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ঠেকাইয়াছে।

দুইমাত্রার সঙ্গে তিনমাত্রার মিলনে অসম-মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি—৩+২, ৩+৪, ৫+৪ মাত্রার ছন্দ। তাহার দৃষ্টান্ত—

৩+২

কাঁপিলে পাতা, নড়িলে পাখি
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

৩+৪

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
অশনি গরগর হাঁকে।

৫+৪

বচন বলে আধো-আধো,
চরণ চলে বাধো-বাধো,
নয়ন তলে কাঁদো-কাঁদো চাহনি।

তিনমাত্রার ছন্দের ন্যায় অসম-মাত্রার ছন্দও স্বভাবত চঞ্চল। মাত্রার অসমানতাই তাহাকে কেবল টলাইতে থাকে। প্রত্যেক পদ পরবর্তী পদের উপর ঠেস দিয়া আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করে। বস্তুত তিনমাত্রাও অসম-মাত্রা, তাহার উপাদান দুই+এক।

কারণ ছন্দের মূল মাত্রা দুই, তাহা এক নহে। নিয়মিত গতিমাত্রই দুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া। তাই স্তম্ভ, যাহা থামিয়া থাকে, তাহা এক হইতে

পারে ; কিন্তু জন্তুর পা বলো, পাখির পাখা বলো, মাছের পাখনা বলো, দুইয়ের যোগে তবে চলে। সেই দুইয়ের নিয়মিত গতির উপরে যদি একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে একটা অনিয়মের বেগ পড়ে, সেই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বাড়িয়া যায় এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে। মানুষের শরীর তাহার দৃষ্টান্ত। চারপেয়ে মানুষ যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহার কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত টলমলে এবং কোমর হইতে পদতল পর্যন্ত মজবুত হওয়াতে এই দুইভাগের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। এই অসামঞ্জস্যকে ছন্দে সামলাইবার জন্য মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছে। চার পায়ের ছন্দ ইহার চেয়ে অনেক সরল।

৩

অতএব বাংলা ছন্দকে সম-মাত্রা, অসম-মাত্রা এবং বিষম-মাত্রায় শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। শুধু বাংলা কেন, কোনো ভাষার ছন্দের আরকোনো-প্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে প্রভেদ হয় কিসে? মাত্রাগুলির চেহারায়।

সংস্কৃত ভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্জনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য ঘটে। যথা—

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | -কৌমুদী |
হরতি দর | -তিমিরমতি | -ঘোরম্।[১]

ইহা পাঁচমাত্রা অর্থাৎ বিষম-মাত্রার ছন্দ। বাঙালি জয়দেব তাঁহার গানে সংস্কৃতভাষার যুক্তবর্ণের বেণী যথাসম্ভব এলাইয়া দিতে ভালোবাসিতেন, এইজন্য উপরের উদ্ধৃত শ্লোকাংশটি যথেষ্ট ভালো দৃষ্টান্ত নহে। তবু ইহাতে আমার কথাটি বুঝা যাইবে। ইহার প্রত্যেক ঝোঁকে যে পাঁচমাত্রা পড়িয়াছে তাহার ভাগ এইরূপ—

১ জয়দেব : গীতগোবিন্দ, গীত ১৯।১।

১+১+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+২ |
১+১+১+১+১ | ১+১+১+১+১ | ২+২+ - ।

বাংলাভাষার সাধুছন্দে একের মাঝে মাঝে দুই বসিবার জায়গা পায় না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। উপরের কবিতাটুকু বাংলায় তরজমা করিতে হইলে নিম্নলিখিতমত হইবে—

বচন যদি | কহ গো দুটি | দশনরুচি | উঠিবে ফুটি, |
ঘুচাবে মোর | মনের ঘোর | তামসী।

একটি ইংরেজি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

Ah, distinctly | I remember . |
It was in the | bleak December. | [1]

এটি চৌপদী ছন্দ। ইহার মাত্রাগুলিকে ছাড়াইয়া দেখা যাক।—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
Ah dis tinct ly | I re mem ber.

ইহার এক-একটা ঝোঁকে চারিটি করিয়া মাত্রা।[2] কিন্তু অসমান শব্দগুলিকে ভাগ করিয়া এই মাত্রাগুলি তৈরি হইয়াছে এবং distinct শব্দের tinct এবং remember শব্দের mem অংশটি নিজের একসেন্টের সড়কি আস্ফালন করিতেছে।

ইহাই সাধু বাংলায় হইবে—

আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাসে।

ইংরেজ কবি ইচ্ছা করিলেও এমনতরো নখদন্তহীন মাত্রায় ছন্দ রচিতেই পারেন না, কারণ তাঁহাদের শব্দগুলি কোণওয়ালা।

১ এডগার অ্যালান পো : *The Raven*।

২ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগে কৃত বিশ্লেষণ। প্রতি ঝোঁকে চার-মাত্রা করে ধরা ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রসম্মত নয়।

ইচ্ছা করিলে যুক্ত-অক্ষরের আমদানি করিয়া আমরা ঐ শ্লোকটাকে শক্ত করিয়া তুলিতে পারি। যেমন—

স্পষ্ট স্মৃতি চিত্তে ভাসে
দুরন্ত অঘ্রান মাসে
অগ্নিকুণ্ড নিবে আসে
নাচে তারি উপচ্ছায়া।

৪

এখানে বাংলার সঙ্গে ইংরেজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা শব্দগুলিতে স্বর-বর্ণের টান ইংরেজির চেয়ে বেশি। কিন্তু আমার প্রথম পত্রেই লিখিয়াছি সেটা কেবল সাধুভাষায়; বাংলার চলতি ভাষায় ঠিক ইহার উলটা। চলতি ভাষার কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না, ইংরেজি শব্দেরই মতো চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই।

পূর্বপত্রেই লিখিয়াছি বাংলা চলতি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাতধ্বনি, এইজন্য ধ্বনিহিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই এই চলতি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা প্রাকৃতের একটা চৌপদী নীচে লিখিলাম—

কই পালঙ্ক, কইরে কম্বল,
কপ্‌নি-টুক্‌রো রইল সম্বল,
এক্‌লা পাগ্‌লা ফির্‌বে জঙ্গল,
মিট্‌বে সংকট ঘুচ্‌বে ধন্দ।

ইহার সঙ্গে Ah distinctly I remember শ্লোকটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে ধ্বনির বিশেষ কোনো তফাত নাই।

ইহার সাধু পাঠ এইরূপ—

শয্যা কই বস্ত্র কই,
কী আছে কৌপীন বই,
একা বনে ফিরে ঐ,
নাহি মনে ভয় চিন্তা।

সাধু ও অসাধুর মাত্রাভাগ নীচেনীচে লিখিলাম। মিলাইয়া দেখিবেন—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কই। পা। লঙ্‌। ক॥ কই। রে। কম্‌। বল্‌॥
শ। য্যা। ক। ই॥ বস্‌। ত্র। ক। ই॥

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কপ্‌। নি। টুক্‌। রো॥ রই। ল। সম্‌। বল্‌॥
কী। আ। ছে। কৌ॥ পী। ন। ব। ই॥

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
এক্‌। লা। পাগ্‌। লা॥ ফির্‌। বে। জঙ্‌। গল্‌॥
এ। কা। ব। নে॥ ফি। রে। ও। ই॥

সাধুভাষার ছন্দটি যেন মোটা মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মতো, আর অসাধুটির একেবারে ঠাসবুনানি।

ইংরেজিতে সম-মাত্রার ছন্দ অনেক আছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত পুর্বেই দিয়াছি। অসম-মাত্রা অর্থাৎ তিনমাত্রার দৃষ্টান্ত। যথা—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
One | more | un || for | tu | nate ||

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
Wea | ry | of || breath — — ||

ইংরেজিতে বিষম-মাত্রার একটি উদাহরণ দিতে পারিলেই আপাতত আমার পালা শেষ হয়। একটি মনে পড়িতেছে—

১ ২ ৩ ৪ ৫
When | we | two | par | ted

১ ২ ৩ ৪
(In) si | lence | and | tears

১ ২ ৩ ৪ ৫
Half | bro | ken | heart | ed

১ ২ ৩ ৪
(To) se | ver | for | years

এই শ্লোকটির দুই লাইনকে মিলাইয়া এক লাইন করিয়া পড়িলে ইহার ছন্দকে তিনমাত্রায় ভাগ করিয়া পড়া সহজ হয়। কিন্তু বিষম-মাত্রার লয়ে ইহাকে পড়িলে চলে বলিয়াই এই দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছি। বোধ করি এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরেজি ছন্দে দুর্লভ।

দেখা গিয়াছে ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের আরম্ভেও পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে। আরম্ভে, যেমন—

O the dreary | dreary moorland |
O the barren | barren shore |

পদের শেষে, যেমন—

And are ye sure || the news is true ||
And are ye sure || he's well ||

বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না।

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

কিংবা

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

এমনটি হইবার জো নাই।

আমার কথাটি ফুরাল। ইংরেজি ছন্দকে আমি বাংলা ছন্দের রীতি-অনুসারে ভাগ করিয়া দেখিয়াছি, সেটা ভালো হইল কি না জানি না। ইংরেজি ছন্দতত্ত্ব আমার একদম জানা নাই বলিয়াই বোধ করি এরূপ দুঃসাহস আমার পক্ষে সহজ হইয়াছে। কারণ চাণক্য যাহাদিগকে কথা কহিতে বারণ করেন তাহারাই আগেভাগে কথা কহিয়া বসে; আপনারাও জানেন angelরা প্রবেশ করিতে ভয় পান এমন জায়গা আছে, কিন্তু foolদের কোথাও বাধা নাই। এরূপ সতর্কতায় সকল সময়েই যে এঞ্জেলরা জেতেন তাহা নহে, অনেক সময়েই ঠকিয়া থাকেন; অবুঝ হঠকারিতায় অপর পক্ষের কখনো কখনো জিত হইবার

সম্ভাবনা আছে এই আমার ভরসা। আপনার পক্ষে বোঝা সহজ হইতে পারে বলিয়াই আমি ইংরেজি দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করিয়াছি, ইহাতে আমার বিদ্যা প্রকাশ না হইয়া বিদ্যা ফাঁস হইয়া যাইতে পারে।

অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনকে লিখিত পত্র : ১৮ আষাঢ় ১৩২১
সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১ : 'বাংলা ছন্দ'

সংগীত ও ছন্দ

বিচিত্রা ক্লাবে পঠিত (ভাদ্র ১৩২৪)

অনেকদিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য যতই বিনয় করি না কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছুকিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যে-রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের ওস্তাদী দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে-নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সংকীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচ বোধ করি নাই।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে, এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কী উৎপাত ঘটিল, একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক আমার গানের কথাটি এই—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।
দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমার নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝরঝর
তোমার আঁখি'পরে ভরভর।

যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কী মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর
বাদল নিশীথের ঝরঝর।

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ-ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই, তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ। ছন্দটাতে দোষ হয় নাই, কেন তাহা বলি। এই ছন্দ তিন এবং চার মাত্রার যোগে তৈরি। এইজন্যই "তোমার নীলবাসে" এই সাতমাত্রার পর "নিল কায়া" এই চারমাত্রা খাপ খাইল। তিনমাত্রা হইলেও ক্ষতি হইত না। যেমন, "তোমার নীলবাসে মিলিল।" কিন্তু ইহার মধ্যে ছয়মাত্রা কিছুতেই সইবে না। যেমন, "তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর।" অথচ প্রথম অংশে যদি ছয়ের ভাগ থাকিত তবে দিব্য চলিত। যেমন, "তোমার সুনীল বাসে ধরিল শরীর"। এ আমি বলিতেছি কানের স্বাভাবিক রুচির কথা। এই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার পথ। অতএব এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব?

আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সবসুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রাবিভাগ নাই। যেমন—

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি'
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল
সুখবেদনা মনে বাজিবে।

মরমে মুরছিয়া　　　　মিলাতে চাবে হিয়
সেই চরণযুগ-রাজীবে।

ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রা ভাগ ৩+৪+৩=১০। তৃতীয় লাইনে ৩+৪+৩+৪=১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব উৎসাহ করিয়া গান ধরিলাম। কিন্তু এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল, "আমার সমের মাশুল চুকাইয়া দাও।" আমি তো বলি এটা বে-আইনি আবোয়াব। কান-মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়[১]। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে; আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দিই—

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে'।
　　আকাশে কী গোপন বাণী
　　বাতাসে করে কানাকানি,
　　বনের অঞ্চলখানি
　　　　পুলকে উঠে দুলে দুলে।
বেদনা সুমধুর হয়ে
ভুবনে গেল আজি বয়ে।

১ 'লয়' এখানে সুরের গতিসাম্য (tempo) অর্থে ব্যবহৃত নয়, ধ্বনির বিভিন্ন রকম স্পন্দন-ভঙ্গি (rhythm) অর্থে ব্যবহৃত। সংজ্ঞাপরিচয় দ্রষ্টব্য।

বাঁশিতে মায়া তান পুরি
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি
বিরহসাগরের কূলে ॥

এটা যে কী তাল তা আমি আনাড়ি জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না। গণিয়া দেখিলে দেখি প্রত্যেক লাইনে নয় মাত্রা। যদি এমন বলা যায় যে, না-হয় নয় মাত্রায় একটা নূতন তালের সৃষ্টি করা যাক তবে আর-একটা নয়মাত্রার গান পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।—

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু
মনে মনে তারে পুজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে
মহাপারাবার পারায়ে,
ফিরিল না আর তরীতে
আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে
কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল ॥

এও নয় মাত্রা, কিন্তু এর ছন্দ আলাদা। প্রথমটার লয় ছিল তিনে-ছয়ে, দ্বিতীয়টার লয় ছয়ে-তিনে। [আরো একটা নয়ের তাল দেখা যাক।

আঁধার রজনী পোহাল
জগৎ পূরিল পুলকে,

বিমল প্রভাত-কিরণে
মিলিল দ্যুলোকে ভূলোকে।

নয় মাত্রা বটে, কিন্তু এ ছন্দ স্বতন্ত্র। ইহার লয় তিন-তিন-তিনে। ইহাকে কোন্ নাম দিবে?] আরো একটা দেখা যাক।—

দুয়ার মম পথপাশে,
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে,
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
শ্রাবণ শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুন শুনি বায়ুবেগে
জাগায় মৃদু মরমর,
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তারি থাকি থাকি।
কখন তার রথ আসে,
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
সবাই দেখি যায় চলে
পিছন পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎমেঘ ভেসে ভেসে
উধাও হয়ে যায় দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন্ সুরপুরে,—
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর প্রাণ-পাখি।
কখন তার রথ আসে,
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি॥

[এও তো আর-এক ছন্দ। ইহার লয় পাঁচে-চারে মিলিয়া। আবার

এইটেকে উলটাইয়া দিয়া চারে-পাঁচে করিলে নয়ের ছন্দকে লইয়া নয়-ছয় করা যাইতে পারে।] চৌতাল তো বারোমাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বারোমাত্রা রক্ষা করিলেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন হয়। এই তো বারো-মাত্রা—

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে,
ভ্রমর মুখরিত বকুলছায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।

ইহা চৌতালও নহে, একতালাও নহে, ধামারও নয়, ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করে।

কিন্তু হাল আমলে এ-সমস্ত উৎপাত চলিবে না। আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা যে-নিয়ম সত্য সে-নিয়ম বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে-নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে। সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সংগীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নবনব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২৪ : 'সংগীতের মুক্তি' (অংশ)

ছন্দের অর্থ

প্রথম পর্যায়

বিচিত্রা ক্লাবে পঠিত (৬ চৈত্র ১৩২৪)

শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক্‌ ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরো কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস। অর্থাৎ সে-জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন এই রসই হচ্ছে কাব্যের বিষয়।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, অনির্বচনীয় শব্দটার মানে অভাবনীয় নয়। তা যদি হত তা হলে ওটা কাব্যে অকাব্যে কুকাব্যে কোথাও কোনো কাজে লাগত না। বস্তু পদার্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায়, কিন্তু রস পদার্থের করা যায় না। অথচ রস আমাদের একান্ত অনুভূতির বিষয়। গোলাপকে আমরা বস্তুরূপে জানি, আর গোলাপকে আমরা রসরূপে পাই। এর মধ্যে বস্তু-জানাকে আমরা সাদা কথায় তার আকার আয়তন ভার কোমলতা প্রভৃতি বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু রস পাওয়া এমন একটি অখণ্ড ব্যাপার যে তাকে তেমন করে সাদা কথায় বর্ণনা করা যায় না; কিন্তু তাই বলেই সেটা অলৌকিক অদ্ভুত অসামান্য কিছুই নয়। বরঞ্চ রসের অনুভূতি বস্তুজ্ঞানের চেয়ে আরো প্রবলতর গভীরতর। এইজন্য গোলাপের আনন্দকে আমরা যখন অন্যের মনে সঞ্চার করতে চাই তখন একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার রাস্তা দিয়েই করে থাকি। তফাত এই, বস্তু-অভিজ্ঞতার ভাষা সাদা কথার বিশেষণ, কিন্তু রস-অভিজ্ঞতার ভাষা আকার ইঙ্গিত সুর এবং রূপক। পুরুষমানুষের যে-পরিচয়ে তিনি আপিসের বড়ো বাবু সেটা আপিসের খাতাপত্র দেখলেই জানা যায়, কিন্তু মেয়ের যে-পরিচয়ে তিনি গৃহলক্ষ্মী সেটা প্রকাশের জন্যে তাঁর সিঁথেয় সিঁদুর, তাঁর হাতে কঙ্কণ। অর্থাৎ এটার মধ্যে

রূপক চাই, অলংকার চাই ; কেননা কেবলমাত্র তথ্যের চেয়ে এ যে বেশি, এর পরিচয় শুধু জ্ঞানে নয়, হৃদয়ে। ঐ যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মী বলা গেল এইটেই তো হল একটা কথার ইশারামাত্র ; অথচ আপিসের বড়োবাবুকে তো আমাদের কেরানি-নারায়ণ বলবার ইচ্ছাও হয় না, যদিও ধর্মতত্ত্বে বলে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে আপিসের বড়োবাবুর মধ্যে অনির্বচনীয়তা নেই ; কিন্তু যেখানে তাঁর গৃহিণী সাধ্বী সেখানে তাঁর মধ্যে আছে। তাই বলে এমন কথা বলা যায় না যে, ঐ বাবুটিকেই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি আর মা-লক্ষ্মীকে বুঝি নে, বরঞ্চ উলটো। কেবল কথা এই যে, বোঝবার বেলায় মা-লক্ষ্মী যত সহজ বোঝাবার বেলায় তত নয়।

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোনো-এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেছে। এমন কাণ্ড দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঘটে। এইটুকু বলবার জন্যে কথাকে বেশি নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে, অর্থাৎ এমন জায়গায় কাজ করতে থাকে যে-জায়গা দেখাশোনার অতীত, এবং এমন কাজ করতে থাকে যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে যার সাক্ষ্য নেওয়া যায় না, তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পুরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি আদায় করে নিতে হয়। অর্থাৎ আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে।

এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে আছে তার ঠিকানা নেই। এই বেগের বৈচিত্র্যেই তো আলোকের রঙ বদল হচ্ছে, শব্দের সুর বদল হচ্ছে, এবং লীলাময়ী সৃষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করছে। এমন-কি, সৃষ্টির বাইরের পর্দা সরিয়ে ভিতরের রহস্যনিকেতনে যতই প্রবেশ করা যায় ততই বস্তুত্ব ঘুচে গিয়ে কেবল বেগই প্রকাশ পেতে থাকে। শেষকালে এই কথাই মনে হয় প্রকাশবৈচিত্র্যের মূলে বুঝি এই বেগবৈচিত্র্য। যদিদং সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

মানুষের সত্তার মধ্যে এই অনুভূতিলোকই হচ্ছে সেই রহস্যলোক যেখানে

বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠছে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্ছে। এইজন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভরতি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।

শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হল তাই। সেইজন্যে কবি ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবে না। "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" কেবলি ঢেউ উঠতে লাগল। ঐ কটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভালো মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে, কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনো দিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।

আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেছে তা সবাই জানেন। দুটি পাখির মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মারলে তখন বাল্মীকি মনে যে ব্যথা পেলেন সেই ব্যথাকে শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। যে পাখিটা মারা গেল এবং আর যে-একটি পাখি তার জন্যে কাঁদল তারা কোন্‌ কালে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই নিদারুণতার ব্যথাটিকে তো কেবল কালের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। সে যে অনন্তের বুকে বেজে রইল। সেই-জন্যে কবির শাপ ছন্দের বাহনকে নিয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুটতে চাইলে। হায় রে, আজও সেই ব্যাধ নানা অস্ত্র হাতে নানা বীভৎসতার মধ্যে নানা দেশে নানা আকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেই আদিকবির শাপ শাশ্বতকালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে রইল। এই শাশ্বতকালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই তো ছন্দ।

আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।

গোড়াতেই ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি ওকালতি করা হয়তো বাহুল্য বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি এমন লোক আছেন যাঁরা ছন্দকে সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা বলে মনে করেন। তাই আমাকে এই গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে বলতে হল যে, পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেগ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় করে আপন গতিকে প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করে সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।

এইখানে কাব্যের সঙ্গে গানের তুলনা করে আলোচ্য বিষয়টাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক।

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতিবেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র, তার যেন কোনো অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে সুখে দুঃখে বিচলিত হই। সেই ঘটনা সত্যও হতে পারে, কাল্পনিকও হতে পারে, অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের মতো প্রতিভাত হতে পারে। তারই আঘাতে আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়, সেই নাড়ার প্রকারভেদে আমাদের আবেগের প্রকৃতিভেদ ঘটে। কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে নাড়া দেয় সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিতভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দনবেগেই নিজেকে জানে, বাইরের সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়।

সংসারে আমাদের জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে নানা দায় জড়ানো আছে। জৈবিক দায়, বৈষয়িক দায়, সামাজিক দায়, নৈতিক দায়। তার জন্যে নানা চিন্তায় নানা কাজে আমাদের চিত্তকে বাইরে বিক্ষিপ্ত করতে হয়। শিল্পকলায়, কাব্যে এবং রসসাহিত্যমাত্রেই আমাদের চিত্তকে সেই-সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেয়। তখন আমাদের চিত্ত সুখদুঃখের মধ্যে আপনারই বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখতে পায়। সেই প্রকাশই আনন্দ। এই প্রকাশকে আমরা চিরন্তন

বলি এইজন্যে যে, বাইরের ঘটনাগুলি সংসারের জাল বুনতে বুনতে নানা প্রয়োজন সাধন করতে করতে সরে যায়, চলে যায়,— তাদের নিজের মধ্যে নিজের কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের চিত্তের যে আত্মপ্রকাশ তার আপনাতেই আপনার চরম, তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই পর্যাপ্ত। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চবিরহিণীর দুঃখ কোনোখানেই নেই, কিন্তু আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতির মধ্যে সেই বেদনার তার বাঁধা হয়েই আছে। সে ঘটনা এখন ঘটছে না, বা সে ঘটনা কোনো কালেই ঘটে নি, এ কথা তার কাছে প্রমাণ করে কোনো লাভ নেই।

যা হোক, দেখা যাচ্ছে গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয় সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদিনির্ঝরের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।

কাব্যেও আমরা আমাদের চিত্তের এই আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং মুক্ত-ভাবে অথচ বিচিত্র আকারে পেতে চাই। কিন্তু কাব্যের প্রধান উপকরণ হল কথা। সে তো সুরের মতো স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্ছে। অতএব কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ সেটা এমন-কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ।

কিন্তু যেহেতু কথা জিনিসটা স্বপ্রকাশ নয়, এইজন্যে সুরের মতো কথার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সাধর্ম্য নেই। আমাদের চিত্ত বেগবান্, কিন্তু কথা স্থির। এ প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা এই বিষয়টার আলোচনা করেছি। বলেছি, কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহনযোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কী অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেইজন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের

ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা। সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

রজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিযে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমচ্ছে— বিষয়টা এইমাত্র, কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুলতেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল— এমন-কি, জর্মন কাইজার আজ যে চার বছর ধরে এমন দুর্দান্তপ্রতাপে লড়াই করছে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং অনিত্য। ঐ লড়াইয়ের তথ্যটাকে একদিন বহুকষ্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ করে ছেলেদের একজামিন পাস করতে হবে; কিন্তু 'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে', এ পড়া-মুখস্থ করার জিনিস নয়। এ আমরা আপনার প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং যা দেখব সেটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেয়ে অনেক বেশি। এই কথাটাকেই আর-এক ছন্দে লিখলে বিষয়টা ঠিকই থাকবে, কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বেশি যেটা, তার অনেকখানি বদল হবে।

শ্রাবণমেঘে তিমিরঘন শর্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্মরি।
জলদরব-ঝংকারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম সুখতন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনুবল্লরী;
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি॥

এই ছন্দে হয়তো বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে, কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুটল না। এ আর-এক জিনিস হল।

ছন্দ কবিতার বিষয়টির চারদিকে আবর্তন করছে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে, এও সেইরকম। গাছের বস্তুপদার্থ তার ডালের মধ্যে গুঁড়ির মধ্যে মজ্জাগত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার

লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য, বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল, এ সমস্ত প্রধানত তার পাতার ছন্দে।

২

পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মতো কাব্যে ছন্দের আবর্তনের দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড়ো গতি আর একটি ছোটো গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। দৃষ্টান্ত দেখাই।

শরদচন্দ পবন মন্দ, বিপিন ভরল কুসুমগন্ধ

এর প্রত্যেকটি হল চলন। এমন আটটি চলনে এই ছন্দের চাল সারা হচ্ছে। অর্থাৎ ছয়ের মাত্রায় এ পা ফেলছে এবং আটের মাত্রায়[১] ঘুরে আসছে। 'শরদচন্দ' এই কথাটি ছয় মাত্রার, 'শরদ' তিন এবং 'চন্দ'ও তিন। বলা বাহুল্য, যুক্ত অক্ষরে দুই অক্ষরের মাত্রা আছে[২], এই কারণে 'শরদচন্দ' এবং 'বিপিনে ভরল' ওজনে একই।

১	২	৩	৪
শরদচন্দ	পবন মন্দ,	বিপিন ভরল	কুসুমগন্ধ,
৫	৬	৭	৮
ফুল্ল মল্লি	মা-লতি যুথি	মত্তমধুপ	ভো-রনি।[৩]

প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর করছে। কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্তন সকল ছন্দেই চলে। বস্তুত এইটেই হচ্ছে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা—

১	২	৩	৪
মহাভার	-তের কথা	অমৃত স	-মান,

---

১ 'মাত্রা' শব্দের মূলগত অর্থ 'পরিমাপক'। এখানে মাত্রা শব্দটি তার মূলগত অর্থেই, অর্থাৎ পরিমাপক অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। তাই 'পদক্ষেপের মাত্রা' ও 'প্রদক্ষিণের মাত্রা', এই দুরকম মাত্রা মেনে নিতে বাধা হয় নি।

২ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর' প্রবন্ধ, পাদটীকা ২।

৩ গোবিন্দদাসের পদাবলীতে আছে 'বিপিনে', 'ফুল্ল মল্লিকা' ও 'মত্ত মধুকর'। বলা বাহুল্য, এই পাঠের ছন্দ নির্দোষ নয়। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত' পদরত্নাবলী' (১২৯২ বৈশাখ), ১০১-সংখ্যক রচনা।

৫ ৬ ৭ ৮
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্য -বান্।

এও আট পদক্ষেপ।

১ ২ ৩ ৪
[(To·) night the winds be -gin to rise

৫ ৬ ৭ ৮
(And) roar from yonder dropping day.

এই কবিতার প্রদক্ষিণের মাত্রাভাগও আট, আবার

১ ২ ৩ ৪
When we two parted in silence and tears

৫ ৬ ৭ ৮
Half broken -hearted to sever for years.

এ কবিতারও তাই। কিন্তু কানে শোনবামাত্রই বোঝা যায় এরা ভিন্ন জাতের ছন্দ।]

এই জাত নির্ণয় করতে হলে চালের দিকে ততটা নয়, কিন্তু চলনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। দিলে দেখা যাবে, ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষমচলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসমমাত্রার চলন এবং দুই-তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষমমাত্রার ছন্দ।

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে পিছু পানে চায়,
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে, চলা হল দায়।

এ হল দুই মাত্রার চলন। দুইয়ের গুণফল চার বা আটকেও আমরা এক জাতেরই গণ্য করি।

নয়নধারায় পথ সে হারায়, চায় সে পিছন পানে,
চলিতে চলিতে চরণ চলে না, ব্যথার বিষম টানে।

এ হল তিন মাত্রার চলন। আর

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভরে ওঠে,
চরণ বাধে, পরান কাঁদে, পিছনে মন ছোটে।

এ হল দুই-তিনের যোগে বিষমমাত্রার ছন্দ।

তা হলেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতিভেদ। [আমরা যে-দুটি ইংরেজি কবিতা উপরে উদ্‌ধৃত করেছি তার মধ্যে একটার চলন সমমাত্রার অর্থাৎ দুই মাত্রার, অন্যটার চলন অসমমাত্রার অর্থাৎ তিন মাত্রার ; তাল দিয়ে গুনে দেখলেই সেটা ধরা পড়বে। ইংরেজিতে বিষমমাত্রার ছন্দ আমার চোখে পড়ে নি।]

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে। প্রাকৃত বাংলায় যত কবিতা আছে তার ছন্দসংখ্যা বেশি নয়। সমমাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত—

কেন তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতল লেখি॥

এ ছাড়া পয়ার এবং ত্রিপদী আছে, সেও সমমাত্রার ছন্দ। অসমমাত্রার অর্থাৎ তিনের ছন্দ চার রকমের পাওয়া যায়।

মলিন বদন ভেল,
ধীরে ধীরে চলি গেল।
আওল রাইর পাশ।
কি কহিব জ্ঞান -দাস॥

জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন।
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন -তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী -পারা॥

বেলি অবসান -কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষত হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে॥

বিষমমাত্রার দৃষ্টান্ত কেবল একটা চোখে পড়েছে, সেও কেবল গানের আরম্ভে—শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি।

চিকনকালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥[১]

বাংলায় সমমাত্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সবচেয়ে প্রচলিত। এই দুটি ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এদের চলন খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামতো চালাচালি করতে পারেন।

পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে

এর মধ্যে যে কতটা ফাঁক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়।

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে

ভারি হল না।

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে

এতেও বিশেষ ভিড় বাড়ল না।

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে

এও বেশ সহ্য হয়।

সংগীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে

এতেও অত্যন্ত ঠেসাঠেসি হল না।

সংগীততরঙ্গরঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস

অনুপ্রাসের ভিড় হল বটে, কিন্তু এখনো অন্ধকূপহত্যা হবার মতো হয় নি। কিন্তু এর বেশি আর সাহস হয় না। তবু যদি আরো প্যাসেঞ্জার নেওয়া যায় তা হলে যে একেবারে পয়ারের নৌকাডুবি হবে তা নয়, তবে কিনা হাঁপ ধরবে। যথা—

দুর্দান্তপাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু দুই মাত্রার ছন্দ মাত্রেরই যে এইরকম অসাধারণ শোষণশক্তি তা বলতে পারি নে। যেখানে পদক্ষেপ ঘন ঘন সেখানে ঠিক উলটো।
যথা—

১ 'বাজন নূপুর' ও 'তেরছ নয়ানে', এই দুই পর্বেও বিষমমাত্রার ভঙ্গি অর্থাৎ তিন-দুই হিসাবে মাত্রাসমাবেশের রীতি বজায় থাকে নি।

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
ধরণীর আঁখিনীর মোচনের ছলে,
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
দেবতার অবতার বসুধার তলে।

এও পয়ার। কিন্তু যেহেতু এর পদক্ষেপ আটে নয়, দুইয়ে, সেইজন্যে এর উপরে বোঝা সয় না। যে দ্রুত চলে তাকে হালকা হতে হয়। যদি লেখা যায়

ধরিত্রীর চক্ষুনীর মুঞ্চনের ছলে,
কংসারির শঙ্খরব সংসারের তলে।

তা হলে ও একটা স্বতন্ত্র ছন্দ হয়ে যায়। সংস্কৃতেও দেখো, সমমাত্রার ছন্দ যেখানে দুয়ের লয়ে চলে সেখানে দৌড় বেশি। যেমন—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
হরিরিহ বিহরতি সরসব -সন্তে।

[ইংরেজিতেও তাই—

১ ২ ১ ২ ১ ২ . ১ ২
Ah dis | -tinctly | I re | -member |
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
It was | in the | bleak De | -cember |

বাংলা পয়ারের মতো এদের গম্ভীর মন্থর চলন নয়। কিন্তু ঐ ইংরেজিতে দুইয়ের চলনের বদলে চারের চলন যেখানে আসে সেখানে কেবল যে মন্থরতা তা নয়, ছন্দের স্বাধীনতা বাড়ে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(O) Goddess, hear these | tuneless numbers, | wrung |
১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(By) sweet enforcement | and remembrance | dear. |

এইখানে বলা আবশ্যক wrung এবং dear শব্দকে দুই মাত্রা বলে গণ্য করেছি, তার কারণ উচ্চারিত syllableএর এক মাত্রার সঙ্গে বিরামের এক মাত্রা[১] যোগ না করলে ছন্দ সম্পূর্ণ হয় না।]

১ বাংলায় বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত একদল (monosyllabic) শব্দ সর্বদাই দুই মাত্রার মূল্য পেয়ে থাকে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলে বিরাম বা যতির মাত্রাপরিমাণও গণনা করে থাকেন। এরকম যতিমাত্রাকে অন্যত্র বলা হয়েছে 'অনুচ্চারিত মাত্রা'।

অসম অর্থাৎ তিন মাত্রার চলনও দ্রুত।

পাষাণ মিলায় গায়ের বাতাসে

এর লয়টা দুরন্ত। পড়লেই বোঝা যায় এর প্রত্যেক তিন মাত্রা পরবর্তী তিন মাত্রাকে চাচ্ছে, কিছুতেই তর সচ্ছে না। তিনের মাত্রাটা টলটলে, গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক। এইজন্যে তিনকে গুণ করে ছয় বা বারো করলেও তার চাপল্য ঘোচে না। দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্র, তিন মাত্রার চঞ্চল, চার মাত্রার মন্থর, আট মাত্রার গম্ভীর। তিন মাত্রার ছন্দে যে পয়ারের মতো ফাঁক নেই তা যুক্তাক্ষর জুড়তে গেলেই ধরা পড়বে। যথা—

গিরির গুহায় ঝরিছে নিঝর

এই পদটিকে যদি লেখা যায়

পর্বতকন্দরে ঝরিছে নির্ঝর

তা হলে ছন্দের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। অথচ পয়ারে

গিরিগুহাতল বেয়ে ঝরিছে নিঝর

এবং

পর্বতকন্দরতলে ঝরিছে নির্ঝর

ছন্দের পক্ষে দুই সমান।

বিষমমাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

অহহ কল -য়ামি বল -য়াদিমণি -ভূষণং
হরিবিরহ -দহনবহ -নেন বহু -দূষণং।

তিন মাত্রার 'অহহ' যে ছাঁদে চলবার জন্যে বেগ সঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার 'কল' তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে, আবার পরক্ষণেই তিন যেই নিজমূর্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হত, তা হলে ছন্দই হত না ; এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উসকিয়ে দেয় এবং বিচিত্র করে তোলে। এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষমমাত্রার ছন্দে গতিকে আরো যেন বেশি অনুভব করা যায়।

যাই হোক আমার বক্তব্য এই, ছন্দের পরিচয়ের মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্ছে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে কটি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্ছে, সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ। আমরা যখন মোটা করে

বলে থাকি যে, এটা চোদ্দ মাত্রার ছন্দ, বা ওটা দশ মাত্রার, তখন আসল কথাটাই বলা হয় না। তার কারণ পূর্বেই বলেছি চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা যায় না, চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়।

চোদ্দ মাত্রায় শুধু যে পয়ার হয় না, আরো অনেক ছন্দ হয় তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বসন্ত পাঠায় দূত রহিয়া রহিয়া,
যে কাল গিয়েছে তারি নিশ্বাস বহিয়া।

এই তো পয়ার, এর প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপে আটটি উচ্চারিত মাত্রা, দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছয়টি উচ্চারিত মাত্রা এবং দুটি অনুচ্চারিত অর্থাৎ যতির মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদক্ষিণে মোটের উপর উচ্চারিত মাত্রা চোদ্দ। আমরা পয়ারের পরিচয় দেওয়ার কালে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের উচ্চারিত মাত্রার সমষ্টির হিসাব দিয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, কিছুকাল পূর্বে পয়ার ছাড়া চোদ্দ মাত্রাসমষ্টির ছন্দ আমাদের ব্যবহারে লাগত না। নিম্নলিখিত চোদ্দ মাত্রার ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতোই প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি করে পদক্ষেপ।

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

অথচ এটা মোটেই পয়ার নয়। তফাত হল কিসে যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে যে, এর প্রতি পদক্ষেপে আটের বদলে সাত উচ্চারিত মাত্রা। আর অনুচ্চারিত মাত্রা প্রতি পদক্ষেপের শেষে একটি করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ফাগুন এল দ্বারে-এ কেহ যে ঘরে না-আই।

কিংবা কেবল শেষ ছেদে একটি দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে না-আই।

কিংবা যতি[১] একেবারেই না দেওয়া যেতে পারে।

পুনশ্চ এই ছন্দেরই মাত্রাসমষ্টি সমান রেখে এরই পদক্ষেপমাত্রার পরিবর্তন করে যদি পড়া যায়, তা হলে শ্লোকটি চোখে দেখতে একই রকম থাকবে, কিন্তু

১ এখানে 'যতি' মানে যতির মাত্রা বা অনুচ্চারিত মাত্রা।

কানে শুনতে অন্য রকম হবে। এইখানে বলে রাখি, ছন্দের প্রত্যেক ভাগে একটা করে তালি দিলে পড়বার সুবিধা হবে এবং এই তালি অনুসারে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন লয়[১] ধরা পড়বে। প্রথমে সাত মাত্রাকে তিন এবং চারে স্বতন্ত্র ভাগ করে পড়া যাক। যেমন—

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

তার পরে পাঁচ-দুই ভাগ করা যাক। যেমন—

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

এই চোদ্দ মাত্রাসমষ্টির ছন্দ আরো কত রকম হতে পারে তার কতকগুলি নমুনা দেওয়া যাক। দুই-পাঁচ দুই-পাঁচ ভাগের ছন্দ। যথা—

। । । ।
সে যে আপন মনে শুধু দিবস গণে*
তার চোখের বারি কাঁপে আঁখির কোণে।

চার-তিন চার-তিন ভাগ—

। । । ।
নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।

কিংবা এক-ছয় এক-ছয় ভাগ—

। । । ।
যে কথা নাহি শোনে সে থাক্ নিজমনে,
কে বৃথা নিবেদনে রে ফিরে তার সনে।

১ 'লয়' শব্দের আসল অর্থ ধ্বনিপ্রবাহের গতিক্রম (tempo)। কিন্তু এখানে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ধ্বনির তরঙ্গভঙ্গি অর্থাৎ ছন্দের স্পন্দন (rhythm) অর্থে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলেই 'লয়' শব্দটিকে এই দ্বিতীয় অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য : 'সংগীত ও ছন্দ' প্রবন্ধ দ্বিতীয় বিভাগ, পাদটীকা ১।

* এই প্রত্যেক দণ্ডচিহ্নের অনুসরণ করে তাল দেওয়া আবশ্যক।—গ্রন্থকার

সাত-চার-তিনের ভাগ—

।　　　　　　।　　　　।
চাহিছ বারে বারে　আপনারে　ঢাকিতে,
মন না মানে মানা　মেলে ডানা　আঁখিতে।

এই কবিতাটাকেই অন্য লয়ে পড়া যায়—

।　　　।　　　।　　　।
চাহিছ　বারে বারে　আপনারে　ঢাকিতে,
মন না　মানে মানা　মেলে ডানা　আঁখিতে।

তিন-তিন-তিন-তিন-দুইয়ের ভাগ—

।　　　।　　　।　　　।　　　।
ব্যাকুল　বকুল　ঝরিল　পড়িল　ঘাসে,
বাতাস　উদাস　আমের　বোলের　বাসে।

একেই ছয়-আটের ভাগে পড়া যায়—

।　　　　　।
ব্যাকুল বকুল　ঝরিল পড়িল ঘাসে,
বাতাস উদাস　আমের বোলের বাসে।

পাঁচ-চার-পাঁচের ভাগ—

।　　　　　।　　　　।
নীরবে গেলে　ম্লানমুখে　আঁচল টানি,
কাঁদিছে দুখে　মোর বুকে　না-বলা বাণী।

এই শ্লোককেই তিন-ছয়-পাঁচ ভাগ করা যায়—

।　　　।　　　　　।
নীরবে　গেলে ম্লানমুখে　আঁচল টানি,
কাঁদিছে　দুখে মোর বুকে　না-বলা বাণী।

এর থেকে এই বোঝা যাচ্ছে, প্রদক্ষিণের সমষ্টিমাত্রা চোদ্দ হলেও সেই সমষ্টির অংশের হিসাব কে কী ভাবে নিকাশ করছে তারই উপর ছন্দের প্রভেদ ধরা পড়ে। কেবল ছন্দরসায়নে নয়, বস্তুরসায়নেও এইরকম উপাদানের মাত্রাভাগ নিয়েই বস্তুর প্রকৃতিভেদ ঘটে, রাসায়নিকেরা বোধ করি এই কথা বলেন।

পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। যথা—

ওহে পান্থ, চলো পথে, পথে বন্ধু আছে
একা বসে ম্লানমুখে, সে যে সঙ্গ যাচে।

'ওহে পান্থ', এইখানে একটা থামবার স্টেশন মেলে। তার পরে যথাক্রমে 'ওহে পান্থ চলো', 'ওহে পান্থ চলো পথে', 'ওহে পান্থ চলো পথে পথে'। তার পরে 'বন্ধু আছে' এই ভগ্নাংশটার সঙ্গে পরের লাইন জোড়া যায়, যেমন—'বন্ধু আছে একা', 'বন্ধু আছে একা বসে', 'বন্ধু আছে একা বসে সে যে'।

কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এইজন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামতো থামা চলে না। যেমন—

নিশি দিল ডুব অরুণসাগরে।

'নিশি দিল', এখানে থামা যায়, কিন্তু তা হলে তিনের ছন্দ ভেঙে যায়। 'নিশি দিল ডুব' পর্যন্ত এসে ছয় মাত্রা পুরিয়ে দিয়ে তবেই তিনের ছন্দ হাঁফ ছাড়তে পারে। কিন্তু আবার, 'নিশি দিল ডুব অরুণ' এখানেও থামা যায় না। কেননা তিন এমন একটি মাত্রা যা আর-একটা তিনকে পেলে তবে দাঁড়াতে পারে, নইলে টলে পড়তে চায়। এইজন্য 'অরুণসাগর'এর মাঝখানে থামতে গেলে রসনা কুল পায় না। তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্যপ্রকাশের পক্ষে ভালো, কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য এবং প্রসার অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়, সে যেন চাকা নিয়ে লাঠিখেলার চেষ্টা।

পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায়, 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল—'সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু'; তার পরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল— 'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে'; তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে— 'কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি'; তার পরে আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল—

'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি'।

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই দুই মাত্রার এবং তিন মাত্রার, এবং ত্রৈমাত্রিক শব্দের উপর বিভক্তিযোগে চার মাত্রার। পয়ারের পদবিভাগটি এমন যে, দুই তিন এবং চার মাত্রার শব্দ তাতে সহজেই জায়গা পায়।

চৈত্রের সেতারে বাজে বসন্তবাহার,
বাতাসে বাতাসে ওঠে তরঙ্গ তাহার।

এ পয়ারে তিন অক্ষরের ভিড়। আবার

চকমকি-ঠোকাঠুকি-আগুনের প্রায়,
চোখোচোখি ঘটিতেই হাসি ঠিকরায়।

এই পয়ারে চারের প্রাধান্য।

তারাগুলি সারারাতি কানে কানে কয়,
সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।

এইখানে দুই মাত্রার আয়োজন।

প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে,
কে সেথা দেবাধিপতি সে কথা কে জানে।

এই পয়ারে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সকল রকম মাত্রারই সমাবেশ। এর থেকে জানা যায় পয়ারের আতিথেয়তা খুব বেশি, আর সেইজন্যেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রথম থেকেই পয়ারের এত অধিক চলন।

পয়ারের চেয়ে লম্বা দৌড়ের সমমাত্রার ছন্দ আজকাল বাংলাকাব্যে চলছে। 'স্বপ্নপ্রয়াণে' এর প্রথম প্রবর্তন[1] দেখা গেছে। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকেই তার নমুনা তুলে দেখাই।

গম্ভীর পাতাল, যেথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসংঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে— প্রাণ যথা কালের কবল।

১ এই দীর্ঘতর পয়ারের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যে (১৮৫৮)। এই পয়ারকে অন্যত্র বলা হয়েছে 'মহাপয়ার'।

উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত মাত্রা নিয়ে পয়ার যেমন আট পদমাত্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত, এ তা নয়। এর একভাগে উচ্চারিত মাত্রা আট, অন্যভাগে উচ্চারিত মাত্রা দশ। এইরকম অসমান ভাগে ছন্দের গাম্ভীর্য বাড়ে। ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মতো দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙে দিলে ছন্দের গৌরব আরো বাড়ে।

[ইংরেজি কাব্যে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

(O) Wild West Wind, thou | breath of Autumn's being |

এর প্রথম ভাগে চার মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে যতিসমেত ছয় মাত্রা। মিল্টনের

Hail holy light, offspring of Heaven's first-born

এও এই ছন্দে।]

সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার অসমান ভাগের গাম্ভীর্য সবাই জানেন।

কশ্চিৎকান্তা -বিরহগুরুণা স্বাধিকার -প্রমত্তঃ

এর প্রথম ভাগে আট, দ্বিতীয় ভাগে সাত, তৃতীয় ভাগে সাত, এবং চতুর্থ ভাগে চার[১] মাত্রা। এমনতরো ভাগে কানের কোনো সংকীর্ণ অভ্যাস হবার জো নেই।

৩

সংস্কৃতের সঙ্গে সাধু বাংলা সাহিত্যের ছন্দের যে-একটি বিশেষ প্রভেদ আছে সেইটির কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্ছে তার ধ্বনির দীর্ঘহ্রস্বতা। সেইজন্য সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ। আমি একটি বাংলা বই থেকে এর দৃষ্টান্ত তুলছি। বইটির নাম 'ছন্দঃকুসুম'। আজ চুয়ান্ন বছর পূর্বের[২] এটি রচনা। লেখক ভুবনমোহন রায়চৌধুরী রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের

১ চার নয়, পাঁচ। দ্রষ্টব্য : অনুষঙ্গ ১ (পত্র ৬), 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায় (শেষাংশ) এবং 'ছন্দের প্রকৃতি' (চতুর্থ বিভাগ)।

২ ইংরেজি ১৮৬৪ বাংলা ১২৭০ ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত।

দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দশিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কালো রঙটারই দূষণীয়তা প্রমাণ করবার জন্যে যখন কালো কোকিল কালো ভ্রমর কালো পাথর কালো লোহার নিন্দা করলেন তখন অপর পক্ষের উকিল লোহার দোষ ক্ষালন করতে প্রবৃত্ত হলেন।

॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । ।

দেখহ সুন্দর লৌহর -থে চড়ি লৌহপ -থে কত লোক চ -লে . .,
ষষ্ঠ মু -হূর্তক মধ্য ক -রে গতি যোজন পঞ্চ দ -শের প -থে . .।
লৌহবি -নির্মিত তার ত -রে বহু দূর অ -বস্থিত লোক স -বে . .,
দূর অ -বস্থিত বন্ধুস -নে সুখ -চিত্ত প -রস্পর বাক্য ক -হে . .॥[১]

এই কবিতাটির যুক্তি ও আধ্যাত্মিক রসমাধুর্যের বিচারভার আধুনিক কালের বস্তুতান্ত্রিক উকিল রসিকদের উপর অর্পণ করা গেল। তা ছাড়া লোকশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার তর্ক তোলবার অধিকারীও আমি নই। আমি ছন্দের দিক্ দিয়ে বলছি এর প্রত্যেক পদভাগে একটি দীর্ঘ ও দুইটি হ্রস্ব মাত্রা, সেই দীর্ঘহ্রস্বের ওঠাপড়ার পর্যায়ই হচ্ছে এই ছন্দের প্রকৃতি। বাংলায় স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা নেই কিংবা নেই বললেই হয়, এবং যুক্তব্যঞ্জনকে সাধু বাংলা কোনো গৌরব দেয় না, অযুক্তের সঙ্গে একই বাটখারায় তার ওজন চলে। অতএব মাত্রাসংখ্যা মিলিয়ে ঐ লোহার স্তব যদি বাংলা ছন্দে লেখা যায় তা হলে তার দশা হয় এই।—

দেখ দেখ মনোহর লোহার গা -ড়িতে চড়ি
লোহাপথে কত শত মানুষ চ -লিছে,
দেখিতে দে -খিতে তারা যোজন যো -জন পথ
অনায়াসে তরে যায় টিকিট কি -নিয়া।
যেসব মা -নুষ আছে অনেক দূ -রের দেশে,
লোহা দিয়ে গড়া তার রয়েছে ব -লিয়া,
সুদূর বঁ -ধুর সাথে কত যে ম -নের সুখে
কথা চালা -চালি করে নিমেষে নি -মেষে॥

বাংলায় আর সবই রইল— মাত্রাও রইল, আর সম্ভবত আধ্যাত্মিকতারও

১ মদিরা ছন্দ। 'ছন্দঃকুসুম' (১৮৬৪), পৃ ৭৭

হানি হয় নি, কেননা ভক্তির টিকিট থাকলে লোহার গাড়ি যে কঠিন লোহার পথও তরিয়ে দেয় এবং বঁধুর সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক্ স্বয়ং লোহার তারে তাদের কথা চালাচালি হতে পারে এ ভাবটা বাংলাতেও প্রকাশ পাচ্ছে— কিন্তু মূল ছন্দের প্রকৃতিটা বাংলায় রক্ষা পায় নি। এ কেমন, যেমন ঢেউখেলানো দেশের জমির পরিমাণ সমতল দেশে জরিপের দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া। তাতে জমি পাওয়া গেল, কিন্তু ঢেউ পাওয়া গেল না। অথচ ঢেউটা ছন্দের একটা প্রধান জিনিস। সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল করে দিয়েছে। এ হচ্ছে কাজকে সহজ করবার একটা কৃত্রিম বাঁধা নিয়ম। আমরা যখন বলি থার্ড ক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ড ক্লাসের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে নিই তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউ-বা তার নীচে নামে। ভালো শিক্ষাপ্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা -অনুসারে ব্যবহার করা যায়, থার্ড ক্লাসের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাসের সকল ছেলের উপরে সমানভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে। সাধু বাংলার ছন্দে তারই প্রমাণ পাই। হলন্তই[১] হোক হসন্তই হোক আর যুক্তবর্ণই হোক, এই ছন্দে সকলেরই সমান মাত্রা।

৪

অথচ প্রাকৃত-বাংলার প্রকৃতি সমতল নয়। সংস্কৃতের নিয়মে না হোক নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউখেলা আছে। তার কথার সকল অংশ সমান ওজনের নয়। বস্তুত পদেপদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে। তার কারণ, প্রাকৃত-বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে, সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত-বাংলার এই গুরুধ্বনির প্রতি যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তা হলে ছন্দের সম্পদ্ বেড়ে যায়। প্রাকৃত-বাংলার দৃষ্টান্ত—

১ 'স্বরান্ত' অর্থে ব্যবহৃত। দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' (প্রথম পর্যায়) ও 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' (প্রথম পর্যায়) প্রবন্ধের প্রথম পাদটীকা এবং বিচিত্রা ১৩৩৯ ভাদ্র, পৃ ১৬১ ও আশ্বিন, পৃ ৪২৯।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয়্ এল বান্।
শিব্ ঠাকুরের্ বিয়ে হবে তিন্ কন্যে দান্॥
এক্ কন্যে রাঁধেন্ বাড়েন্ এক্ কন্যে খান্।
এক্ কন্যে না পেয়ে বাপের্ বাড়ি যান্॥

এই ছড়াটিতে দুটি জিনিস দেখবার আছে। এক হচ্ছে বিসর্গের[1] ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন, আর-এক হচ্ছে 'বৃষ্টি' এবং 'কন্যে' কথার যুক্তবর্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু বাংলার ছন্দে বাঁধলে পালিস-করা আবলুস কাঠের মতো পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদিয়ায় বান।
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান॥
এক মেয়ে রাঁধিছেন এক মেয়ে খান।
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান॥

এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা—

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপে বান।
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান॥
এক কন্যা রান্ধিছেন এক কন্যা খান।
এক কন্যা ঊর্ধ্বশ্বাসে পিতৃগৃহে যান॥

এই-সব যুক্তবর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তরঙ্গিত হয় নি। কেননা যুক্তবর্ণ যথেচ্ছ ছড়ানো হয়েছে মাত্র, তাদের মর্যাদা-অনুসারে জায়গা দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ হাটের মধ্যে ছোটোয় বড়োয় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি, সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

'ছন্দঃকুসুম' বইটির লেখক প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ সম্বন্ধে অনুষ্টুভ্ ছন্দে বিলাপ করে বলছেন—

পাঁচালী নাম বিখ্যাতা সাধারণ-মনোরমা।
পয়ার ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে[2] হয় চালনা॥

১ বিসর্গের নয়, হসন্তের।

২ 'প্রাকৃত' শব্দটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে 'বাংলা ভাষা' অর্থে। আর বাংলা ভাষা বলতে সাধু বাংলাই বোঝাচ্ছে, চলতি বাংলা নয়।

দ্বিপাদে[১] শ্লোক সংপূর্ণ তুল্যসংখ্যার অক্ষরে।
পাঠে দুই পদে মাত্র শেষাক্ষর সদা মিলে ॥
পঠনে সেসব ছন্দঃ রাখিতে তালগৌরব।
পঠিছে সর্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্যয়ে ॥
লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু।
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে ॥[২]

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্ছি। কেবল আমি এই বলতে চাই— প্রাকৃত-বাংলার ছন্দে এমনতরো দুর্ঘটনা ঘটে না, এ-সব ঘটে সংস্কৃত-বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত-বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘহ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্যয় দেখি নে, কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি।

এই প্রাকৃত-বাংলা মেয়েদের ছড়ায় বাউলের গানে রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধুসভায় তার সমাদর হয় নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারে নি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেছে ; কোথায় যে তার পঙ্‌ক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয় নি। এই সংকোচে তার আত্মপরিচয়ের খর্বতা হচ্ছে। [একদিন বাঙালিকে বলা হত বাঙালি কেরানিগিরি করতে পারে, বিশুদ্ধ বিশেষত অবিশুদ্ধ ইংরেজি লিখতে ও বলতে তার বাহাদুরি আছে, কিন্তু সে রাষ্ট্রশাসন কিংবা যুদ্ধ করতে পারে না। এমন অবিশ্বাস ও সন্দেহের কথা যতদিন বলা হবে, ততদিন আমাদের শক্তির প্রমাণ হবে না। প্রাকৃত-বাংলাকেও সেইরকম অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের উপর রাখা হয়েছে, সেইজন্যে তার পূর্ণ পরিচয় হচ্ছে না।] আমরা একটা কথা ভুলে যাই— প্রাকৃত-বাংলার লক্ষ্মীর পেটরায় সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকেই শব্দসঞ্চয় হচ্ছে, সেইজন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত-বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃতভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজনবশত সংস্কৃত শব্দই সংগত সেখানে প্রাকৃত-বাংলায় তার বাধা নেই। আবার পারসি

১ 'পাদ' শব্দটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে পূর্ণ পংক্তি অর্থে, পংক্তিবিভাগ অর্থে নয়

২ 'ছন্দঃকুসুম' (১৮৬৪), পৃ ।৶, ৩১২-১৫ শ্লোক।

কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধু বাংলায় তার বিঘ্ন আছে, কেননা সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ্, এই কথা মনে রাখতে হবে।

সবুজপত্র চৈত্র ১৩২৪ : 'ছন্দ'

দ্বিতীয় পর্যায়

শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণ[১]

কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি "একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল," তখন এই বলার মধ্যে এই খবরটা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন

রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।

তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না। এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বৃষ্টি শুব্ধ হয়ে যায় নি। এই খবরটির উপর ছন্দ যে দোলা সৃষ্টি করে দেয় সে দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।

অণুপরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনি সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ। সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই।

মেঘদূতের কথা ভেবে দেখো। মনিব একজন চাকরকে বাড়ি থেকে বের করে

১ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত-কর্তৃক অনুলিখিত।

দিলে, গদ্যে এই খবরের মতো এমন খবর তো সর্বদা শুনছি। কেবল তফাত এই যে, রামগিরি-অলকার বদলে হয়তো আমরা আধুনিক রামপুরহাট-হাটখোলার নাম পাচ্ছি। কিন্তু মেঘদূত কেন লোকে বছর বছর ধরে পড়ছে? কারণ মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু। গতিচাঞ্চল্যের ভিতরকার কথা হচ্ছে 'আমি আছি' এই সত্যটির বিচিত্র অনুভূতি। 'আমি আছি' এই অনুভূতিটা তো বদ্ধ নয়, এ যে সহস্ররূপে চলায়-ফেরায় আপনাকে জানা। যতদিন পর্যন্ত আমার সত্তা স্পন্দিত, নন্দিত হচ্ছে, ততদিন 'আমি-আছি'র বেগের সঙ্গে সৃষ্টির সকল বস্তু বলছে "তুমি যেমন আছ, আমিও তেমনি আছি"। 'আমি আছি' এই সত্যটি কেবলি প্রকাশিত হচ্ছে 'আমি-চলছি'র দ্বারা। চলাটি যখন বাধাহীন হয়, চার দিকের সঙ্গে যখন সুসংগত হয়, সুন্দর হয়, তখনি আনন্দ। ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দরূপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আষাঢ় ১৩৩০ : 'ছন্দ'

বাংলাভাষা-পরিচয় (কার্তিক ১৩৪৫) : অধ্যায় ১১ (অংশ)

অনুষঙ্গ ১

পত্রধারা : এক

১

প্রস্বর, পর্ব ও মাত্রা

1918, July 27

When I had written thus far your delightfully suggestive letter on ছন্দ[১] reached me. What you say of the accent stress[২] in Bengali poems is quite true and the marks you put over the lines you quoted are correct. But I believe these stresses, like dance steps, are induced by the rhythm of the metre itself and they are not inherent in the words. When said in a prose form, these words at once lose their swing.—

টাপুর টুপুর করে বৃষ্টি পড়ছে

In this sentence there is hardly any stress anywhere. We introduce stress in Bengali words only where some special emphasis is needed for the sake of the meaning. When we say,

"যাও, আর ভাল্ লাগে না"

then accents are used only to express disgust,—in another context these accents would be out of place. When an Englishman speaks Bengali, it sounds to us so strange, often having a comic effect, simply because he cannot pronounce a word without putting some accent somewhere,—it is his lifelong habit. The undulation which we have in our voice in uttering prose is merely that of emotion. Therefore, the stress about which you speak in Bengali verses is imposed by the metre.

১ ২৯ জুন ১৯১৮ তারিখের পত্র।

২ ছন্দপরিভাষায় accent=প্রস্বর, stress=বল; accent stress or stress accent=বলপ্রস্বর।

In my paper[১] I have discussed about the short divisions and long divisions of a metre.[২] The long divisions are the divisions generally represented by lines in the printed form. But the shorter divisions within those lines are more important for the rhythm.[৩] They are what the bars[৪] are in music, and can be measured by beats[৫]—the beats which, according to the rhythm of the particular metre, contain a particular quantity of sound-units. These beats, in the language of prosody, are stresses.[৬] They set the impulse which carries with it a certain volume of sound. For instance, the metre in—

1234 12 3 4 1 2 3 4 1234
অধরে ম | ধুর হাসি | বাঁশিটি বা | জাও . . |[৭]

has the division of four units of sound (মাত্রা) in a bar. Naturally the beat comes at the beginning of the bar,[৮] remaining suspended till the next beat comes. I want to

১ ১৩২৪ সালের ৬ চৈত্র তারিখে বিচিত্রা ক্লাবে পঠিত এবং ওই সালের চৈত্র-সংখ্যা সবুজপত্রে প্রকাশিত 'ছন্দ' ('ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় নামে গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধ।

২ Long division=চাল বা প্রদক্ষিণ ; short division=চলন বা পদক্ষেপ। ছন্দ-পরিভাষায় চাল=পঙ্‌ক্তি, চলন=পর্ব।

৩ তুলনীয় : 'প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর করছে' এবং 'চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা যায় না, চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়' ('ছন্দের অর্থ' : প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় বিভাগ)। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের উক্তি— 'মনে নেই আমার কোনো পূর্বতন প্রবন্ধে···ক্ষমা প্রার্থনা করি' ('ছন্দের মাত্রা' : দ্বিতীয় পর্যায়, শেষাংশ)।

৪ Bar=তালবিভাগ ; ছন্দপরিভাষায় 'পর্ব'।

৫ Beat=তালি বা তাল ; ছন্দপরিভাষায় 'প্রস্বর'।

৬ Stress মানে accent of force বা বলপ্রস্বর।

৭ ভারতচন্দ্র— অন্নদামঙ্গল : দ্বিতীয় খণ্ড, পুরবর্ণন।

৮ তুলনীয় : 'ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের [অর্থাৎ পর্বের] আরম্ভেও পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে।···বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না' ('বাংলা ছন্দ' : দ্বিতীয় পর্যায়, চতুর্থ বিভাগ)।

know from you whether it is not the same in English metres also. The verse, which you give me in your letter,[১] I divide in the following manner, apportioning to each division an equal quantity of sound-units (মাত্রা)—

M″arch, lads, | m″arch, let us |
s″tride along to | g″ether. . |

The difference between the Bengali and English metres in the above example is this, that in the Bengali our vowels are all uniformly short, or nearly so, whereas in the English the 'a' in 'march' and in 'lads' is appreciably longer than the 'e' and 'u' in 'let us'. If you count these long vowels as consisting of two *matras* (sound units) and short ones as one *matra*, then you will find in the above English metre four sound-units in a bar,[২]— just as in the Bengali verse. But the inequality in your vowel lengths gives your metres a richness which is wanting in the সাধু Bengali metres. We also have this inequality of quantity in sound groups in metres used in colloquial Bengali poems. You will find in the nursery rhyme, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্', the alternation of long and short sounds in the arrangement of metre. It is a ছন্দ which has three units in a bar[৩],— with one short sound and one long sound which represents two units.

— ◡   ◡ —   ◡ —   ◡ —   ◡ —   ◡ —   — ◡
বৃষ্‌টি | পড়ে | টাপুর্ | টুপুর | নদেয় | এলো | বান |

— ◡   ◡ —   ◡ —   ◡ —   ◡ —   ◡ —   ◡ —
শিবঠা | কুরের্ | বিয়ে | হবে | তিন্ ক- | ন্নে | দান |

১ ১৬ জুন ১৯১৮ তারিখের পত্র।

২ March এবং lads-এর 'a'-কে দীর্ঘ বলে ধরলে প্রথম দুই পর্বে চার মাত্রা পাওয়া যায়। কিন্তু stride-এর 'i' এবং along-এর 'o' দীর্ঘ না হ্রস্ব? দুটোকেই হ্রস্ব বলে না ধরলে তৃতীয় পর্বে চার মাত্রা পাওয়া যাবে না। এণ্ডারসনের মতে '-long'এর উপরে ঝোঁক বা প্রস্বর আছে, রবীন্দ্রনাথের মতে নেই। 'প্রস্বরিত' (stressed) এবং 'দীর্ঘ' (long) সমার্থক শব্দ নয়। Together শব্দের 'ge' প্রস্বরিত না দীর্ঘ? মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এটিকে দীর্ঘ বলেই গণ্য করেছেন।

৩ এখানে bar মানে 'পর্ব' নয়, 'উপপর্ব'।

◡ – ◡ – ◡ – ◡ – ◡ – ◡ – ◡ –
এক্ ক- | ন্নে | র‍াঁধেন্ | বাড়েন | এক্ ক- | ন্নে | খান |

◡ – ◡ – – ◡ ◡ – ◡ – ◡ –
এক্ ক- | ন্নে | না পেয়ে | বাপের | বাড়ি | যান | [১]

In the above you will see that though each bar contains one long and one short sound, they are not absolutely regular in their alternations, sometimes the short following the long and sometimes the contrary. But, unlike the সাধু Bengali verses, the undulation of short and long sounds is there. One thing you must notice in this verse, it is the lengthening of some vowels which the metre requires, and yet which is against the ordinary custom of the language. The 'এ' in 'পড়ে' in the second bar is lengthened and also the 'উ' in 'টাপুর' and 'টুপুর' in the third and the fourth And this taking liberty with the vowel sounds goes on to the end.[২] It offers no difficulty to the Bengali mothers or to their children to recite it properly, the swing of the metre itself guiding them.[৩]

However, what I tried to show in my paper is this, that by changing the quantity of sound-units in a bar the rhythm of a metre is fundamentally changed. But as you suggest in your letter, there is, in the English as in the Sanskrit, an additional element contributing to the musical effect,—it is the arrange-

১ এই অংশটুকু রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত বিশ্লেষণের অবিকল প্রতিরূপ। দেখা যাচ্ছে সর্বত্র উচ্চারণ অনুসারে হস্‌-চিহ্ন দেওয়া হয় নি। 'বান' শব্দের ধ্বনিবিন্যাস — ◡ এরকম, কিন্তু 'দান' প্রভৃতি অনুরূপ শব্দের ধ্বনিবিন্যাস ◡ — এরকম। চতুর্থ লাইনের 'না পেয়ে' অংশের বিশ্লেষণ ত্রুটিহীন নয়। ফলে এই লাইনে এক bar বা উপপর্ব কম হয়েছে। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত বিশ্লেষণ এরকম—

— ◡ — ◡
না পে | য়ে··· |

২ এই ছড়াটির প্রথম দুই লাইনের অনুরূপ বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে।

৩ তুলনীয়: 'হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই ছড়া আউড়েছে, তবু ছন্দের কোনো গর্তে তাদের কারো কণ্ঠ স্খলিত হয় নি'।— 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায়।

ment of short and long sounds within the bars. You may call them accent stress, but accent stress means lengthening of vowels in certain parts of a word.[১]

I must thank you for your delightful letter and for reminding me of the necessity of a supplementary paper. But happily I was made lazy by my Creator with only impulse enough to start an idea and no responsibility to carry it on to a finish.

I am having this typed in order to be able to send you a copy by the following mail.

অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনকে লেখা :
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

২

প্রাকৃত মহাপয়ার

১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ ৪

চলতি কথায় একটা লম্বা ছন্দের[২] কবিতা লিখেছি। এটা কি পড়া যায় কিংবা বোঝা যায় কিংবা ছাপানো যেতে পারে? নাম-রূপের মধ্যে রূপটা আমি দিলুম, নাম দিতে হয় তুমি দিয়ো।[৩]

১ Accent stress মানে বলপ্রস্বর। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ধ্বনি প্রস্বরিত (stressed) হলেই দীর্ঘ (long) হয়। March, lads, march ইত্যাদি লাইনটির মাত্রাপরিমাণ নিরূপণও তিনি করেছেন এই ধারণাবশেই। বস্তুতঃ এই ধারণা অভ্রান্ত নয়। ধ্বনি প্রস্বরিত হলেই দীর্ঘ হয় না। Stress accent বা বলপ্রস্বর ধ্বনির খরতাজ্ঞাপক, দীর্ঘতাজ্ঞাপক নয়। এই পত্রের উত্তরে (১৯১৮ সেপ্‌টেম্বর) অধ্যাপক এণ্ডারসন accent-এর যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

২ প্রাকৃত-বাংলার মহাপয়ার বা দীর্ঘপয়ার। অধিকন্তু এটি পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘক বা লাইন-ডিঙোনো চালে রচিত। এ ধরণের ছন্দের এটিই প্রথম নিদর্শন, তাই 'এটা কি পড়া যায়' এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

৩ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্রে' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪) 'পরমায়ু' নামে। পরে 'পলাতকা'য় 'শেষ গান' নামে ও 'পূরবী'তে 'পূরবী' নামে গৃহীত হয়। প্রত্যেকবারই কবিতাটি কিছুকিছু পরিবর্তিত হয়েছে।

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাদের প্রাণের ঝরনাস্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার-ধারা
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। কালের যোগে নয় তো মোদের আয়ু,
নয় সে কেবল দিবস-রাত্তির সাতনলি হার, নয় সে নিশাসবায়ু।
নানান প্রাণের প্রেমের মিলে নিবিড় হয়ে আত্মীয়ে বান্ধবে
মোদের পরমায়ুর পাত্র গভীর করে পূরণ করে সবে।
সবার বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে,
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় বিচিত্র আনন্দরসে পুরে;
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্তবারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো-মাটি ফল-হাওয়া-জল তৃণ-তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান-গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ-রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

এই জাতের সাধু ছন্দে আঠার অক্ষরের আসন থাকে।[১] কিন্তু এটাতে

১ দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের অর্থ': প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় বিভাগে; 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত': দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং 'ছন্দের প্রকৃতি': দ্বিতীয় বিভাগে।

কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্যন্ত উঠেছে। ফার্স্ট ক্লাসের এক বেঞ্চিতে ছ-জনের বেশি বসবার হুকুম নেই, কিন্তু থার্ড ক্লাসে ঠেসাঠেসি ভিড়, এ সেইরকম। কিন্তু যদি এটা ছাপাও তা হলে লাইন ভেঙো না, তা হলে ছন্দ পড়া কঠিন হবে। স্মল পাইকায় মার্জিন কম দিয়ে ছাপলে পঁচিশ অক্ষর ধরতে পারবে।

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা : 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ড (পৌষ ১৩৫২)— পত্রসংখ্যা ৫৫

৩

প্রবহমান ও মুক্তক ছন্দে মাত্রারক্ষা

১৩৩২ আশ্বিন ৫

আমার কবিতা থেকে তুমি যে লাইনটি তুলে দিয়েছ তাতে দুটো অক্ষর বাড়তি হয়েছে সন্দেহ নেই, এবং আমার অনবধানতাই তার কারণ। আমার বিশ্বাস, পাহারা এড়িয়ে আরো অনেক জায়গায় এমনতরো দুটো চারটে অনাহূত হঠাৎ অনধিকারপ্রবেশ করেছে।[১] বড়ো বড়ো ছত্রের মাঝখানে ছেদ পড়লে এইরকম ত্রুটির সম্ভাবনা বেশি হয়। আঠারো অক্ষরের ছন্দে আট ও দশে লাইন বিভক্ত হয়। আট অক্ষরের পরে যতি পড়লে কানের মধ্যে যে কর্ণধার আছে, ছন্দের স্বাভাবিক ঝোঁকেই সে মাত্রা চালনা করে, কিন্তু দশের পরে যেখানে যতি পড়ে, সেখানে সে যদি সতর্ক না থাকে তা হলে ভুল করা অসম্ভব নয়।[২] তুমি যে লাইনটি উদ্ধৃত করেছ তাতে দশ মাত্রার পরে যতি— যথা, "দিয়ে গেল তোমার সংগীত"। যদি হত "দিয়ে গেল তব গীত" তা হলে এই আট মাত্রা তার পরবর্তী দশ মাত্রাকে সহজেই প্রার্থনা করত। কিন্তু দশ মাত্রা আপনাতেই পর্যাপ্ত, সে আপন সম্পূর্ণতার জন্যে স্বভাবত বাকি আটকে চায় না।

১ এরকম 'অনবধানতা'র আর-একটি দৃষ্টান্ত আছে 'প্রান্তিক' কাব্যের ১৭-সংখ্যক কবিতার (২৫. ১২. ৩৭ তারিখে রচিত) 'বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ' ইত্যাদি ছত্রটিতে।

২ আঠারো মাত্রার প্রবহমান মহাপয়ার সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য, অপ্রবহমান মহাপয়ার সম্বন্ধে নয়।

অন্যমনস্ক লেখনী যে কিরকম পথভ্রষ্ট হতে পারে তার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত একটি কবিতায় আছে। আমি এক জায়গায়[১] শরতের বর্ণনায় লিখেছি, "আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার"— অথচ শরতে ধানকাটা হয় না এবং নবান্নও শরতের অনুষ্ঠানের অঙ্গ নয়। এই কবিতা ছাত্রেরা অনেকবার আবৃত্তি করেছে, মাস্টাররা উৎসাহ দিয়েছে— ভুলসুদ্ধ দীর্ঘকাল পার হয়ে এসেছে। সেদিন হঠাৎ পূর্ববঙ্গের এক ইস্কুলের ছাত্র এ সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করাতে এতদিন পরে আমার চৈতন্য হল।

ভাঙা ছন্দে[২] মাত্রার ওজন রেখে চলা দুরূহ। ছন্দের কঠিন শাসনে যে কবি মাত্রাসিদ্ধ না হয়েছে তার পক্ষে এ পথে পদস্খলনের আশঙ্কা আছে। এ ছন্দের গূঢ় নিয়ম নির্দেশ করে দিলেই যে তাদের কোনো উপকার হবে তা আমি বিশ্বাস করি নে।[৩]

কৃষ্ণদয়াল বসুকে লেখা :
কথাসাহিত্য, কার্তিক ১৩৫৮, 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি'

---

১ 'কল্পনা' কাব্যের (বৈশাখ ১৩০৭) 'শরৎ' কবিতায়।

২ ছন্দপরিভাষায় যাকে বলা যায় 'মুক্তক', তাকেই এখানে বলা হয়েছে 'ভাঙা ছন্দ'। তুলনীয় : "অনেক বছর পরে বেড়া-ভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য় 'পলাতকা'য়।"— 'গদ্য ছন্দ' : পঞ্চম বিভাগ।

৩ 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় কৃষ্ণদয়াল বসু এই পত্রখানির যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন তা এই।—

"কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে কবিগুরু যে কবিতাটি লিখেছিলেন সেটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হবার পর তার এক জায়গায় ছন্দের সামান্য একটু খুঁত আমার চোখে পড়ে। আমি এ বিষয়ে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তা ছাড়া, তাঁর 'বলাকা' ও 'পলাতকা'য় তিনি দু-রকমের যে-দুটি 'ভাঙা ছন্দে'র প্রবর্তন করেছেন, পরবর্তী কবিদের অক্ষম অনুকরণের ফলে সেই অপূর্ব ছন্দ-দুটি পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করি। কবি স্বয়ং ওই ছন্দ-দুটির নিগূঢ় নিয়ম সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেবেন কি না এ কথাও জানতে চাই।— কবির এ চিঠিখানি আমার সেই চিঠির জবাব।"

'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'-শীর্ষক উল্লিখিত কবিতাটি সংকলিত হয়েছে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে।

৪

বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১

১৩৩৬ কার্তিক ১

গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানের ছন্দ সম্বন্ধে কৈফিয়ত চেয়েছ। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার, গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের 'পরে।[১] অতএব যে পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রার কম-বেশি নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যাঁর নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।

১। 'নব নব রূপে এসো প্রাণে'— এই গানের অন্তিম পদগুলির কেবল অন্তিম দুটি অক্ষরের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। যথা— প্রাণে, গানে ইত্যাদি। একটিমাত্র পদে তার ব্যতিক্রম আছে। 'এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে'— এখানে 'সুখে'র একারকে অবাঙালি রীতিতে দীর্ঘ করা হয়েছে। 'সৌখ্যে' কথাটা দিলে বলবার কিছু থাকত না। তবু সেটাতে রাজি হই নি, মানুষ চাপা দেওয়ার চেয়ে মোটর ভাঙা ভালো।

২। 'অমল ধবল পা- লে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া'— এ গানে গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ। অতএব তালকে সেলাম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে থাকতে হল। যদি বল, পাঠকেরা তো শ্রোতা নয়, তারা মাপ করবে কেন? হয়তো করবে না— কবি জোড়হাত করে বলবে, 'তালদ্বারা ছন্দ রাখিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন'।

৩। ৩৪ নম্বরটাও গান।[২] তবুও এর সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে ছন্দগুলি বাংলার প্রাকৃত ছন্দ, অক্ষর গণনা করে তাদের মাত্রা নয়। বাঙালি সেটা বরাবর নিজের কানের[৩] সাহায্যে উচ্চারণ করে এসেছে। যথা—

১ তুলনীয়: "প্রবাহিণীতে যে-সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার সবগুলিই গান, সুরে বসানো। এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের বাঁধন নেই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"— প্রবাহিণী (১৩৩২), ভূমিকা।

২ 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' ইত্যাদি।

৩ দ্রষ্টব্য ৬-সংখ্যক পত্রের দ্বিতীয় পাদটীকা।

বৃষ্টি পড়ে- টাপুর টুপুর নদেয় এল- বা- ন,
শিব ঠাকুরের বিয়ে- হবে- তিন কন্যে দা- ন।

আক্ষরিক মাত্রা গুনতি করে একে যদি সংশোধন করতে চাও তা হলে নিখুঁত পাঠান্তরটা দাঁড়াবে এইরকম।—

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা,
শিব্ ঠাকুরের বিবাহ হচ্ছে দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে—

মা আমায় ঘুরাবি কত
যেন চোখবাঁধা বলদের মতো।[১]

এটাকে যদি সংশোধিত মাত্রায় কেতাদুরস্ত করে লিখতে চাও তা হলে তার নমুনা একটা দেওয়া যাক।

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষুবদ্ধ বৃষের মতোই।[২]

একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে, বাঙালি আবৃত্তিকার সাধুভাষা-প্রচলিত ছন্দেও নিজের উচ্চারণসম্মত মাত্রা রাখে নি বলে ছন্দের অনুরোধে হ্রস্বদীর্ঘের সহজ নিয়মের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করে চলেছে। যথা—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

উচ্চারণ-অনুসারে 'মহাভারতের কথা' লিখতে হয় 'মহাভারতের্কথা', তেমনি 'কাশীরাম দাস কহে' লেখা উচিত 'কাশীরাম দাস্কহে'।[৩] কারণ হসন্ত শব্দ

১ এই গানটির আসল পাঠ এরকম—

মা আমায় ঘুরাবে কত
কলুর চোখঢাকা বলদের মত?

২ বাংলা প্রাকৃত ছন্দের এই উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের বিষয় নানা প্রসঙ্গেই আলোচিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ', 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় (দ্বিতীয় বিভাগ) ও দ্বিতীয় পর্যায় (চতুর্থ বিভাগ), 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় (চতুর্থ বিভাগ), 'প্রস্বর, পর্ব ও মাত্রা'-শীর্ষক ইংরেজি পত্র এবং 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় (দ্বিতীয় বিভাগ)।

৩ তুলনীয়: 'মন্বেচারি কি দোষাছে' ('বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ') এবং 'অচিণ্ডাকে নদীর্বাঁকে' ও 'এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা' ('বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' তৃতীয় পর্যায়)।

পরবর্তী স্বর বা ব্যঞ্জন শব্দের সঙ্গে মিলে যায়, মাঝখানে কোনো স্বরবর্ণ তাদের ঠোকাঠুকি নিবারণ করে না। কিন্তু বাঙালি বরাবর সহজেই 'মহাভারতে- কথা' পড়ে এসেছে, অর্থাৎ 'তে'র একারকে দীর্ঘ করে আপসে মীমাংসা করে দিয়েছে।[১] তার পরে 'পুণ্যবান্' কথাটার 'পুণ্য'র মাত্রা কমিয়ে দিতে সংকোচ করে নি, অথচ 'বান্' কথাটার আক্ষরিক দুই মাত্রাকে টান এবং যতির সাহায্যে চার মাত্রা করেছে।[২]

৪। 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'— এই গানের ছন্দ তুমি কী নিয়মে পড় আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। 'দেবতা' শব্দের পরে একটা দীর্ঘ যতি আছে, সেটা কি রাখ না? যদি সেই যতিকে মান্য করে থাক তা হলে দেখবে, 'দেবতা' এবং 'খোলো দ্বার' মাত্রায় অসমান হয় নি।[৩] এসব ধ্বনিগত তর্ক মোকাবিলায় মীমাংসা করাই সহজ। লিখিত বাক্যের দ্বারা এর শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে কি না জানি নে। ছাপাখানাশাসিত সাহিত্যে ছন্দোবিলাসী কবির এই এক মুশকিল— নিজের কণ্ঠ স্তব্ধ, পরের কণ্ঠের করুণার উপর নির্ভর। সেইজন্যেই আমাকে সম্প্রতি এমন কথা শুনতে হচ্ছে যে, আমি ছন্দ ভেঙে থাকি, তোমাদের স্তুতিবাক্যের কল্লোলে সেটা আমার কানে ওঠে না। তখন আকাশের দিকে চেয়ে বলি, 'চতুরানন, কোন্ কানওয়ালাদের 'পরে এর বিচারের ভার'।

৫। 'আজি গন্ধবিধুর সমীরণে'— কবিতাটি সহজ নিয়মেই পড়া উচিত। অবশ্য এর পঠিত ছন্দে ও গীত ছন্দে প্রভেদ আছে।

৬। 'জনগণমনঅধিনায়ক' গানটায় যে মাত্রাধিক্যের কথা বলেছ সেটা অন্যায় বল নি। ঐ বাহুল্যের জন্যে 'পঞ্জাব' শব্দের প্রথম সিলেব্‌ল্‌টাকে দ্বিতীয় পদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি—

পন্ | জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা ইত্যাদি।

'পঞ্জাব'কে 'পঞ্জব' করে নামটার আকার খর্ব করতে সাহস হয় নি, ওটা দীর্ঘ-

১ এর সঙ্গে তুলনীয়: 'সতত হে নদ তুমি' ইত্যাদি রচনাটির ছন্দোবিশ্লেষণপ্রণালী ('বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' তৃতীয় পর্যায়)।

২ টান এবং যতির সাহায্যে 'বান্' কিভাবে চার মাত্রার স্থান অধিকার করে তা দেখানো হয়েছে 'বাংলা ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম বিভাগে, 'ছন্দের মাত্রা' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম বিভাগে এবং 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগে।

৩ দ্রষ্টব্য: 'গীতাঞ্জলি'র ৫০-সংখ্যক রচনা এবং পরবর্তী ৫-সংখ্যক পত্রের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

কান্নাদের দেশ। ছন্দের অতিরিক্ত অংশের জন্যে একটু তফাতে আসন পেতে দেওয়া রীতি বা গীতি -বিরুদ্ধ নয়।[১]

এই গেল আমার কৈফিয়তের পালা।[২]

তোমার ছন্দের তর্কে আমাকে সালিস মেনেছ। 'লীলানন্দে'র যে লাইনটা নিয়ে তুমি অভিযুক্ত, আমার মতে তার ছন্দঃপতন হয় নি। ছন্দ রেখে পড়তে গেলে কয়েকটি কথাকে অস্থানে খণ্ডিত করতে হয় বলেই বোধ হয় সমালোচক ছন্দঃপাত কল্পনা করেছেন। ভাগ করে দেখাই।

নৃত্য | শুধু বি | -লানো লা | -বণ্য | ছন্দ |

আসলে 'বিলানো' কথাটাকে দুভাগ করলে কানে খটকা লাগে।

নৃত্য শুধু লাবণ্যবিলানো ছন্দ

লিখলে কোনোরকম আপত্তি মনে আসে না, অর্থ হিসাবেও স্পষ্টতর হয়। ঐ কবিতায় যে লাইনে তোমার ছন্দের অপরাধ ঘটেছে সেটা এই।—

সংগীতসুধা নন্দনে (র) সে আলিম্পনে।

ভাগ করে দেখো

সংগী | ত সুধা | নন্দ | নের সে আ | লিম্পনে |

যদি লিখতে

সংগীতসুধা নন্দনেরি আলিম্পনে

তা হলে ছন্দের ত্রুটি হত না।

যাক। তার পরে 'ঐকান্তিকা'। ওটা প্রাকৃত ছন্দে লেখা।[৩] সে ছন্দের

১ 'পন্'-এর মতো 'ছন্দের অতিরিক্ত অংশ'-কে ছন্দপরিভাষায় বলা হয় 'অতিপর্ব'। রামপ্রসাদের গানেও এরকম অতিপর্বের প্রয়োগ দেখা যায়। এই পত্রেরই ৩-সংখ্যক প্রসঙ্গে 'মা আমার ঘুরাবি কত' এবং 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' প্রবন্ধে 'মন বেচারির কি দোষ আছে' ইত্যাদি গানের 'যেন' ও 'তারে' শব্দদুটি এরকম অতিপর্বের দৃষ্টান্ত।

'জনগণমন' গানের প্রসঙ্গে পরবর্তী ৫-সংখ্যক পত্রের তৃতীয় প্রসঙ্গ, ৮-সংখ্যক পত্রের শেষ ছত্র এবং 'পত্রধারা' দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় পত্র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২ এই পর্যন্ত প্রকাশিত— উত্তরা, আশ্বিন ১৩৩৮ : 'পত্রধারা', পৃ ৩১৪-১৬। দ্রষ্টব্য : দিলীপ-কুমার-প্রণীত 'অনামী' প্রথম সং (১৯৩৩), পৃ ৩৩৮।

৩ দ্রষ্টব্য : পূর্ববর্তী ৩-সংখ্যক প্রসঙ্গের আলোচনা ও দ্বিতীয় পাদটীকা।

স্থিতিস্থাপকতা[১] যথেষ্ট। মাত্রার ওজনের একটু-আধটু নড়চড় হলে ক্ষতি হয় না। তবুও নেহাত ঢিলেমি করা চলে না। বাঁধামাত্রার নিয়মের চেয়ে কানের নিয়ম সূক্ষ্ম, বুঝিয়ে বলা বড়ো শক্ত কেন ভালো লাগল বা লাগল না। 'ঐকান্তিকা'র ছন্দটা বন্ধুর হয়েছে সে কথা বলতেই হবে। অনেক জায়গায় দূরান্বয়ের জন্যে এবং ছন্দের বিভাগে বাক্য বিভক্ত হয়ে গেছে বলে অর্থ বুঝতে কষ্ট পেয়েছি। তন্ন তন্ন আলোচনা করতে হলে বিস্তর বাক্য ও কাল ব্যয় করতে হয়। তাই আমার কান ও বুদ্ধি অনুসরণ করে তোমার কবিতাকে কিছুকিছু বদল করেছি। তুমি গ্রহণ করবে এ আশা করে নয়, আমার অভিমতটা অনুমান করতে পারবে এই আশা করেই।

দিলীপকুমার রায়কে লেখা :
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৫

বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ২

১৯২৯ নভেম্বর ১০

তুমি এমন করে সব প্রশ্ন ফাঁদ যে, দুচার কথায় সেরে দেওয়া অসম্ভব হয়,— তোমার সম্বন্ধে আমার এই নালিশ।

১। 'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন'— এই পঙ্‌ক্তির ছন্দোমাত্রার সঙ্গে 'দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে'র মাত্রার অসাম্য ঘটেছে এই তোমার মত।[২] 'ক্রমে' শব্দটার 'ক্র'র উপর যদি যথোচিত ঝোঁক দাও তা হলে হিসাবের গোল

১ এ উপলক্ষে সাধু ছন্দের 'স্থিতিস্থাপকতা'র আলোচনাও দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ এবং 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগ ('মহাভারতের কথা' ইত্যাদি প্রসঙ্গ)।

২ দ্রষ্টব্য : 'গীতাঞ্জলি'র ৩৩-সংখ্যক রচনা। এটির প্রতি ছত্রে আছে পাঁচ-পাঁচ-দুই হিসাবে বারো মাত্রা। কেবল 'চিত্ত আমার নানা দিকেই ভ্রমে' ছত্রটির প্রথম পর্বে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়।

থাকে না। 'বেড়ে ওঠেক্‌রমে'— বস্তুত সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে 'ক্র' পরে থাকাতে 'ওঠে'র 'এ' স্বরবর্ণে মাত্রা বেড়ে ওঠা উচিত। তুমি বলতে পার আমরা সাধারণত শব্দের প্রথম বর্ণস্থিত র-ফলাকে দুই মাত্রা দিতে কৃপণতা করি। 'আক্রমণ' শব্দের 'ক্র'কে তার প্রাপ্যমাত্রা দিই, কিন্তু 'ওঠে ক্রমে'র 'ক্র' হ্রস্বমাত্রায় খর্ব করে থাকি। আমি সুযোগ বুঝে বিকল্পে দুইরকম নিয়মই চালাই।[১]

২। ভক্‌ত | সেথায় | খোল দ্বা | ০০র্ | — এইরকম ভাগে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তুমি যে ভাগ করেছিলে | র০০ | এটা চলে না; যেহেতু 'র' হসন্ত বর্ণ, ওর পরে স্বরবর্ণ নেই, অতএব টানব কাকে ?[২]

৩। 'জনগণ' গান যখন লিখেছিলেম তখন 'মারাঠা' বানান করি নি। মরাঠিরাও প্রথম বর্ণে আকার দেয় না। আমার ছিল 'মরাঠা'। তার পরে যাঁরা শোধন করেছেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার করে তুলেছেন, আমার চোখে পড়ে নি।[৩]

৪। 'জাগিয়ে' ও 'রটিয়ে' শব্দের 'গিয়ে' ও 'টিয়ে' প্রাকৃত বাংলার মতে

১ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর' এবং 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' চতুর্থ পর্যায় শেষ ছত্র। সংস্কৃত ছন্দে কোনো শব্দের আরম্ভে যুক্তাক্ষর থাকলে পূর্ববর্তী শব্দের শেষ স্বরটি গুরু বলে গণ্য হয়। বাংলায় সাধারণতঃ তা হয় না। তবে সুযোগ বুঝে বৈকল্পিক নিয়ম চালানো যায়। যথা—

গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিল ক্ষণে ক্ষণে।
—'নটরাজ' (বনবাণী), বর্ষামঙ্গল

এখানে 'ক্ষণে ক্ষণে'র উচ্চারণরূপ হচ্ছে 'ক্ষণেক্‌ক্ষণে'। কিন্তু

ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান গাই গো।
—'নটরাজ' (বনবাণী), অহৈতুক

এখানে 'ক্ষণে ক্ষণে'র উচ্চারণরূপ 'ক্ষণে-ক্ষণে'। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : "বাংলাছন্দে ধ্বনিপ্রয়োগ" প্রবন্ধ (বৈশাখী ১৩৫১, পৃ ১৩-২০)।

২ দ্রষ্টব্য : পূর্ববর্তী চতুর্থ পত্রের চতুর্থ প্রসঙ্গ।

৩ এই গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (মাঘ ১৮৩৩ শক)। সেখানে 'মারাঠা'ই আছে। সম্ভবতঃ পাণ্ডুলিপিতে ছিল 'মরাঠা'।

এক মাত্রাই।[১] আমি যদি পরিবর্তন করে থাকি সেটাকে স্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

দিলীপকুমার রায়কে লেখা :
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৬

বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দ

১৯৩১ মার্চ ১৩

সংস্কৃত কাব্য অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যচ্ছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি-চারটি শ্লোক কোনোমতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মারা যায়, অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনি-সংগীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

মন্দাক্রান্তা ছন্দের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রবোধ বাঙালির কানের উল্লেখ করেছেন।[২] বাঙালির কান বলে কোনো বিশেষ পদার্থ আছে বলে আমি মানি নে।[৩] মানুষের স্বাভাবিক কানের দাবি অনুসরণ করলে দেখা যায় মন্দা-ক্রান্তা ছন্দের চার পর্ব। যথা—

১ এই নিয়মটা সার্বত্রিক নয়, তবে অধিকাংশ স্থলেই খাটে। বাংলা প্রাকৃত ছন্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'জাগিয়ে', 'রটিয়ে' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ হয় 'জাগ্‌য়ে', 'রট্‌য়ে' এরকম। তাই বলা হয়েছে যে, এসব স্থলে 'গিয়ে' ও 'টিয়ে' এক মাত্রাই।

সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।—'গীতাঞ্জলি', ৪৭

এখানে 'তলিয়ে' শব্দের উচ্চারণরূপ 'তল্‌য়ে'। অতএব 'তলিয়ে' শব্দে দুই মাত্রাই ধরতে হবে।

২ প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'মেঘদূত' গ্রন্থের (১৩৩৭) ভূমিকায় 'মেঘদূতের অনুবাদ' অংশে মন্দাক্রান্তা ছন্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩ তুলনীয় : বাঙালি সেটা নিজের কানের সাহায্যে উচ্চারণ করে এসেছে ('বিবিধ ছন্দ-প্রসঙ্গ ১' তৃতীয় প্রসঙ্গ), আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালির কানে ঠেকে নি ('ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগ), বাঙালির কান সাধারণ ব্যবহারে সেই বিকল্প মঞ্জুর করেছে ('ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় পঞ্চম বিভাগ তৃতীয় অনুচ্ছেদ), বাঙালি পাঠকের কান একে রীতিমতো ছন্দ বলে মানতে বাধা পাবে ('গদ্যছন্দ' পঞ্চম বিভাগ)। দ্রষ্টব্য : ১-সংখ্যক পত্রে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ইত্যাদি বাংলা প্রাকৃত ছন্দের বিশ্লেষণ ও তার শেষ পাদটীকা।

মেঘালোকে | ভবতি সুখিনো | ঽপ্যন্যথাবৃৎ | -তি চেতঃ।

অর্থাৎ মাত্রাহিসাবে আট-সাত-সাত-চার[১]। শেষের চারকে ঠিক চার বলা চলে না। কারণ লাইনের শেষে একমাত্রা আন্দাজের যতি বিরামের পক্ষে অনিবার্য। এই ছন্দকে বাংলায় আনতে গেলে এইরকম দাঁড়ায়।

দূরে ফেলে গেছ জানি,
স্মৃতির বীণাখানি
বাজায় তব বাণী
মধুরতম।
অনুপমা, জেনো অয়ি,
বিরহ চিরজয়ী
করেছে মধুময়ী
বেদনা মম॥

সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর রীতি অনুবর্তন করা যেতে পারে। যথা—

অভাগা যক্ষ কবে করিল কাজে হেলা, কুবের তাই তারে দিলেন শাপ,
নির্বাসনে সে রহি প্রেয়সী-বিচ্ছেদে বর্ষ ভরি স'বে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি-শিখর-আশ্রমে হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপরাজি স্নিগ্ধছায়াবৃত সীতার স্নানে পূত সলিলধারা॥[২]

প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা:
উদয়ন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ : 'সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ' (অংশ)

১ চার নয়, পাঁচ। দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগের শেষাংশে মন্দাক্রান্তার বিশ্লেষণ ও পাদটীকা।

২ তুলনীয় : 'যক্ষ সে কোনো জনা···' ।— 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায় (শেষাংশ) এবং 'ছন্দোহার' অংশের প্রথম দুটি রচনা। এই স্তবকটি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ।

৭

যতি ও ছন্দ

১৩৩৮ শ্রাবণ ৯

তুমি যে 'ম্লান' শব্দটিকে হসন্তভাবে উচ্চারণ কর, এ আমার কাছে নতুন লাগল। আমি কখনই 'ম্লান্' বলি নে। প্রাকৃত বাংলায় যেসব শব্দ অতিপ্রচলিত তাদেরই উচ্চারণে এইরকম স্বরলুপ্তি সহ্য করা চলে। 'ম্লান' শব্দটা সে জাতের নয় এবং ওটা অতি সুন্দর শব্দ, ওকে বিনাদোষে জরিমানা করে ওর স্বরহরণ কোরো না, তোমার কাছে এই আমার দরবার।[১]

যতি বলতে বোঝায় বিরাম।[২] ছন্দ জিনিসটাই হচ্ছে আবৃত্তিকে বিরামের বিশেষ বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা।

ললিত লব | ঙ্গ ল | তা পরি | শীলন |[৩]

প্রত্যেক চারমাত্রার পরে বিরাম।

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি |[৪]

১ মিল বা ছন্দের খাতিরে 'ম্লান' শব্দটিকে কখনও কখনও 'ম্লান্'-রূপে উচ্চারণ করার প্রয়োজন হয়। যেমন—

দেবী, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি॥

—'চিত্রা', সাধনা

২ যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া॥

—ছন্দোমঞ্জরী ১।১৯

যতির্বিচ্ছেদঃ।— পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম্ ৬।১

৩ গীতগোবিন্দ, প্রথম সর্গ, তৃতীয় গীত।

৪ গীতগোবিন্দ, দশম সর্গ, প্রথম গীত। এই দৃষ্টান্তটির বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য 'বাংলা ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায়ের তৃতীয় বিভাগে এবং 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগের শেষের দিকে।

পাঁচ-পাঁচ মাত্রার শেষে বিরাম। তুমি যদি লেখ 'বদসি যত্তপি' তা হলে এই ছন্দে যতির যে পঞ্চায়তী বিধান আছে তা রক্ষা হবে না। এখানে যতিভঙ্গ ছন্দোভঙ্গ একই কথা। প্রত্যেক পদক্ষেপের সমষ্টি নিয়ে নৃত্য, কিন্তু একটিমাত্র পদপাতে যদি চ্যুতি ঘটে তা হলে সে ত্রুটি পদবিক্ষেপের ত্রুটি, সুতরাং সমস্ত নৃত্যেরই ত্রুটি।

দিলীপকুমার রায়কে লেখা :
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৮

সাধু ছন্দে হসন্তপ্রয়োগ

১৩৩৮ ভাদ্র ৭

'তোমারই' কথাটাকে সাধুভাষার ছন্দেও আমরা 'তোমারি' বলে গণ্য করি।[১] এমন একদিন ছিল যখন করা হত না। আমিই প্রথমে এটা চালাই।[২]

'একটি' শব্দকে সাধুভাষায় তিন মাত্রার মর্যাদা যদি দেও তবে ওর হসন্ত হরণ করে অত্যাচারের দ্বারা সেটা সম্ভব হয়।[৩] যদি হসন্ত রাখ তবে দ্বৈমাত্রিক বলে ওকে ধরতেই হবে। যদি মাছের উপর কবিতা লেখার প্রয়োজন হয় তবে 'কাৎলা' মাছকে কা-ত-লা উচ্চারণের জোরে সাধুত্বে উত্তীর্ণ করা আর্যসমাজি শুদ্ধিতেও বাধবে। তুমি কি লিখতে চাও

পাতলা করিয়া কাটো কাতলা মাছেরে,
উৎসুক নাতনী যে চাহিয়া আছে রে?

আর আমি যদি লিখি

---

১ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম পর্যায় তৃতীয় বিভাগে 'এখনই আসিলাম দ্বারে' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত।

২ রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও 'তোমারি' 'যখনি' প্রভৃতি রূপ প্রচলিত ছিল বলেই মনে হয়। ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও এরকম দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

৩ দিলীপকুমার জানিয়েছেন—

"আমার প্রশ্ন ছিল 'একটি' দুই মাত্রার, না তিন মাত্রার।...সাধুভাষার পয়ারে একটি-র ওজন কি?"

—উত্তরা ১৩৩৮ আশ্বিন, পৃ ৩১৭ পাদটীকা

দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম বিভাগ ও পাদটীকা।

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে,
টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও সরষে আর জিরে।
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কা বাঁটা,
যত্ন করে বেছে ফেলো টুক্‌রো যত কাঁটা ॥[১]

আপত্তি করবে কি ? 'উষ্ট্র' যদি দুই মাত্রায় পদক্ষেপ করতে পারে তবে 'একটি' কী দোষ করেছে ?

'জনগণমনঅধিনায়ক' সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় আমদানি।[২]

দিলীপকুমার রায়কে লেখা :
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি[৩]

ছন্দ-ধাঁধা

প্রথম পর্যায়

[১৯২১ ?]

কবিকাহিনী

When the evening steals on western waters,
Thrills the air with wings of homeless shadows ;
When the sky is crowned with star-gemmed silence,
And the dreams dance on the deep of slumber ;
When the lilies lose their faith in morning
And in panic close their hopeless petals,
There's a bird which leaves its nest in secret,
Seeks its song in trackless path of heaven.

কি ছন্দ বল্‌ দেখি ? একটা বাংলা ছন্দে লিখেছিলুম, কিন্তু ইংরেজি ছন্দেও পড়া যায়।[৪]

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি : সচিত্র পোস্টকার্ড
মডার্ন রিভিউ, সেপ্‌টেম্বর ১৯২১ : *The Song*

১ এই দুই দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় বিভাগে।

২ দ্রষ্টব্য : পূর্ববর্তী ৪-সংখ্যক পত্রের ষষ্ঠ প্রসঙ্গ ও পাদটীকা।

৩ দ্রষ্টব্য : উত্তরা ১৩৩৮ আশ্বিন : 'পত্রধারা', পৃ ৩১৭ এবং দিলীপকুমার-প্রণীত 'অনামী', প্রথম সংস্করণ (১৯৩৩), পৃ ৩৪০।

৪ যাঁর উদ্দেশে লেখা, পোস্টকার্ডটিতে তাঁর নাম নেই। শোনা যায় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা। দ্রষ্টব্য : বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ কার্তিক-পৌষ, পৃ ১৮৮।

কবি-কাহিনী (৫)

"PHOSTINT" POST CARD

PLACE STAMP HERE

UNITED STATES AND CANADA ONE CENT

FOREIGN, TWO CENTS

When the evening steals on Western waters,
~~Rotts~~ Thrills the air with wings of homeless shadows;
When the sky is crowned with star-gemmed silence,
And the dreams dance on the deep of slumber;
When the lilies lose their faith in morning
And in panic close their hopeless petals,
There's a bird which leaves its nest in secret,
Seeks its song in trackless path of heaven.

— × —

কি ছন্দ বল দেখি? [illegible] ছন্দে [illegible]
কিন্তু ইংরেজি ছন্দের [illegible]।

FOR THE ADDRESS

'কবি-কাহিনী' : ছন্দ-ধাঁধা ১

ছন্দ-ধাঁধা

দ্বিতীয় পর্যায়

১৯২৮ শেষভাগ]

ক

১ ভোর হোলো,
কুসুমগুলি তোলো।
আনো ফুলের ডালা,
গাঁথো মালা।

২ আকাশ ঢেকেছে মেঘে,
বাতাস বহিতেছে বেগে।

৩ মুখে কিছু নাহি বলে,
নয়ন দুটি ভরিল জলে।

৪ শোনো না তবুও আপনার মনে
কথা বলে যাই কত,
বধির তীরের নিকটে রাত্রিদিবস
নদীর ধ্বনির মত।

৫ সারা রাত তারা যতই জ্বলে,
রেখা না রাখে আকাশের তলে।[১]

৬ চাষের সময় কিছু করি নাই হেলা,
ভুলে ছিলাম ফসল কাটিবার বেলা।[২]

১ দ্রষ্টব্য : 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্য, 'সারা রাত তারা' ইত্যাদি রচনা।

২ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগের এবং 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যের 'চাষের সময়ে' ইত্যাদি রচনা। উভয়ত্রই পাঠ আছে— 'যদিও করি নি হেলা'।

৭ রাতের বাদল মাতে তমালের শাখে,
পাখিদের বাসায় আসিয়া 'জাগো জাগো' ডাকে।[১]

খ

৮ সকালে অধীর বাতাস এল,
বৃথাই শুধু বনেরে বকালে।
চেয়ে দেখি দিনশেষে
মাটি ঝরা ফুলে ছেয়ে
লতারে ঠকালে কাঙাল করে॥[২]

আদর্শ

তৃতীয়ার চাঁদখানি বাঁকা সে,
আপনারে চেয়ে দেখে ফাঁকা সে।
তারাদের পানে চায়
বিদেশী জনের প্রায়,
জুড়ি না খুঁজিয়া পায় আকাশে॥[৩]

৯ শিশির-বাতাস লেগে শরতে
উদাসী মেঘে জল ভ'রে আসে।
তবু কেন বরষন হয় না,
যেন চেয়ে রয়েছে ব্যথা নিয়ে॥[৪]

১ দ্রষ্টব্য : 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্য, 'রাতের বাদল মাতে' ইত্যাদি রচনা।

২ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগে 'অধীর বাতাস এল' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত।

৩ তুলনীয় : 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগের শেষ দৃষ্টান্তটির পাঠ। এই দুই পাঠে ভাবগত সম্পূর্ণ ঐক্য থাকা সত্ত্বেও ভাষাগত পার্থক্য প্রচুর। তার চেয়েও বেশি লক্ষণীয় এ দুটি রচনার ছন্দোগত পার্থক্য। 'ছন্দধাঁধা'র রচনাটিতে প্রতি পূর্ণপর্বে আছে চার মাত্রা, আর 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধের দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পূর্ণপর্বে আছে ছয় মাত্রা।

৪ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগের এবং 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যের 'শরতে শিশির' ইত্যাদি রচনা।

আদর্শ

ভেসে-যাওয়া ফুল ধরিতে নারে,
ধরিবারে ঢেউ ছুটায় তারে।[১]

১০ যে দুর্ভাগার মাটিতে বাসা ভেঙেছে,
উচ্চ করি সে আকাশে আশা গাঁথিছে।[২]

আদর্শ

বর্ষণগৌরব তার গিয়েছে চুকি,
রিক্ত মেঘ দিক্‌প্রান্তে মারিছে উঁকি।[৩]

১১ অপরাজিতা ফুটিল, লতিকার গর্ব নাহি ধরে—
যেন আকাশের আপন অক্ষরে লিপিকা পেয়েছে।[৪]

আদর্শ

যখন গগনতলে আঁধারের দ্বার গেল খুলি
সোনার সংগীতে উষা চয়ন করিল ফুলগুলি।[৫]

১ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যের 'ভেসে-যাওয়া ফুল' ইত্যাদি রচনায় আছে— 'ধরিবারই ঢেউ'।

২ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যের 'মাটিতে [যে] দুর্ভাগার' ইত্যাদি রচনায় আছে— 'আকাশে সমুচ্চ করি'।

৩ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যের 'বর্ষণগৌরব তার' ইত্যাদি রচনায় আছে— 'ভয়ে দেয় উঁকি'। কিন্তু এই পাঠে এক মাত্রা বেশি হয়। 'মারিছে উঁকি' পাঠই ছন্দের বিচারে অধিকতর সংগত। তাতে পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির সঙ্গে মাত্রাগত সমতা রক্ষিত হয়।

৪ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে এই রচনাটি যে রূপে ('অপরাজিতা ফুটিল' ইত্যাদি) মুদ্রিত হয়েছে সেটিও এ ছন্দের আদর্শরূপ নয়। 'ছন্দধাঁধা'য় এটির যে 'আদর্শ' দেওয়া আছে, এটিকে সেভাবে সাজালে দাঁড়াবে এরকম—

ফুটিল অপরাজিতা, লতিকার গর্ব নাহি ধরে—
লিপিকা পেয়েছে যেন আকাশের আপন অক্ষরে।

৫ দ্রষ্টব্য : 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্য, 'যখন গগনতলে' ইত্যাদি রচনা।

১২ রংমশালীর দলে ভিড় করেছে,
তারা কেউ বা জলে, কেউ বা স্থলে।
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে
পায়ের কাছে পথটি চিনে } (ভুল নয়)
তারা দুঃসাহসে এগিয়ে চলে ॥[১]

গ

১৩ ঢাক বাজনা গোড়াতেই,
তার কাজ না কাজ করা।

আদর্শ

শকতিহীনের দাপনি
আপনারে মারে আপনি ॥[২]

১৪ তোমার হাসিতে আমারে আপনমাঝে জাগালো,
মোর স্বপনের সুরেতে পায়ের নূপুর বাজে।

১৫ যাহা কিছু কাঙালের মতো পাস
তাহারে পেয়ে হারাস।
যাহা সব চেয়ে চাবার তাহারে
চেয়ে চেয়ে ফিরিস না।

১৬ যে কথা কোনোদিন আর আমার
বলা হয় নি,
তাই কারে বলিবারে নাহি জানে
উতলা করে।

১ দ্রষ্টব্য : 'পরিশেষ' কাব্যের সংযোজন-অংশে 'রঙিন' কবিতার (১৩৩৫ ভাদ্র ২৩) প্রথম স্তবক।

২ এই দুটি দৃষ্টান্তই আছে 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায় প্রথম অনুচ্ছেদে।

১৭ মোর কুঞ্জতলে অনেক মালা গেঁথেছি,
সকালবেলায় অতিথিরা গলে পরল।
কে আজ ঐ সন্ধেবেলায় ডালা আনলো গো,
হায় জীর্ণ পাতায় কি শুকনো মালা গাঁথব।[১]

ঘ

১৮ কুসুম ফুটেছে নিশীথে শেফালি-বনে,
গন্ধে কখন ভরিল বাতাসের ঘুম।

১৯ উন্মত্ত প্লাবনে ছুটিয়া চলে তটিনী,
ঝরে অজস্র বর্ষণ অশ্রান্ত শ্রাবণে।

আদর্শ

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মোর করহ ছেদন।[২]

২০ ছুটি কিশোরী বালিকা ফুল নিয়ে
সুখে বকুলতলে মালা গাঁথে।

আদর্শ

অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।[৩]

১ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যের 'অনেক মালা গেঁথেছি মোর' ইত্যাদি রচনায় আছে— 'সন্ধেবেলা কে এল আজ নিয়ে ডালা' এবং 'ঝরা পাতায়'।

২ 'নৈবেদ্য' কাব্যের ৯৯-সংখ্যক কবিতায় আছে— সকল ক্ষীণতা 'মম'।

৩ বিহারীলাল : 'বঙ্গসুন্দরী' ৩।১। দ্রষ্টব্য : 'বিহারীলালের ছন্দ', 'সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দ' এবং 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায়।

২১ আকাশতলে চলে ভাসিয়া
তপন তারকা শশী।

আদর্শ

নীরবে কেন আঁচলে হেন
নয়ন আছে আবরি।

২২ শতদল তুলিছে সুনীল সরোবরে,
নিষেধে পলে পলে মধুকরে ক্ষোভিছে।

আদর্শ

হৃদয় আজি মম কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।[১]

২৩ মোর জীবন-অঙ্গনে একা
একদা দাঁড়াইল অতিথি।
আমার বাতায়নে চাহিয়া
বাহু শূন্য পানে বাড়াইল।

আদর্শ

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।[২]

২৪ হয়েছে মোদের ঘরে দীপ জ্বালা
হৃদয়ে বাঁশির ধ্বনি এসে লাগে।

আদর্শ

বিদায়পথে কে দেয় মোরে বাধা
পিছন হতে করুণ অনুনয়ে।

১ 'প্রভাতসংগীত' কাব্যের 'প্রভাত-উৎসব' কবিতায় আছে— হৃদয় আজি 'মোর'
২ দ্রষ্টব্য : 'স্মরণ' কাব্য, ১৩-সংখ্যক কবিতা।

২৫ মুখের পানে যেমনি তার চাওয়া,
উতলা হাওয়া প্রদীপ নিবাইল।

আদর্শ

বলিতে গিয়ে কথা নীরবে কাঁদে,
চলিতে পায়ে পায়ে চরণ বাধে।

২৬ নবীন ফুলে আজি ঐ কে
সাজি সকালবেলা সাজায়
পেতে আঁচলখানি বনের ছায়ে।

আদর্শ

গাছের পাতা যেমন কাঁপে
দখিন বায়ে মধুর তাপে
তেমনি মম কাঁপিছে সারা প্রাণ।

২৭ তুমি আঁধারে প্রদীপ জ্বেলে
আজি দেখিতে এলে কাহারে,
সে তার ভাবনা মেলে আছে
সুদূর গগনে।

আদর্শ

বিহানবেলা আঙিনাতলে
এসেছ তুমি কি খেলা-ছলে,
চরণ-দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।[১]

১ দ্রষ্টব্য : 'শিশু' কাব্যের 'খেলা' কবিতা।

ঙ সহজ

২৮ জলে নয়ন ভাসিয়া যায়
পলে পলে ফিরিয়া তাকায়।

আদর্শ

কাননপথের পাশে পাশে
শিশির ঝলিছে ঘাসে ঘাসে।

২৯ দেবালয়ে সাঁঝবেলা
সে ভয়ে ভয়ে চলিছে।

আদর্শ

মেয়েরা নাহিছে ঘাটে
ছেলেরা সাঁতার কাটে।

৩০ কেহ মা-হারা ছেলেকে
যদিবা স্নেহ না করে,
আনন্দমনে তবু সে খেলে।

আদর্শ

হই দুঃখী হই দীন
কাহারো রাখি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত।[১]

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

১ দ্রষ্টব্য : 'শিশু' কাব্যের 'পূজার সাজ' কবিতা।

তৃতীয় পর্ব

১৩৩৮-১৩৪৭

প দ্য ছ ন্দ

ছন্দের হসন্ত-হলন্ত[১]

প্রথম পর্যায়

আমার নিজের বিশ্বাস যে আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে মেপে এ কাজ করি নে, অন্তত সজ্ঞানে নয়। কিন্তু ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন[২] এই বলে আমাদের দোষ দিয়েছেন যে— আমরা একটা কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়ে পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে তার চোখ ভুলিয়ে এসেছি, আমরা ধ্বনি চুরি করে থাকি অক্ষরের আড়ালে।

ছন্দোবিৎ কী বলছেন ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। তাঁর প্রবন্ধে আমার লেখা থেকে কিছু লাইন তুলে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যবহার করেছেন। যথা—

+ । + । ।
উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
+ ।
মোর চিত্ত মাঝে,
+
চিরনূতনেরে দিল ডাক
। +
পঁচিশে বৈশাখ।

তিনি বলেন, "এখানে দণ্ডচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে এক বলে ধরা হয়েছে, কারণ

১ 'হলন্ত' শব্দটি 'স্বরান্ত' অর্থে প্রযুক্ত। দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় তৃতীয় বিভাগের শেষ পাদটীকা।

২ বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ : 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ'।

এগুলি শব্দের মধ্যে অবস্থিত ; আর যোগচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে দুই বলে ধরা হয়েছে, যেহেতু এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত।" অর্থাৎ 'উদয়'এর অয়্ হয়েছে দুই মাত্রা অথচ 'দিগন্ত'এর অন্ হয়েছে একমাত্রা, এইজন্যে 'উদয়' শব্দকেও তিন মাত্রা এবং 'দিগন্ত' শব্দকেও তিন মাত্রা গণনা করা হয়েছে। 'যুগ্মধ্বনি' শব্দটার পরিবর্তে ইংরেজি সিলেব্‌ল্ শব্দ ব্যবহার করলে অনেকের পক্ষে সহজ হবে। আমি তাই করব।

বহুকাল পূর্বে একদিন বাংলার শব্দতত্ত্ব আলোচনা করেছিলুম। সেই প্রসঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের কথাও মনে উঠেছিল। তখন দেখেছিলুম বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের উচ্চারণে জ-এর অ এবং চাঁ-এর আ আমরা দীর্ঘ করে টেনে পরবর্তী হসন্তের ক্ষতিপূরণ করে থাকি। জল এবং জলা, চাঁদ এবং চাঁদা শব্দের তুলনা করলে এ কথা ধরা পড়বে।[১] এ সম্বন্ধে বাংলার বিখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ববিৎ সুনীতিকুমারের[২] বিধান নিলে নিশ্চয়ই তিনি আমার সমর্থন করবেন। বাংলায় ধ্বনির এই নিয়ম স্বাভাবিক বলেই আধুনিক বাঙালি কবি ও ততোধিক আধুনিক বাঙালি ছন্দোবিৎ জন্মাবার বহু পূর্বেই বাংলা ছন্দে প্রাক্‌হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবি দেওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালির কানে ঠেকে নি। এই প্রথম দেখা গেল নিয়মের ধাঁধায় পড়ে বাঙালি পাঠক কানকে অবিশ্বাস করলেন। কবিতা লেখা শুরু করবার বহুপূর্বে সবে যখন দাঁত উঠেছে তখন পড়েছি "জল পড়ে, পাতা নড়ে"। এখানে 'জল' যে 'পাতা'র চেয়ে মাত্রাকৌলীন্যে কোনো অংশে কম এমন সংশয় কোনো বাঙালি শিশু বা তার পিতামাতার কানে বা মনেও উদয় হয় নি। এইজন্যে ঐ দুটো কথা অনায়াসে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে গেছে, আইনের ঠেলা খায় নি। ইংরেজি মতে 'জল' সর্বত্রই এক সিলেব্‌ল্, 'পাতা' তার ডবল ভারী। কিন্তু জল শব্দটা ইংরেজি নয়। 'কাশীরাম' নামের 'কাশী' এবং 'রাম' যে একই ওজনের এ

১ দ্রষ্টব্য : 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১' তৃতীয় প্রসঙ্গ শেষ অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা এবং 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' চতুর্থ পর্বায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

২ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কথাটা কাশীরামের স্বজাতীয় সকলকেই মানতেই হয়েছে। 'উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে' এই লাইনটা নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রবোধচন্দ্র ছাড়া আর কোনো পাঠকের কিছুমাত্র খটকা লেগেছে বলে আমি জানি নে, কেননা তারা সবাই কান পেতে পড়েছে, নিয়ম পেতে নয়। যদি কর্তব্যবোধে নিতান্তই খটকা লাগা উচিত হয়, তা হলে সমস্ত বাংলা কাব্যের পনেরো-আনা লাইনের এখনি প্রুফসংশোধন করতে বসতে হবে।

২

লেখক আমার একটা মস্ত ফাঁকি ধরেছেন। তিনি বলেন, আমি ইচ্ছামতো কোথাও 'ঐ' লিখি কোথাও লিখি 'ওই', এই উপায়ে পাঠকের চোখ ভুলিয়ে অক্ষরের বাটখারার চাতুরীতে একই উচ্চারণকে জায়গা বুঝে দুই রকমের মূল্য দিয়েছি।

তা হলে গোড়াকার ইতিহাসটা বলি। তখনকার দিনে বাংলা কবিতায় এক-একটি অক্ষর এক সিলেব্‌ল্‌ বলেই চলত। অথচ সেদিন কোনো কোনো ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক বলে গণ্য করার দরকার আছে বলে অনুভব করেছিলুম।

আকাশের ওই আলোর কাঁপন
নয়নেতে এই লাগে,
সেই মিলনের তড়িৎ-তাপন
নিখিলের রূপে জাগে।

আজকের দিনে এমন কথা অতি অর্বাচীনকেও বলা অনাবশ্যক যে, ঐ ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দকে নীচের মতো রূপান্তরিত করা অপরাধ।—

ঐ যে তপনের রশ্মির কম্পন
এই মস্তিষ্কেতে লাগে,
সেই সম্মিলনে বিদ্যুৎ-ঝম্পন
বিশ্বমূর্তি হয়ে জাগে।

অথচ সেদিন 'বৃত্রসংহারে' এইজাতীয় ছন্দে হেমচন্দ্র ঐন্দ্রিলার রূপবর্ণনায় অসংকোচে লিখতে পেরেছিলেন

বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।

বেশ মনে আছে সেদিন স্থানবিশেষে 'ঐ' শব্দের বানান নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্র নিশ্চয় বলবেন, "ভেবে যা হয় একটা স্থির করে ফেলাই ভালো ছিল। কোথাও বা 'ঐ', কোথাও বা 'ওই' বানান কেন?" তার উত্তর এই, বাংলার স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতা সংস্কৃতের মতো বাঁধা নিয়ম মানে না, ওর মধ্যে অতি সহজেই বিকল্প চলে। "ও-ই দেখো, খোকা ফাউনটেন পেন মুখে পুরেছে", এখানে দীর্ঘ ওকারে কেউ দোষ ধরবে না। আবার যদি বলি "ঐ দেখো, ফাউনটেন পেনটা খেয়ে ফেললে বুঝি", তখন হ্রস্ব ঐকার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না।[১] বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিকে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো-কমানো যায় বলেই ছন্দে তার গৌরব বা লাঘব নিয়ে আজ পর্যন্ত দলাদলি হয় নি।

এসব কথা দৃষ্টান্ত না দিলে স্পষ্ট হয় না, তাই দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হল।

মনে পড়ে দুইজনে জুঁই তুলে বাল্যে
নিরালায় বনছায় গেঁথেছিনু মাল্যে।
দোঁহার তরুণ প্রাণ বেঁধে দিল গন্ধে
আলোয় আঁধারে মেশা নিভৃত আনন্দে॥

এখানে 'দুই' 'জুঁই' আপন আপন উকারকে দীর্ঘ করে দুই সিলেব্‌ল্‌এর টিকিট পেয়েছে, কান তাদের সাধুতায় সন্দেহ করলে না, দ্বার ছেড়ে দিলে। উলটো দৃষ্টান্ত দেখাই।

এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে-দেখা রূপ,
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জ্বালালি ধূপ।
যায় যদি রে যাক না ফিরে, চাই নে তারে রাখি,
সব গেলেও হায় রে তবু স্বপ্ন রবে বাকি॥

এখানে 'এই' 'সেই' 'কই' 'যায়' 'হায়' প্রভৃতি শব্দ এক সিলেব্‌ল্‌এর বেশি মান দাবি করলে না। বাঙালি পাঠক সেটাকে অন্যায় না মনে করে সহজ ভাবেই নিলে।

১ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ এবং চতুর্থ পর্যায় তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

কাঁধে মই, বলে "কই ভুঁইচাঁপা গাছ",
দইভাঁড়ে ছিপ ছাড়ে, খোঁজে কইমাছ।
ঘুঁটেছাই মেখে লাউ রাঁধে ঝাউপাতা,
কী খেতাব দেব তায় ঘুরে যায় মাথা॥

এখানে 'মই' 'কই' 'ভুঁই' 'দই' 'ছাই' 'লাউ' প্রভৃতি সকলেরই সমান দৈর্ঘ্য, যেন গ্র্যানেডিয়ারের সৈন্যদল। যে পাঠক এটা পড়ে দুঃখ পান নি সেই পাঠককেই অনুরোধ করি, তিনি পড়ে দেখুন—

দুইজনে জুঁই তুলতে যখন
গেলেম বনের ধারে,
সন্ধ্যা-আলোর মেঘের ঝালর
ঢাকল অন্ধকারে।
কুঞ্জে গোপন গন্ধ বাজায়
নিরুদ্দেশের বাঁশি,
দোঁহার নয়ন খুঁজে বেড়ায়
দোঁহার মুখের হাসি॥

এখানে যুগ্মধ্বনিগুলো এক সিলেব্‌ল্‌এর চাকার গাড়িতে অনায়াসে ধেয়ে চলেছে।

চণ্ডীদাসের গানে রাধিকা বলেছেন, "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"। বাঁশিধ্বনির এই তো ঠিক পথ, নিয়মের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলে মরমে পৌঁছত না। কবিরাও সেই কান লক্ষ্য করে চলেন, নিয়ম যদি চৌমাথার পাহারাওয়ালার মতো সিগ্‌ন্যাল তোলে তবু তাঁদের রুখতে পারে না।

আমার দুঃখ এই, তথাচ আইনবিৎ বলছেন যে, লিপিপদ্ধতির দোষে 'অক্ষর গুনে ছন্দরচনার অন্ধ অভ্যাস' আমাদের পেয়ে বসেছে। আমার বক্তব্য এই যে, ছন্দরচনার অভ্যাসটাই অন্ধ অভ্যাস। অন্ধের কান খুব সজাগ, ধ্বনির সংকেতে সে চলতে পারে, কবিরও সেই দশা। তা যদি না হত তা হলেই পায়ে পায়ে কবিকে চোখে চশমা এঁটে অক্ষর গনে গনে চলতে হত।

৩

'বৎসর' 'উৎসব' প্রভৃতি খণ্ড ৎ-ওয়ালা কথাগুলোকে আমরা ছন্দের মাপে

বাড়াই কমাই, এ রকম চাতুরী সম্ভব হয় যেহেতু খণ্ড ৎ-কে কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্যে এক অক্ষর ধরি আবার কখনো কানে শোনার দোহাই দিয়ে তাকে আধ অক্ষর বলে চালাই, প্রবন্ধলেখক এই অপবাদ দিয়েছেন। অভিযোগকারীর বোঝা উচিত এটা একেবারেই অসম্ভব, কেননা ছন্দের কাজ চোখভোলানো নয়, কানকে খুশি করা, সেই কানের জিনিসে ইঞ্চিগজের মাপ চলেই না। 'বৎসর' প্রভৃতি শব্দ গেঞ্জিজামার মতো; মধুপুরের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় দেহ এক-আধ ইঞ্চি বাড়লেও চলে, আবার শহরে এসে এক-আধ ইঞ্চি কমলেও সহজে খাপ খেয়ে যায়। কান যদি সম্মতি না দিত তা হলে কোনো কবির সাধ্য ছিল না ছন্দ নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে।

বৎসরে বৎসরে হাঁকে কালের গোমায়ু,
যায় আয়ু, যায় আয়ু, যায় যায় আয়ু।

এখানে 'বৎসর' তিন মাত্রা। কিন্তু সেতারে মিড় লাগাবার মতো অল্প একটু টানলে বেসুর লাগে না। যথা—

সখাসনে উৎসবে বৎসর যায়,
শেষে মরি বিরহের ক্ষুৎপিপাসায়।
ফাগুনের দিনশেষে মউমাছি ও যে
মধুহীন বনে বৃথা মাধবীরে খোঁজে॥

টান কমিয়ে দেওয়া যাক।—

উৎসবের রাত্রিশেষে মৃৎপ্রদীপ হায়,
তারকার মৈত্রী ছেড়ে মৃত্তিকারে চায়।

দেখা যাচ্ছে এটুকু কমবেশিতে মামলা চলে না, বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে। যদি লেখা যেত—

সখাসনে মহোৎসবে বৎসর যায়

তা হলে নিয়ম বাঁচত, কারণ পূর্ববর্তী ওকারের সঙ্গে খণ্ড ৎ মিলে এক মাত্রা। কিন্তু কর্ণধার বলছে ঐখানটায় তরণী যেন একটু কাত হয়ে পড়ল।

আমি এক জায়গায় লিখেছি 'উদয়-দিক্‌প্রান্ত-তলে'। ওটাকে বদলে 'উদয়ের দিক্‌প্রান্ততলে' লিখলে কানে খারাপ শোনাত না, এ কথা প্রবন্ধলেখক বলেছেন। সালিসির জন্তে কবিদের উপর বরাত দিলুম।

অপরপক্ষে দেখা যাক চোখ ভুলিয়ে ছন্দের দাবিতে ফাঁকি চালানো যায় কি না।

এখনই আসিলাম দ্বারে
　　　　অমনই ফিরে চলিলাম,
চোখও দেখে নি কভু তারে
　　　　কানই শুনিল তার নাম।

'তোমারি', 'যখনি' শব্দগুলির ইকারকে বাংলা বানানে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে লেখা হয়, সেই সুযোগ অবলম্বন করে কোনো অলস কবি ওগুলোকে চার মাত্রার কোঠায় বসিয়ে ছন্দ ভরাট করেছেন কি না জানি নে, যদি করে থাকেন বাঙালি পাঠক তাঁকে শিরোপা দেবে না।[১] ওদের উকিল তখন 'বৎসর' 'উৎসব' 'দিক্‌প্রান্ত' প্রভৃতি শব্দগুলির নজির দেখিয়ে তর্ক করবে। তার একমাত্র উত্তর এই যে, কান যেটাকে মেনে নিয়েছে কিংবা মেনে নেয় নি, চোখের সাক্ষ্য নিয়ে কিম্বা বাঁধানিয়মের দোহাই দিয়ে সেখানে তর্ক তোলা অগ্রাহ্য। যে-কোনো কবি উপরের ছড়াটাকে অনায়াসে বদল করে লিখতে পারে—

এখনি আসিনু তার দ্বারে
　　　　অমনি ফিরিয়া চলিলাম,
চোখেও দেখি নি কভু তারে
　　　　কানেই শুনেছি তার নাম।

'বৎসর' 'উৎসব' প্রভৃতি শব্দ যদি তিন মাত্রার কোঠা পেরোতে গেলেই স্বভাবতই খুঁড়িয়ে পড়ত তা হলে তার স্বাভাবিক ওজন বাঁচিয়ে ছন্দ চালানো এতই দুঃসাধ্য হত না যে, ধ্বনিকে এড়িয়ে অক্ষরগণনার আশ্রয়ে শেষে মান-বাঁচানো আবশ্যক হত। ওটা চলে বলেই চালানো হয়েছে, দায়ে পড়ে না। কেবল অক্ষর সাজিয়ে অচল রীতিকে ছন্দে চালানো যদি সম্ভব হত তা হলে খোকাবাবুকে কেবল লম্বা টুপি পরিয়ে দাদামশায় বলে চালানো অসাধ্য হত না।

বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৮ : 'বাংলা ছন্দ' (অংশ)

১ দ্রষ্টব্য : 'পত্রধারা' প্রথম পর্যায়ের অষ্টম পত্র প্রথম অনুচ্ছেদ

দ্বিতীয় পর্যায়

দিলীপকুমার আশ্বিনের 'উত্তরা'য় ছন্দ সম্বন্ধে আমার দুই-একটি চিঠির খণ্ড ছাপিয়েছেন।[১] সর্বশেষে যে নোটটুকু[২] দিয়েছেন তার থেকে বোঝা গেল আমি যে কথা বলতে চেয়েছি, এখনো সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় নি।

তিনি আমারই লেখার নজির তুলে দেখিয়েছেন যে, নিম্নলিখিত কবিতায় আমি 'একেকটি' শব্দটাকে চার মাত্রার ওজন দিয়েছি।—

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।

এ দিকে নীরেনবাবুর[৩] রচনায়[৪] "একটি কথা এতবার হয় কলুষিত" পদটিতে 'একটি' শব্দটাকে দুই মাত্রায় গণ্য করতে আপত্তি করি নি বলে তিনি দ্বিধা বোধ করছেন। তর্ক না করে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি,
একটুও নাহি মেলে সাড়া।
সখীরা যখন জোটে মুখে তব বন্যা ছোটে,
গোলমালে তোলপাড় পাড়া॥

'একটি' 'তিনটি' 'একটু' শব্দগুলি হসন্তমধ্য, 'গোলমাল' 'তোলপাড়'ও সেই জাতের। অথচ হসন্তে ধ্বনিলাঘবতার অভিযোগে ওদের মাত্রা জরিমানা দিতে হয় নি। তিন মাত্রা ও চার মাত্রার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন কেবলমাত্র অক্ষরগণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েছে, অর্থাৎ যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তা হলেই ছন্দে ধ্বনির কমতি ধরা পড়ত। আমার

---

১ উত্তরা ১৩৩৮ আশ্বিন : 'পত্রধারা', পৃ ৩১৭। দ্রষ্টব্য : 'অনুষঙ্গ ১' বিভাগে (১৩৩৮ ভাদ্র ৭ তারিখে লিখিত) অষ্টম পত্র ও তার তৃতীয় পাদটীকা।

২ নোটটুকু এই।—"কিন্তু কবির 'সোনার তরী'তে 'বর্ষাযাপন' কবিতায় যেখানে যুক্ত অক্ষরের মাত্রা এক, দুই নয়, সেখানে কবি লিখেছেন 'ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত গল্প লিখি একেকটি করে'। এখানে 'একেকটি'কে কবির নির্দেশমত [দ্রষ্টব্য : ১৩৩৮ ভাদ্র ৭ তারিখের পত্র] তিন মাত্রা ধরা উচিত, কিন্তু কবি ধরেছেন চার মাত্রা।"

৩ নীরেন্দ্রনাথ রায়।

৪ পরিচয় ১৩৩৮ কার্তিক : 'অনুবাদ', পৃ ৩০৮।

বক্তব্য এই যে, চোখ দিয়ে ছন্দ পড়া আর বাইসিক্‌ল্‌এর চাকা দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া একই কথা, ওটা হবার জো নেই। বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে।

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
সিট্‌কে মুখ খাবি, জ্বর আট্‌কে যাবে কাল।

বলে রাখা ভালো এটা ভিষক্‌-ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন নয়, সাহিত্য-ডাক্তারের বানানো ছড়া ছন্দ সম্বন্ধে মতসংশয় নিবারণের উদ্দেশে; এর থেকে অন্য কোনো রোগের প্রতিকার কেউ যেন আশা না করেন। আরো একটা—

একৃটি কথা শুনিবারে তিন্‌টে রাত্রি মাটি,
এর পরে ঝগ্‌ড়া হবে, শেষে দাঁত্‌কপাটি।

অথবা

একৃটি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,
টাট্‌কা মাছ জুট্‌ল না তো, শুঁট্‌কি দেখো চেখে।

শেষের তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুনতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু তাই বলেই যে পয়ার ছন্দের নির্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে হয় এটা যথেচ্ছাচার। কিন্তু হিসাব করে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয় নি। কেননা, তার জো নেই। এ তো রাজত্ব করা নয়, কবিত্ব করা, এখানে লক্ষ্য হল মনোরঞ্জন। খামকা একটা জবরদস্তির আইন জারি করে তার পরে পাহারাওয়ালা লাগিয়ে দেওয়া, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ধ্বনির রাজ্যে গোঁয়ারতমি করে কেউ জিতে যাবে এমন সাধ্য আছে কার? চব্বিশ ঘণ্টা কান রয়েছে সতর্ক।

আমি এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করছি যে, আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র। যেমন 'জল' শব্দটাকে দিয়ে 'জল' পদার্থটার প্রতিবাদ চলে না, অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো তেমনি বিড়ম্বনা।

২

প্রশ্ন উঠবে, তাই যদি হয় তা হলে থোঁড়া হসন্তবর্ণকে কখনো আধমাত্রা কখনো পুরোমাত্রার পদবিতে বসানো হয় কেন। উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, স্বয়ং

ভাষা যদি নিজেই আসন পেতে দেয় তবে তার উপরে অন্য কোনো আইন চলে না। ভাষাও বর্ণভেদে পঙ্‌ক্তির ব্যবস্থা নিজের ধ্বনির নিয়ম বাঁচিয়ে তবে করতে পারে। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে। সেটাকে গুণ বলেই গণ্য করি। তাতে ধ্বনিরসের বৈচিত্র্য হয়। আমরা দ্রুত লয়ে বলতে পারি 'এইরে', আবার তাকে টানলে ডবল করে বলতে পারি 'এ- ইরে'।[১] তার কারণ আমাদের স্বরবর্ণগুলো জীবধর্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে। চারটে পাথরের মূর্তি ধরাবার মতো জায়গায় পাঁচটা ধরাতে গেলে মুশকিল বাধে। কিন্তু চারজন প্যাসেঞ্জার বসবার বেঞ্চিতে পাঁচজন মানুষ বসালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই, যদি তারা পরস্পর রাজি থাকে। বাংলা ভাষার স্বরবর্ণগুলিও পাথুরে নয়, নিজের স্থিতিস্থাপকতার[২] গুণে তারা প্রতিবেশীর জন্যে একটু-আধটু জায়গার ব্যবস্থা করতে সহজেই রাজি থাকে। এইজন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না। এটা বাঙালির আত্মীয়সভার মতন। সেখানে যতগুলো চৌকি তার চেয়ে মানুষ বেশি থাকা কিছুই অসম্ভব নয়, অথবা পাশে ফাঁক পেলে দুইজনের জায়গা একজনে হাত পা মেলে আরামে দখল করাও এই জনতার অভ্যস্ত।

বাংলার প্রাকৃত ছন্দ ধরে তার প্রমাণ দেওয়া যাক।—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।

এটা তিন মাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ চার পোয়ায় সেরওয়ালা এর ওজন নয়, তিন পোয়ায় এর সের। এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্ছে তিনের।

বৃষ্‌টি। পড়ে-। টাপুর। টুপুর। নদেয়। এল-। বা- ন।
শিবঠা। কুরের। বিয়ে-। হবে-। তিন্‌ক। ন্‌নে-। দা- ন।

দেখা যাচ্ছে, তিন গণনায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে। এত সহজে

---

১ তুলনীয়: 'ও- ই দেখো খোকা···খেয়ে ফেললে বুঝি।"—'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ এবং 'ভা- রি তো পণ্ডিত' ইত্যাদি— ঐ, চতুর্থ পর্যায় তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

২ দ্রষ্টব্য: 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১' শেষ অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা।

যে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই ছড়া আউড়েছে, তবু ছন্দের কোনো গর্তে তাদের কারো কণ্ঠ স্খলিত হয় নি। ফাঁকগুলো যদি ঠেসে ভরাতে কেউ ইচ্ছা করেন— দোহাই দিচ্ছি না করেন যেন— তবে এইরকম দাঁড়াবে।

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা,
শিবঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে।—

মা আমায় ঘুরাবি কত
চোখবাঁধা বলদের মতো।

এটাও তিনমাত্রা লয়ের ছন্দ।

মা- আ | মায় ঘু | রাবি- | কত-।

ফাঁক ভরাট করতে হলে হবে এই চেহারা।

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষুবদ্ধ বৃষের মতোই।[1]

যাঁরা অক্ষর গণনা করে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, স্বরবর্ণে টান দিয়ে মিড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন। সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ, সেসব জায়গায় ধ্বনির রেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়।

হারিয়ে ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে।

এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেক যতিতে ফাঁক আছে।

১ ২ ৩ ৪
হারিয়ে ফেলা- | বাঁশি আমা-র | পালিয়েছিল | বুঝি—।

৫ ৬
লুকোচুরি-র | ছলে-।

কিছু বৈচিত্র্যও দেখছি। প্রথম দুটি বিভাগে সমান্তরাল ফাঁক। কিন্তু তিনের ভাগে ফাঁক বাদ গিয়ে একেবারে চতুর্থ ভাগের শেষে দীর্ঘ ফাঁক পড়েছে।

১ 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর' এবং 'মা আমায় ঘুরাবি কত' ইত্যাদি দুটি দৃষ্টান্তের অনুরূপ বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১'-এর অন্তর্গত তৃতীয় প্রসঙ্গের প্রথমাংশে।

পাঠক 'হারিয়ে ফেলা'র পরেও ফাঁক না দিয়ে একেবারে দ্বিতীয় ভাগের শেষে যদি সেটা পূরণ করে দেন তবে ভালোই শুনতে হবে। কিন্তু যদি বেফাঁক ঠাসবুনানির বিশেষ ফরমাশ থাকে তা হলে সেটাও চেষ্টা করলে মন্দ হবে না।

স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী
মরণযাত্রীদলে,
স্বর্ণবরন কুজ্ঝটিকায় অস্তশিখর লঙ্ঘি'
লুকায় মৌনতলে।

এই কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, হসন্তবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক্ পাঠ করতে বাঙালি পাঠকের একটুও বাধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে তাকে ঠিকমতো চালনা করে।

পাৎলা করিয়া কাটো কাৎলা মাছেরে,
উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছে রে।

এই ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালি নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ড ৎ-এর পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করে পড়বে। আবার যেমনি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধরা—

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে
টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও সর্ষে আর জিরে,
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কা বাঁটা,
যত্ন করে বেছে ফেলো টুক্‌রো যত কাঁটা।[১]

অমনি প্রাক্‌হসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্তও দেরি হবে না।

এই যে বাংলা স্বরবর্ণের সজীবতা, একে কোনো কড়া নিয়মের চাপে আড়ষ্ট করে তাকে সর্বত্র সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য করা উচিত— এ মত চালালে বাংলাভাষাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। শুকনো আমসত্ত্বের মধ্যেই সাম্য, কিন্তু সরস আমের মধ্যে বৈচিত্র্য। ভোজে কোন্‌টার দাম বেশি তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক।

বাংলা-প্রাকৃত ভাষার কাব্যে স্বরধ্বনির যে প্রাণবান্ স্বচ্ছন্দতা আছে, সংস্কৃত বাংলা ভাষা, যাকে আমরা সাধুভাষা বলি, তার মধ্যে পড়ে সে কেন জেনানা মেয়ের মতো দেয়ালে আটকা পড়ে গেল? তার কারণ সংস্কৃত বাংলা

১ দ্রষ্টব্য: 'পত্রধারা' প্রথম পর্যায়ের অষ্টম পত্র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

কৃত্রিম ভাষা, ওখানে বাইরের নিয়মের প্রাধান্ত, তার আপন নিয়ম অনেক জায়গায় কুণ্ঠিত। সভাস্থলে একটি আসনে একটি মানুষের স্থান নির্দিষ্ট, কারো-বা দেহ ক্ষীণ, আসনে ফাঁক থেকে যায়, কারো-বা স্থূল দেহ, আসনে ঠেসে বসতে হয়; কিন্তু গোনাগনতি চৌকি, সীমা নির্দিষ্ট। যদি ফরাশে বসতে হত তা হলে কলেবরের তারতম্য ধরে পরস্পরের আসনের সীমানায় কমিবেশি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটত। কিন্তু সভ্যতার মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে স্বভাবের নিয়মকে বাঁধানিয়মে পাকা করে দিতে হয়। তাতে কিছু পীড়ন ঘটলেও গাম্ভীর্যের পক্ষে তার একটা সার্থকতা আছে। সেইজন্যেই সভার রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্যন্ত বলেছিলেন, 'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্'। কিন্তু যখন তাঁকে রাজান্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলংকৃত করেছিলেন, সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যে নয়, মর্যাদারক্ষার জন্যে। রাজরানীর সৌন্দর্য ব্যক্তিবিশেষে বিচিত্র, কিন্তু তাঁর মর্যাদার আদর্শ সকল রাজরানীর মধ্যে এক। ওটা প্রকৃতির হাতে তৈরি নয়, রাজসমাজের দ্বারা নির্দিষ্ট। অর্থাৎ ওটা প্রাকৃত নয়, সংস্কৃত। তাই দুষ্যন্ত স্বীকার করেছিলেন বটে বনলতার দ্বারা উদ্যানলতা পরাভূত, তবু উদ্যানকে বনের আদর্শে রমণীয় করে তুলতে নিশ্চয় তাঁর সাহস হয় নি। তাই আমি নিজে আকন্দফুল ভালোবাসি, কিন্তু আমার সাধুসমাজের মালী ঐ গাছের অঙ্কুর দেখবামাত্র উপড়ে ফেলে। সে যদি কবি হত, সাধুভাষায় ছাড়া কবিতা লিখত না। সাধুভাষার ছন্দের বাঁধারীতি যে-জাতীয় ছন্দে চলে এবং শোভা পায় সে হচ্ছে পয়ারজাতীয় ছন্দ। এখানে ফাঁক-ফাঁক নির্দিষ্ট আসনের উপর নানা ওজনেরই ধ্বনিকে চড়ানো নিরাপদ। এখানে ঠিক চোদ্দটা অক্ষরকে বাহন করে যুগ্ম-অযুগ্ম নানারকমের ধ্বনিই একত্র সভা জমাতে পারে।

৩

কাব্যলীলা একদিন যখন শুরু করেছিলেম তখন বাংলাসাহিত্যে সাধুভাষারই ছিল একাধিপত্য। অর্থাৎ তখন ছিল কাটা-কাটা পিঁড়িতে ভাগকরা ছন্দ। এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়ারের এলাকায় থাকি ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে না। কিন্তু তিনমাত্রামূলক ছন্দের দিকে আমার কলমের একটা স্বাভাবিক

ঝোঁক ছিল। ঐ ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র-আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিকেই সমানদরের একক বলে ধরে নিতে বারংবার কানে বাজত। সেইজন্যে যুক্ত-অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জন করবার একটা দুর্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল। ঠোকর খাবার ভয়ে পদগুলোকে একেবারে সমতল করে যাচ্ছিলুম। সব জায়গায় পেরে উঠি নি, কিন্তু মোটের উপর চেষ্টা ছিল। 'ছবি ও গান'এ 'রাহুর প্রেম' কবিতা পড়লে দেখা যাবে, যুক্ত-অক্ষর ঝেঁটিয়ে দেবার প্রয়াস আছে, তবু তারা পাথরের টুকরোর মতো রাস্তার মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে রইল। তাই যখন লিখেছিলুম—

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহশৃঙ্খলের ডোর।

মনে খটকা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয় নি। কিন্তু তখন কলম ছিল অপটু এবং অলস, মন ছিল অসতর্ক। কেননা পাঠকদের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তখন ছন্দের সদর রাস্তাও গ্রাম্য রাস্তার মতো এবড়ো-খেবড়ো থাকত, অভ্যাসের গতিকে কেউ সেটাকে নিন্দনীয় বলে মনেও করে নি।

অক্ষরের দাসত্বে বন্দী বলে প্রবোধচন্দ্র বাঙালি কবিদেরকে যে দোষ দিয়েছেন[১] সেটা এই সময়কার পক্ষে কিছু অংশে খাটে। অর্থাৎ অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতরবিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চলত, এখন চলে না। তখন পয়ারের রীতি সকল ছন্দেরই সাধারণ রীতি বলে সাহিত্য-সমাজে চলে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ পয়ারজাতীয় ছন্দই তখন প্রধান, অন্যজাতীয় অর্থাৎ ত্রৈমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার তখন অতি অল্পই। তাই এই মাইনরিটির স্বতন্ত্র দাবি সেদিন বিধিবদ্ধ হয় নি।

তার পরে 'মানসী' লেখার সময় এল। তখন ছন্দের কান আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। এ কথা তখন নিশ্চিত বুঝেছি যে, ছন্দের প্রধান সম্পদ্ যুগ্মধ্বনি; অথচ এটাও জানছি যে, পয়ারসম্প্রদায়ের বাইরে নির্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেশন চলে না।

রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা

১ দ্রষ্টব্য : বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ— 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ'।

এ লাইন-বেচারাকে পয়ারের বাঁধা প্রথাটা শৃঙ্খল হয়েই বেঁধেছে, তিন মাত্রার স্কন্ধকে চার মাত্রার বোঝা বইতে হচ্ছে।[১] সেই 'মানসী' লেখবার বয়সে আমি যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে ছন্দরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।[২] প্রথম প্রথম পয়ারেও সেই নিয়ম প্রয়োগ করেছিলুম।[৩] অনতিকাল পরেই দেখা গেল তার প্রয়োজন নেই।[৪] পয়ারে যুগ্মধ্বনির উপযুক্ত ফাঁক যথেষ্ট আছে। এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ারজাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই 'পয়ার' নাম দিচ্ছি।

পয়ারের ধ্বনিবিন্যাসের এই যে স্বচ্ছন্দতা, দুই মাত্রার লয় তার একমাত্র কারণ নয়। পয়ারের পদগুলিতে তার ধ্বনিভাগের বৈচিত্র্য একটা মস্ত কথা। সাধারণ ভাগ হচ্ছে ৩+৩+২+৩+৩। যথা—

নিখিল আকাশভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশির মাঝে লভিল প্রতিমা।

অন্য রকম। যথা—

তপনের পানে চেয়ে সাগরের ঢেউ
বলে, ওই পুতলিরে এনে দে না কেউ।

অথবা

রাখি যাহা তার বোঝা কাঁধে চেপে রহে,
দিই যাহা তার ভার চরাচর বহে।

অথবা

সারা দিবসের হায় যত কিছু আশা
রজনীর কারাগারে হারাবে কি ভাষা।

১ 'শৃঙ্খলে' শব্দে চার মাত্রা না ধরে তিন মাত্রা ধরা হয়েছে। দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের মাত্রা' দ্বিতীয় পর্যায় এবং 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' ইত্যাদি উদ্‌ধৃতি।

২ বস্তুতঃ ১২৯৩ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত ও পরে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থভুক্ত 'বিরহ' কবিতাটিতেই এই নূতন রীতি প্রথম প্রবর্তিত হয়। অবশ্য এই নূতন রীতির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় 'মানসী' কাব্য রচনাকালেই (১৮৮৭-৯০)।

৩ দ্রষ্টব্য : 'মানসী' কাব্যের (প্রথম সংস্করণ) 'ভূমিকা'— 'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর'।

৪ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগে 'নিম্নে যমুনা বহে' ইত্যাদি সম্বন্ধে কবির মন্তব্য।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারের প্রবর্তন হয়েছে এই কারণেই। সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো বহুগ্রন্থিল, তাকে নষ্ট না করেও যেখানে-সেখানে ছিন্ন করা যায়।[১] এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকাতেই প্রয়োজন হলে সে পদ্য হলেও গদ্যের অবন্ধ গতি অনেকটা অনুকরণ করতে পারে। সে গ্রামের মেয়ের মতো; যদিও থাকে অন্তঃপুরে, তবুও হাটে-ঘাটে তার চলাফেরায় বাধা নেই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে ধ্বনির বোঝা হালকা। যুগ্মবর্ণের ভার চাপানো যাক।

> সুরাঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জপ্রাঙ্গণে
> মন্দারমঞ্জরী তোলে চঞ্চলকঙ্কণে।
> বেণীবন্ধ তরঙ্গিত কোন্ ছন্দ নিয়া,
> স্বর্গবীণা গুঞ্জরিছে তাই সন্ধানিয়া॥

আধুনিক বাংলা ছন্দে সবচেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে পদের শেষে। এতেও নানাপ্রকারের ভাগ চলে। তাই অমিত্রাক্ষরের লাইন-ডিঙোনো চালে এর ধ্বনিশ্রেণীকে নানারকমে কুচকাওয়াজ করানো যায়।

> হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা | স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন
> সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে | বাক্যহীন স্তব্ধতায় লীন,
> সেই নির্ঝরিণী-ধারা | রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
> দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে | অন্তহীন আনন্দের গীতা॥

বাংলায় এই আর-একটি গুরুভারবহ ছন্দ। এরা সবাই মহাকাব্য বা আখ্যান বা চিন্তাগর্ভ বড়ো বড়ো কথার বাহন। ছোটো পয়ার আর এই বড়ো পয়ার, বাংলা কাব্যে এরা যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা আর ঐরাবত। অন্তত এই বড়ো পয়ারকে গীতিকাব্যের কাজে খাটাতে গেলে বেমানান হয়। এর নিজের গড়নের মধ্যেই একটা সমারোহ আছে, সেইজন্যে এর প্রয়োজন সমারোহসূচক ব্যাপারে।

১ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগে 'ওহে পান্থ, চলো পথে' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত এবং মেঘনাদবধ কাব্যের অবতারণা-অংশের বিশ্লেষণ।

ছোটো পয়ারকে চেঁচে ছুলে হালকা কাজে লাগানো যায়, যেমন বাঁশের কঞ্চিকে ছিপ করা চলে। পয়ারের দেহসংস্থানেই গুরুর সঙ্গে লঘুর যোগ আছে। তার প্রথম অংশে আট, দ্বিতীয় অংশে ছয়; অর্থাৎ হালের দিকে সে চওড়া কিন্তু দাঁড়ের দিকে সরু; তাকে নিয়ে মাল-বওয়ানোও যায়, বাচ-খেলানোও চলে। বড়ো পয়ারের দেহসংস্থান এর উলটো; তার প্রথম ভাগে আট, শেষ ভাগে দশ; তার গৌরবটা ক্রমেই প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। ছোটো পয়ারের ছিবলেমির একটা পরিচয় দেওয়া যাক।

খুব তার বোলচাল, সাজ ফিটফাট,
তকরার হলে আর নাই মিটমাট।
চশমায় চমকায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক॥

এর ভাগগুলোকে কাটা-কাটা ছোটো-ছোটো করে হ্রস্বস্বরে হসন্তবর্ণে ঘনঘন ঝোঁক দিয়ে এর চটুলতা বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। এখানে এটা পাতলা কিরিচের মতো। একেই আবার যুগ্মধ্বনির যোগে মজবুত করে খাড়া করে তোলা যায়।

বাক্য তার অনর্গল মল্লসজ্জাশালী,
তর্কযুদ্ধে উগ্র তেজ, শেষ যুক্তি গালি।
ভ্রূকুটিপ্রচ্ছন্ন চক্ষু কটাক্ষিয়া চায়,
কুত্রাপিও মহত্ত্বের চিহ্ন নাহি পায়॥

যেখানে-সেখানে নানাপ্রকার অসমান ভার নিয়েও পয়ারের পদস্খলন হয় না, এই তত্ত্বটির মধ্যে অসামান্যতা আছে। অন্য কোনো ভাষার কোনো ছন্দে এরকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে বলে আমি তো জানি নে।

এর কৌশলটা কোন্‌খানে যখন ভেবে দেখা যায়, তখন দেখি পয়ারে প্রত্যেক পদের মাঝখানে ও শেষে যে দুটো হাঁফ ছাড়বার যতি আছে সেইখানেই তার ভারসামঞ্জস্য হয়ে থাকে।

নিঃস্বতা-সংকোচে দিন | অবসন্ন হলে
নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা | নেয় তারে কোলে।

গণনা করে দেখলে ধরা পড়ে এই পয়ারের দুই লাইনে ধ্বনিভারের সাম্য নেই। তবু যে টলমল করতে করতে ছন্দটা কাত হয়ে পড়ে না, তার কারণ লাইনে-

বাঁয়ে যতির লগির ঠেকা দিয়ে দিয়ে তাকে চালিয়ে নেওয়া হয়। চতুষ্পদ জন্তু যেমন তার ভারী দেহটাকে দুইজোড়া পায়ের দ্বারা দুই দিকে ঠেকাতে ঠেকাতে চলে সেই রকম।

পয়ারের প্রকৃত রূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অংশের ছয় অক্ষরের পরবর্তী দুই যতিতে। অজগর সমস্ত দেহটা নিয়ে চলে। তার দেহে মুণ্ড এবং ধড়ের মধ্যে ভাগ নেই। ঘোড়ার দেহে সেই ভাগ আছে। তার মুণ্ডটার পরে যেখানে গলা সেখানে একটা যতি, ধড়ের শেষভাগে যেখানে ক্ষীণ কটি সেখানেও আর-একটা। এ বিভক্তভারের দেহকে সামলিয়ে নিয়ে সে চার পা ফেলে চলে। পয়ারেরও সেইরকম বিশেষ-ভাবে বিভক্ত দেহ এবং চার পা ফেলতে ফেলতে চলা। চতুষ্পদ জন্তুর দুই পায়ের সমান বিন্যাস। যদি এমন হত যে, কোনো জানোয়ারের পা-দুটো বাঁয়ের চেয়ে ডাইনে এক ফুট বেশি লম্বা তা হলে তার চলনে স্থিতির চেয়ে অস্থিতিই বেশি হত; সুতরাং তার পিঠে সওয়ার চাপালে কোনো পক্ষেই আরাম থাকত না। ছন্দে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

তরণী বেয়ে শেষে | এসেছি ভাঙা ঘাটে,
স্থলে না মেলে ঠাঁই | জলে না দিন কাটে।

এ ছড়ায় প্রত্যেক লাইনে চোদ্দ অক্ষর এবং মাঝে আর শেষে দুই যতিও আছে। তবুও ওকে পয়ার বলবার জো নেই। ওর পা-ফেলার ভাগ অসমান।

তরণী। বেয়ে শেষে॥ এসেছি। ভাঙা ঘাটে॥

এক পায়ে তিন মাত্রা আর এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পরে একটা করে যতি আছে, কিন্তু বিজোড় অঙ্কের অসাম্য ঐ যতিতে পুরো বিরাম পায় না। সেইজন্যে সমস্ত পদটার মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে, যে পর্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে। এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দের স্বভাব, অর্থাৎ পয়ারের ঠিক বিপরীত। এই অস্থিরতার সৌন্দর্যকে ব্যবহার করবার জন্যেই এইরকম ছন্দের রচনা। এর পিঠের উপর যেমন-তেমন করে যুগ্মধ্বনির সওয়ার চাপালে অস্বস্তি ঘটে। যদি লেখা যায়

সায়াহ্ন-অন্ধকারে এসেছি ভগ্ন ঘাটে

তা হলে ছন্দটার কোমর ভেঙে যাবে। তবুও যদি যুগ্মবর্ণ দেওয়াই মত হয়

তা হলে তার জন্যে বিশেষভাবে জায়গা করে দিতে হবে। পয়ারের মতো উদারভাবে যেমন খুশি ভার চাপিয়ে দিলেই হল না।

অন্ধরাতে যবে | বন্ধ হল দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে ওঠে | উচ্চ হাহাকার।

মনে রাখা দরকার এই শ্লোক অবিকৃত রেখেও এর ভাগের যদি পরিবর্তন করে পড়া যায়, দুই ভাগের বদলে প্রত্যেক লাইনে যদি তিন ভাগ বসানো যায়, তা হলে এটা আর-এক ছন্দ হয়ে যাবে। একে নিম্নলিখিত রকম ভাগ করে পড়া যাক।

অন্ধরাতে | যবে বন্ধ | হল দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে | ওঠে উচ্চ | হাহাকার।

পশুপক্ষীদের চলন সমান মাত্রার দুই বা চার পায়ের উপর। এই পা-কে কেবল যে চলতে হয় তা নয়, দেহভার বইতে হয়। পদক্ষেপের সঙ্গেসঙ্গেই বিরাম আছে বলে বোঝা সামলিয়ে চলা সম্ভব। আজ পর্যন্ত জীবলোকে জুড়িওয়ালা পায়ের পরিবর্তে চাকার উদ্ভব কোথাও হল না। কেননা চাকা না থেমে গড়িয়ে চলে, চলার সঙ্গে থামার সামঞ্জস্য তার মধ্যে নেই। দুইমূলক সমমাত্রায় দুই পায়ের চাল, তিনমূলক অসমমাত্রায় চাকার চাল। দুইপা-ওয়ালা জীব উঁচুনিচু পথের বাধা ডিঙিয়ে চলে যায়। পয়ারের সেই শক্তি। চাকা বাধায় ঠেকলে ধাক্কা খায়, ত্রৈমাত্রিক ছন্দের সেই দশা। তার পথে যুগ্মস্বর[১] যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেই চেষ্টা করতে হবে।

অধীর বাতাস এল সকালে,
বনেরে বৃথাই শুধু বকালে।
দিনশেষে দেখি চেয়ে
ঝরা ফুলে মাটি ছেয়ে
লতারে কাঙাল করে ঠকালে॥[২]

এ ছন্দ পয়ারজাতীয়, টেনিস-খেলোয়াড়ের আধা-পায়জামার মতো বহরটা নীচের দিকে ছাঁটা। এ ছন্দে তাই যুগ্মস্বর যেমন খুশি চলে।—

১ 'যুগ্মধ্বনি', 'যুগ্মস্বর' ও 'যুগ্মবর্ণ' এই তিনটি শব্দই যুক্তাক্ষর অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে

২ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দধাঁধা' দ্বিতীয় পর্যায়, ৮-সংখ্যক রচনা।

নবারুণ-চন্দনের তিলকে
দিক্‌ললাট এঁকে আজি দিল কে।
বরণের পাত্র হাতে
উষা এল সুপ্রভাতে,
জয়শঙ্খ বেজে ওঠে ত্রিলোকে॥

কিন্তু

শরতে শিশির বাতাস লেগে
জল ভরে আসে উদাসী মেঘে।
বরষন তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন॥[১]

এখানে তিন মাত্রার ছন্দ গড়িয়ে চলেছে। চাকার চাল, পা-ফেলার চাল নয়; তাই যুগ্মবর্ণের স্বেচ্ছাচারিতা এর সইবে না।

চাষের সময়ে যদিও করি নি হেলা,
ভুলিয়া ছিলাম ফসল-কাটার বেলা।[২]

পয়ারের মতোই চোদ্দটা অক্ষরে পদ, কিন্তু জাত আলাদা। তিন মাত্রার চাকায়[৩] চলেছে। পদাতিকের সঙ্গে চক্রীর মেলে না।

শ্যামল ঘন | বকুলবন | ছায়ে ছায়ে
যেন কী সুর | বাজে মধুর | পায়ে পায়ে।

এখানেও চোদ্দ অক্ষর। কিন্তু এর চালে পয়ারের মতো সমমাত্রার পদচারণের শান্তি নেই বলে বিষমমাত্রার ভাগগুলি যতির মধ্যেও গতির ঝোঁক রেখে দেয়। খোঁড়া মানুষের চলার মতো; যতক্ষণ না লক্ষ্যস্থানে গিয়ে বসে পড়ে, থেমেও ভালো করে থামতে পারে না।

১ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দধাঁধা' দ্বিতীয় পর্যায়, ৯-সংখ্যক রচনা।

২ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দধাঁধা' দ্বিতীয় পর্যায়, ৬-সংখ্যক রচনা।

৩ দ্রষ্টব্য: 'সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ'—'একদিন দেব তরুণ তপন' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের আলোচনা ও পাদটীকা এবং 'বাংলা ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

৪

বাংলা চলতি ভাষায় মূল সংস্কৃত শব্দের অনেকগুলি স্বরবর্ণই কোনোটা আধখানা কোনোটা পুরোপুরি ক্ষয়ে যাওয়াতে ব্যঞ্জনগুলো তাল পাকিয়ে অত্যন্ত পরস্পরের গায়ে-পড়া হয়ে গেছে। স্বরের ধ্বনিই ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে অবকাশ দেয়, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে; সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিণ্ডীভূত হয়ে পড়ে। চলিত এবং চল্‌তি, ঘৃণা এবং ঘেন্না, বসতি এবং বস্‌তি শব্দগুলো তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির দাক্ষিণ্য, আর প্রাকৃত বাংলায় তার কার্পণ্য, এইটেই হল দুটো ভাষার ধ্বনিগত মূল পার্থক্য।[১] স্বরবর্ণবহুল ধ্বনিসংগীত এবং স্বরবর্ণবিরল ধ্বনিসংগীতে প্রভূত প্রভেদ। এই দুইয়েরই বিশেষ মূল্য আছে। বাঙালি কবি তাঁদের কাব্যে যথাস্থানে দুটোরই সুযোগ নিতে চান। তাঁরা ধ্বনিরসিক বলেই কোনোটাকেই বাদ দিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রাকৃত বাংলার ধ্বনির বিশেষত্ববশত দেখতে পাই তার ছন্দ তিন মাত্রার দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। অর্থাৎ তার তালটা স্বভাবতই একতালাজাতীয়, কাওয়ালিজাতীয় নয়। সংস্কৃত ভাষায় এই 'তাল' শব্দটা দুই সিলেব্‌ল্‌-এর; বাংলায় ল আপন অন্তিম অকার খসিয়ে ফেলেছে, তার জায়গায় টি বা টা যোগ করে শব্দটাকে পুষ্ট করবার দিকে তার ঝোঁক। টি টা-এর ব্যবধান যদি না থাকে তবে ঐ নিঃস্বর ধ্বনিটি প্রতিবেশী যে-কোনো ব্যঞ্জন বা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণতা পেতে চায়।

রূপসাগরের তলে ডুব দিনু আমি

এটা সংস্কৃত বাংলার ছাঁদে লেখা। এখানে শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেষা নয়। বাংলা-প্রাকৃতের অনিবার্য নিয়মে এই পদের যে শব্দগুলি হসন্ত, তারা আপনারই স্বরধ্বনিকে প্রসারিত করে ফাঁক ভরতি করে নিয়েছে। 'রূপ' এবং 'ডুব' আপন উকারধ্বনিকে টেনে বাড়িয়ে দিলে। 'সাগরের' শব্দ আপন একারকে পরবর্তী হসন্ত র-এর পঙ্গুতা চাপা দিতে লাগিয়েছে। এই উপায়ে ঐ পদটার প্রত্যেক শব্দ নিজের মধ্যেই নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে চলেছে।[২] অর্থাৎ এ ছন্দে ডিমক্রেসির

১ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

২ দ্রষ্টব্য: 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১' তৃতীয় প্রসঙ্গ শেষ অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা।

প্রভাব নেই। এই রকমের ছন্দে দুই মাত্রার ধ্বনি আপন পদক্ষেপের প্রত্যেক পর্যায়ে যে অবকাশ পায় তা নিয়ে তার গৌরব। বস্তুত এই অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করে তার ধ্বনিসমারোহ বাড়িয়ে তুললে এ ছন্দের সার্থকতা। যথা—

চৈতন্য নিমগ্ন হল রূপসিন্ধুতলে।

প্রাকৃত বাংলা দেখা যাক।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি

এখানে 'রূপ' আপন হসন্ত প-এর ঝোঁকে 'সাগরে'র সা-টাকে টেনে আপন করে নিয়েছে, মাঝে ব্যবধান থাকতে দেয় নি। 'রূপসা' তাই আপনিই তিনমাত্রা হয়ে গেল। 'সাগরে'র বাকি টুকরো রইল 'গরে'। সে আপন ওজন বাঁচাবার জন্যে রে-টাকে দিল লম্বা করে, তিন মাত্রা পুরল। 'ডুব' আপনার হসন্তর টানে 'দিয়েছি'র দি-টাকে করলে আত্মসাৎ। এমনি করে আগাগোড়া তিন মাত্রা জমে উঠল। হসন্তপ্রধান ভাষা সহজেই তিন মাত্রার দানা পাকায়, এটা দেখেছি। এমন-কি, যেখানে হসন্তের ভিড় নেই সেখানেও তার ঐ একই চাল। এটা যেন তার অভ্যস্ত হয়ে মজ্জাগত হয়ে গেছে।[১] যেমন—

অচে- । তনে- । ছিলেম। ভালো-।
আমায়। চেতন। করলি। কেনে-।

প্রাকৃত বাংলার এই তিনমাত্রার ভঙ্গি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা সাধুভাষাতেও গ্রহণ করেছেন। যেমন—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥

কিন্তু প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে একটু ভাববার বিষয় আছে।—

মত্তরোষে বীরভদ্র ছুট্‌ল ঊর্ধ্বশ্বাসে,
ঘূর্ণিবেগে উড়্‌ল ধুলো রক্ত সন্ধ্যাকাশে।

১ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগ—আমার সকল কাঁটা; 'প্রস্বর, পর্ব ও মাত্রা'—বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর; 'ছন্দবিচার'—আমি যদি জন্ম নিতেম ইত্যাদি দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণ ও পাদটীকা।

কিংবা

ছুট্‌ল কেন মহেন্দ্রের আনন্দের ঘোর,
টুট্‌ল কেন উর্বশীর মঞ্জীরের ডোর।
বৈকালে বৈশাখী এল আকাশলুণ্ঠনে,
শুক্লরাতি ঢাক্‌ল মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে॥

এদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে? প্রধানত ক্রিয়াপদেরই বিশেষ রূপটাতে প্রাকৃত বাংলার চেহারা ধরা পড়ে। উপরের ছড়াগুলিতে 'উড়্‌ল' 'ছুট্‌ল' টুট্‌ল' 'ঢাক্‌ল' প্রভৃতি প্রয়োগ নিয়ে তর্কটা ছন্দের তর্ক নয়, ভাষারীতির। এইরকম ক্রিয়াপদ যদি ব্যবহার করি তবে ধরে নিতে হবে ঐ ছড়াগুলি প্রাকৃত বাংলাতেই লেখা হচ্ছে। আমি যে প্রবন্ধ লিখছি এও প্রাকৃত বাংলার ঠাটে। যদি আমাকে কারো সঙ্গে মুখে মুখে আলোচনা করতে হত তা হলে এই লেখার সঙ্গে আমার মুখের কথার কোনো তফাত থাকত না। মাঝে মাঝে অভ্যাসদোষে হয়তো ইংরেজি শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত, কিন্তু কখনোই 'করিয়াছিল' 'গিয়াছে' ধরনের ক্রিয়াপদ ভুলেও ব্যবহার করতে পারতুম না। আবার প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ সংস্কৃত বাংলায় ব্যবহার করাও চলে না। প্রবোধচন্দ্র 'বিচিত্রা'য় লিখেছেন যে, বাঙালি কবিরা সাহস করে কবিতায় 'করিব' 'চলিব' প্রভৃতি প্রয়োগ না করে কেন 'করব' 'চলব' প্রয়োগ করেন না।[১] যদি প্রশ্নটার অর্থ এই হয় যে, অযথাস্থানে কেন করি নে তবে তার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। যদি বলেন যথাস্থানেও কেন করি নে তবে তার উত্তরে বলব, যথাস্থানে করে থাকি।

৫

যে তর্ক নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেম সেটাতে ফিরে আসা যাক। বাংলায় হসন্তমধ্য শব্দগুলোয় কয় মাত্রা গণনা করা হবে তাই নিয়ে সংশয় উঠেছে।

[সংস্কৃত ভাষায় শব্দের মাঝখানে হসন্তবর্ণ যুক্তবর্ণের রূপ ধরে সাধুভাষায় অনায়াসেই আপন স্থান পেয়েছে। একমাত্র খণ্ড ৎ অক্ষরমহলে আপন অনুবর্তী জুড়ির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। প্রাকৃত বাংলায় শব্দমধ্যবর্তী

১ বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ—'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ', পৃ ৫৭৪-৭৫

হসন্তবর্ণ আপন বিচ্ছিন্ন অক্ষররূপ রক্ষা করে রয়ে গেছে। তার অধিকাংশই ক্রিয়াপদ।]

যেগুলি ক্রিয়াপদ নয় সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এ প্রবন্ধের গোড়াতেই আলোচনা করেছি। বলেছি নিয়মের বিকল্প চলে; কেননা বাঙালির কান সাধারণ ব্যবহারে সেই বিকল্প মঞ্জুর করেছে। এ ক্ষেত্রে হিসাবে একটা মাত্রার কমিবেশি নিয়ে তর্ক ওঠে না।

চিমনি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাকরুন।

অন্তত 'চিমনি'কে দুই মাত্রা করায় কবির দোষ হয় নি। আবার

চিমনি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে ঠাকরুন মোর নাই কোনো দোষ।

এরকম বিপর্যয়ও চলে। একই ছড়ায় 'চিমনি'কে এক মাত্রা গ্রেসমার্কা দেওয়া হয়েছে, অথচ 'ঠাকরুন'কে খর্ব করে তিন মাত্রায় নামানো গেল। অপরাধ ঘটেছে বলে মনে করি নি।

কুস্তির আখড়ায় ভিস্তিকে ধরে
জল ছিটাইয়া দাও, ধুলা যাক মরে।

অপর পক্ষে

রাস্তা দিয়ে কুস্তিগির চলে ঘেঁষাঘেঁষি,
একটা নয় দুটো নয় একশোর বেশি।

প্রয়োজনমত এটাও চলে, ওটাও চলে। নিকতির মাপে বিচার করতে গেলে বিশুদ্ধ ওজনের পয়ার হচ্ছে

পালোয়ানে পালোয়ানে চলে ঘেঁষাঘেঁষি।

তাতে প্রত্যেক অক্ষর নিখুঁত এক মাত্রা, সবসুদ্ধ চোদ্দটা। 'রাস্তা' 'কুস্তি' প্রভৃতি শব্দে ওজন বেড়ে যায়, তবুও বহুসহিষ্ণু পয়ারকে কাবু করতে পারে না।

প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ক্রিয়াপদেই তার আপন চেহারা। ঐটুকু ছাড়া তার আর কোনো উপসর্গ নেই বললেই চলে। বাংলা-সংস্কৃত ভাষার মতো সে শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। ভোজে বসে গেছে ব্রাহ্মণ, তাকে পরিবেশনকর্তা জিজ্ঞাসা করলে, নিরামিষ না আমিষ? সে বললে, দ্বৌ কর্তব্যৌ। তেমনি শব্দ বাছাই নিয়ে যদি প্রাকৃত বাংলাকে প্রশ্ন করা যায়, 'কী চাই,

প্রাকৃত শব্দ না সংস্কৃত শব্দ', সে বলবে, 'ধ্বৌ কর্তব্যো'। তার জাতবিচার নেই বললেই হয়। পছন্দ হবামাত্র ইংরেজি পারসি সব শব্দই সে আত্মসাৎ করে। আবার অমরকোষবিহারী বড়ো বড়ো বহরওয়ালা সংস্কৃত শব্দকে ওদেরই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। সংস্কৃত ভাষার প্রতি সম্ভ্রমবশত তার মুখে বাধবে না—

রূপযৌবন উপঢৌকন
দেবেন কন্যা তাহারে,
তাই পরেছেন চীনাংশুকের
পট্টবসন বাহারে।

নন-কো-অপরেশনের দিনেও ইংরেজি শব্দ চালিয়ে দিতে পিকেটিঙের ভয় নেই। যথা—

আইডিয়াল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি,
প্র্যাকটিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হল বুঝি, এইবার মোলো,
অকসিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা করে তোলো।

কিন্তু সংস্কৃত বাংলায় বাছবিচার খুব কড়া। আধুনিকদের হাতে পড়ে ম্লেচ্ছপনা কিছুকিছু সয়ে গেছে। কিন্তু সেটুকু বড়োজোর বাইরের রোয়াকে, ভিতরমহলে রীতরক্ষা সম্বন্ধে কষাকষি।

কর্ণে দিলা ঝুমকাফুল, নাসিকায় নথ,
অঙ্গসজ্জা-সমাধানে ভূরি মেহন্নত।

এটাকে প্রহসন বলে পাঠক হয়তো মাপ করতে পারেন; কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় এইরকম ভিন্নপর্যায়ের শব্দগুলো যখন কাছাকাছি বসানো যায়, তাদের আওয়াজের মধ্যে অত্যন্ত বেশি বেমিল হয় না। আমার এই গদ্যপ্রবন্ধ পড়ে দেখলে পাঠকেরা সেটা লক্ষ্য করতে পারবেন। কিন্তু এটাও দেখে থাকবেন এটার মধ্যে 'করিব' 'করিয়াছে' 'করিয়াছিল' প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ কলমের কোনো ভুলে ঢুকে পড়বার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেইজন্যে আমরা বাংলায় সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দুই ভিন্ন নিয়মেই চলি, তার অন্যথা করা অসম্ভব। তাই বাংলা কাব্যে এই দুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি যদি দুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে তবে সেই আপত্তিতে শুদ্ধির গোময়লেপনে সমস্ত একাকার করবার পক্ষপাতী আমি

নই। আমি বলি, দ্বৌ কর্তব্যৌ। কারণ ছন্দের এই দ্বিবিধ রসেই আমার রসনার লোভ।

পরিচয়, মাঘ ১৩৩৮ : 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত'

তৃতীয় পর্যায়

তব চিত্তগগনের দূর দিক্‌সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে পেয়েছে মহিমা।

এখানে 'দিক্' শব্দের ক্ হসন্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে এক মাত্রার পদবি দেওয়া গেল। নিশ্চিত জানি পাঠক সেই পদবির সম্মান স্বতই রক্ষা করে চলবেন।

মনের আকাশে তার দিক্‌সীমানা বেয়ে
বিবাগী স্বপনপাখি চলিয়াছে ধেয়ে।

অথবা

দিগ্‌বলয়ে নবশশিলেখা
টুক্‌রো যেন মানিকের রেখা।

এতেও কানের সম্মতি আছে।

দিক্‌প্রান্তে ওই চাঁদ বুঝি
দিক্-ভ্রান্ত মরে পথ খুঁজি।

আপত্তির বিশেষ কারণ নেই।

দিক্‌প্রান্তের ধূমকেতু উন্মত্তের প্রলাপের মতো
নক্ষত্রের আঙিনায় টলিয়া পড়িল অসংগত।

এও চলে। একের নজিরে অন্যের প্রামাণ্য ঘোচে না।

কিন্তু যাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা একটা কথা বোধ হয় সম্পূর্ণ মনে রাখছেন না যে, সব দৃষ্টান্তগুলিই পয়ারজাতীয় ছন্দের। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এই ছন্দ যুক্তধ্বনি ও অযুক্তধ্বনি উভয়কেই বিনা পক্ষপাতে একমাত্রারূপে ব্যবহার করবার সনাতন অধিকার পেয়েছে। আবার যুক্তধ্বনিকে দুই ভাগে বিশ্লিষ্ট করে তাকে দুই মাত্রায় ব্যবহার করার স্বাধীনতা সে যে দাবি করতে পারে না তাও নয়।

২

যাকে আমি অসম বা বিষম -মাত্রার ছন্দ বলি যুক্তধ্বনির বাছবিচার তাদেরই এলাকায়।[১]

হৃৎ-ঘটে সুধারস ভরি

কিংবা

হৃৎ-ঘটে অমৃতরস ভরি
তৃষা মোর হরিলে, সুন্দরী।

এ ছন্দে দুইই চলবে। কিন্তু

অমৃতনির্ঝরে হৃৎপাত্রটি ভরি
কারে সমর্পণ করিলে, সুন্দরী।

অগ্রাহ্য, অন্তত আধুনিক কালের কানে। অসমমাত্রার ছন্দে এরকম যুক্তধ্বনির বন্ধুরতা আবার একদিন ফিরে আসতেও পারে, কিন্তু আজ এটার চল নেই।

৩

এই উপলক্ষে একটা কথা বলে রাখি, সেটা আইনের কথা নয়, কানের অভিরুচির কথা।

হৃৎপটে আঁকা ছবিখানি

ব্যবহার করা আমার পক্ষে সহজ, কিন্তু

হৃৎপত্রে আঁকা ছবিখানি

অল্প একটু বাধে। তার কারণ খণ্ড ৎ-কে পূর্ণ ত-এর জাতে তুলতে হলে তার পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করতে হয়। এই চুরিটুকুতে পীড়াবোধ হয় না যদি পরবর্তী স্বরটা হ্রস্ব থাকে। কিন্তু পরবর্তী স্বরটাও যদি দীর্ঘ হয় তা হলে শব্দটার পায়াভারী হয়ে পড়ে।

হৃৎপত্রে এঁকেছি ছবিখানি

আমি সহজে মঞ্জুর করি, কারণ এখানে 'হৃৎ' শব্দের স্বরটি ছোটো ও 'পত্র'

১ দ্রষ্টব্য: 'বিহারীলালের ছন্দ', 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ' এবং 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ ও দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ।

শব্দের স্বরটি বড়ো। রসনা 'হৃৎ' শব্দ দ্রুত পেরিয়ে 'পত্র' শব্দে পুরো ঝোঁক দিতে পারে। এই কারণেই 'দিক্‌সীমা' শব্দকে চার মাত্রার আসন দিতে কুণ্ঠিত হই নে, কিন্তু 'দিক্‌প্রান্ত' শব্দের বেলা ঈষৎ-একটু দ্বিধা হয়।[১] শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়'। 'দিক্‌সীমা' কথাটি দরিদ্র, 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটি পরিপুষ্ট।

এ অসীম গগনের তীরে
মৃৎকণা জানি ধরণীরে।

'মৃৎকণা' না বলে যদি 'মৃৎপিণ্ড' বলা যায় তবে তাকে চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একটু যেন ঠেলতে হয় তবেই চলে।

মৃৎ-ভবনে এ কী সুধা
রাখিয়াছ, হে বসুধা।

কানে বাধে না। কিন্তু

মৃৎ-ভাণ্ডেতে এ কী সুধা
ভরিয়াছ, হে বসুধা।

কিছু পীড়া দেয় না যে তা বলতে পারি নে। কিন্তু অক্ষর গনতি করে যদি বল ওটা ইন্‌ভীডিয়স্ ডিস্‌টিঙ্ক্‌শন, তা হলে চুপ করে যাব। কারণ কান বেচারা প্রিমিটিভ্ ইন্দ্রিয়, তর্কবিদ্যায় অপটু।

পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৯ : 'নবছন্দ' (প্রথমাংশ)

চতুর্থ পর্যায়

স্বরবর্ণের কোঠায় আমরা ঋ-কে ঋণস্বরূপে নিয়েছি বর্ণমালায়, কিন্তু উচ্চারণ করি ব্যঞ্জনবর্ণের রি। সেইজন্যে অনেক বাঙালি 'মাতৃভূমি'কে বলেন

১ দ্রষ্টব্য : প্রথম বিভাগে 'দিক্‌প্রান্তে ওই চাঁদ বুঝি' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে কবির মন্তব্য

'মাত্রিভূমি'। যে কবি তাঁর ছন্দে ঋ-কারকে স্বরবর্ণরূপে ব্যবহার করেন তাঁর ছন্দে ঐ বর্ণে অনেকের রসনা ঠোকর খায়।[১]

সাধারণত বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে বা সম্পূর্ণ পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে থাকে। হসন্তবর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে।[২] যেমন 'জল'। এখানে জ-এ যে অকার আছে তার দীর্ঘতা প্রমাণ হয় 'জলা' শব্দের জ-এর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে। 'হাত' আর 'হাতা'য় প্রথমটির 'হা' দীর্ঘ, দ্বিতীয়টির হ্রস্ব। 'পিঠ' আর 'পিঠে', 'ভূত' আর 'ভূতো','ঘোল' আর 'ঘোলা' তুলনা করে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হবে। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্রই, বাংলায় স্থানবিশেষে।

কথায় ঝোঁক দেবার সময় বাংলা স্বরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই দীর্ঘ হয়। যেমন—ভা- রি তো পণ্ডিত, কে- বা কার খোঁজ রাখে, আ- জই যাব, হল- ই বা, অবা- ক্ করলে, হাজা- রো লোক, কী- যে বকো, একধা- র থেকে লাগা- ও মার।[৩]

যুক্তবর্ণের পূর্বে সংস্কৃতে স্বর দীর্ঘ হয়, বাংলায় তা হয় না।[৪]

বাংলাভাষা-পরিচয়, কার্তিক ১৩৪৫ : অধ্যায় ১২ (অংশ)

১ বস্তুতঃ ঋ-কার বাংলা ছন্দে বিকল্পে স্বরবর্ণ বলে গণ্য হয়ে থাকে। যেমন—

বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা
গোপনমিলন-'অমৃত' গন্ধ ঢালা।

—'গীতবিতান', আমার দিন ফুরালো

এখানে 'অমৃত' শব্দের উচ্চারণ অ. মৃ. ত, অর্থাৎ ঋ স্বরবর্ণ রূপে স্বীকৃত। কিন্তু—

'মাতৃ'ভূমির লাগি পাড়া ঘুরে মরেছে,
একশো টিকিট বিলি নিজহাতে করেছে।

—'খাপছাড়া' ৩৫

এখানে 'মাতৃ' শব্দের উচ্চারণ 'মাত্রি', অর্থাৎ ঋ স্বরবর্ণ বলে গণ্য নয়।

২ অনুরূপ মন্তব্য দ্রষ্টব্য 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগের শেষ অনুচ্ছেদে এবং 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদে।

৩ তুলনীয় : ও- ই দেখ…বুঝি ('ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ), আমরা দ্রুত লয়ে…'এ- ই রে' (ঐ, দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ)।

৪ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর' ও পাদটীকা ২। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী ধ্বনি দীর্ঘ বলেই গণ্য হয়। দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ ও পাদটীকা।

ছন্দবিচার

প্রথম পর্যায় (আলোচনা[1])

সব ছন্দের unitগুলো আকারে সমান নয়।...কিন্তু এক সময়ে বাংলায় সব unitকেই সমান মূল্য দেওয়া হত; যুগ্ম-অযুগ্ম ধ্বনির পার্থক্য স্বীকার করা হত না। কিন্তু তিন unitএর ছন্দে, যাকে আমি বলেছি অসম ছন্দ, তাতে যুগ্ম-ধ্বনিকে এক unit ধরলে ভারি খারাপ শোনায়। এইটে অনুভব করেই তখনকার দিনে কবিরা এজাতীয় যুক্ত-অক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করে চলতেন। যুক্ত-অক্ষর সম্পূর্ণ বর্জন করে একটি কবিতা রচনা করতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন; মনে করতেন কবিতাটি খুব প্রাঞ্জল, সরল ও শ্রুতিমধুর হল। কবি বিহারীলালের কাছে আমার প্রথম শিক্ষা। তাঁর রচনাতেও যুক্তাক্ষর বড়ো কম। আমারও বাল্যকালের রচনায় যুক্তাক্ষর খুব কম।[2] তবু মাঝে মাঝে যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়ে ছন্দকে বন্ধুর করে তুলেছে। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতেই তার নিদর্শন পাবে।[3] তখনো আমি যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা বলে ধরতে আরম্ভ করি নি। কারণ খারাপ শোনালেও তখনকার দিনে জবাবদিহি ছিল না। কিন্তু 'মানসী'র সময় থেকে আমি যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা বলে ধরতে শুরু করেছি।...

'মানসী'র সময় থেকে আমি অসমমাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রার value দিয়ে আসছি এবং বাংলা সাহিত্যে এই রীতিটাই চলে গেছে। আজকাল আর কোনো কবি অসমমাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে চালাতে সাহস করেন না, আর করলেও তাঁকে কেউ ক্ষমা করবে না।[4] কিন্তু আমি নিজেও একটিমাত্র রচনায় এরকম করেছি। যথা—

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি।

---

১ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -কর্তৃক অনুলিখিত এবং কবি-কর্তৃক সংশোধিত।

২ দ্রষ্টব্য : 'বিহারীলালের ছন্দ', 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ' এবং 'সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ'।

৩ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ।

৪ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ তৃতীয় অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা।

…ওরকম না করলেই ভালো হত। বাস্তবিক, ও কবিতাটির জন্যে আমি একটু কুণ্ঠিত আছি। ওরকম করার একটু কারণও আছে। যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা হিসেব করে ছন্দ রচনা করলে ও ছন্দে 'অনাথপিণ্ডদ' কথাটা ব্যবহার করা মুশকিল। তাই সমস্ত কবিতাটিতেই যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে চালিয়ে দিয়েছিলুম।[১] কিন্তু অসমমাত্রার আর-কোনো ছন্দেই আমি যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে গণ্য করি নি।[২]…

সমমাত্রার ছন্দের অর্থাৎ পয়ারজাতীয় ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, এ ছন্দে দুই চার ছয় আট দশ প্রভৃতি দুয়ের multipleএর পর ইচ্ছামত যতি স্থাপন করা যায়। এখানেই এ ছন্দের শক্তি। আর এজন্যেই এজাতীয় ছন্দে আঁজাঁব্‌মাঁ (*enjambement*) চালানো সম্ভব হয়েছে।…যেখানেই দুয়ের multiple পাওয়া যায় সেখানেই থামতে পারা যায় বলেই প্রবহমান পয়ার রচনা করা সম্ভব হয়েছে।[৩] এ ছন্দে অযুগ্মসংখ্যার পর যতি দেওয়া চলে না। মধুসূদন অবশ্য 'অকালে'র পর যতি দিয়েছেন।[৪] এটাকে অবশ্য একরকম করে সমর্থনও করা যায়। কিন্তু তথাপি বলতে হয় যে, এ ছন্দে অযুগ্ম unitএর পর যতি না দেওয়াই রীতি। আর এজন্যেই অসমমাত্রার ছন্দে আঁজাঁব্‌মাঁ বা প্রবহমানতা আনা যায় না।[৫] যে ছন্দে তিনের পরে ভাগ, যাকে আমি বলেছি অসমমাত্রার ছন্দ, তাতে যেখানে-সেখানে থামা যায় না, লাইনের মধ্যেও থামা যায় না, একেবারে লাইনের শেষে গিয়ে থামতে হয়।[৬] যেমন—

১ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগে 'প্রভু বুদ্ধ লাগি' ইত্যাদি উদ্‌ধৃতিটি সম্বন্ধে কবির মন্তব্য।

২ এরকম প্রয়োগের আরও নিদর্শন আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'চিত্রা' কাব্যের 'বিলম্বে এসেছ রুদ্ধ এবে দ্বার' ইত্যাদি 'দুঃসময়'-নামক কবিতাটি (১৮৯৪) এবং 'নৈবেদ্য' কাব্যের 'প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী' ইত্যাদি প্রথম রচনাটির (১৯০১) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৩ আঁজাঁব্‌মাঁ বা প্রবহমানতা মানে লাইনডিঙোনো চাল বা পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘন। দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগে 'হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ এবং 'গদ্যছন্দ' চতুর্থ বিভাগ শেষ অনুচ্ছেদ।

৪ তুলনীয় : 'তার অকালমৃত্যুর…ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল।'—'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ।

৫ অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দে কেন প্রবহমানতা আনা যায় না তা দৃষ্টান্তযোগে ব্যাখ্যাত হয়েছে 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগে এবং 'গদ্যছন্দ' চতুর্থ বিভাগে।

৬ দ্রষ্টব্য : 'সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দ', তিনমাত্রামূলক ছন্দের প্রসঙ্গ।

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

···অসম সংখ্যার পর ধ্বনি থামতে পারে না। সেখানে একটা ভাগ থাকলেও ধ্বনিটা পরবর্তী বিভাগের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। যেমন—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী

এখানে 'পঞ্চশরে' কথাটার পরে যতিটা স্থায়ী হয় না।···

ইংরেজি ভাষার একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দেরই একটা বিশেষ জোর আছে, সেটা ও ভাষার accentএর জন্যেই হয়। প্রত্যেকটি শব্দই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে, অন্য কথার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। শব্দগুলিকে এ ভাবে জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় বলেই ইংরেজি ছন্দ এরূপ তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলা শব্দগুলি বড়ো শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরঙ্গিত করে তোলে না। এজন্য বাংলায় আমরা এক ঝোঁকে অনেকগুলো শব্দ উচ্চারণ করে আবৃত্তি করে যাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হয় না।[১] অর্থবোধের জন্যে বিষয়টাকে আবার ফিরে পড়তে হয়। এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার এই দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গায়িত ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে ধ্বনিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে তা দেখতে পাচ্ছ।[২] অল্পবয়সে আমি মধুসূদনের যে কঠোর সমালোচনা[৩] করেছিলুম, পরবর্তী কালে আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে

১ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগ আরম্ভাংশ।

২ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধে 'মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ এবং 'বিহারীলালের ছন্দ' উপান্ত্য অনুচ্ছেদ।

৩ ভারতী ১২৮৪ শ্রাবণ-পৌষ ও ১২৮৯ ভাদ্র। ওই 'কঠোর সমালোচনা'টিতেও কিন্তু 'যাদঃপতিরোধঃ যথা' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিটির প্রশংসাই করা হয়েছিল (ভারতী ১২৮৪ ভাদ্র)।

রবি — সেকালে কবিতাতেও আছে। এর লয় চার মাত্রার নয়। সেই জন্যে
তিনের ভাগে যেখানে কম পড়েছে সেখানে টেনে পুরিয়ে দিতে হয়। যেমন —
আমি —। যদি —। জন্ম। নিতেম। কালি —। দাসের। কালে —।
এরকম ছন্দে আমরা প্রত্যেক পর্বে ফাঁক ভরিয়ে দিই তা নয়, গানের তালের
মতই যেখানে সুবিধে পাই সেখানেই কতকটা জোর দিয়ে থাকি। তাতে ছন্দোগুণের
বৈচিত্র্য ঘটে। ভালো করে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে, ঐ লাইনটাতে
"আমি যদি" দুই মাত্রায় দ্রুত পাঠ করে "জন্ম" এবং "নিতেম" শব্দের কাছ থেকে উভয়ের
দাবীমতো ভর্তি করে নিয়েছি। নইলে ছন্দের
তাল কাটত কেননা এটা নিঃসন্দেহ তিনমাত্রার তাল। "কালিদাসের"
শব্দটাতেও ঐরকম বলা নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। অর্থাৎ "কালি"-তে যেটুকু কম
পড়েছে "দাসের" মধ্যে সেটা আদায় করে নিতে হোলো। সব ফাঁকগুলি সমান
ভরিয়ে দিয়েও আমি কবিতা লিখেছি।

'ছন্দবিচার' আলোচনার একটি অংশ

হয়েছে। বাংলাভাষার এই সমতলতা, এই দুর্বলতাটা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি।...

তুমি যে প্রাকৃত ছন্দকে চার-চার সিলেব্‌ল্‌এ ভাগ কর সেটা ঠিক বলে আমার মনে হয় না। আমি বলি এ ছন্দে তিনমাত্রার ভাগটাই মূলকথা। এ ছন্দে আমি যত গান রচনা করেছি তার সবগুলিতেই দাদরা তাল, সবসময়েই তিনমাত্রার ভাগ হয়।...সেইজন্যে তিনের ভাগে যেখানে কম পড়েছে সেখানে টেনে পুরিয়ে দিতে হয়। যেমন—

আমি- | যদি- | জন্‌ম | নিতেম।
কালি- | দাসের | কালে- |

এরকম ছন্দে আমরা যে প্রত্যেক পর্বে ফাঁক ভরিয়ে নিই তা নয়, গানের তালের মতোই যেখানে সুবিধে পাই সেখানেই কর্তব্য সেরে নিয়ে থাকি। তাতে ছন্দোনৃত্যের বৈচিত্র্য ঘটে। ভালো করে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে, ঐ লাইনটাতে 'আমি যদি' দুই-দুই মাত্রায় দ্রুত পাঠ করে 'জন্ম' এবং 'নিতেম' শব্দের কাছ থেকে উভয়ের জরিমানা ডিক্রি করে নিয়েছি। নইলে ছন্দের তাল কাটতই, কেননা এটা নিঃসন্দেহে তিনমাত্রার তাল। 'কালিদাসের' শব্দটাতেও ঐ রকম রফানিষ্পত্তি করতে হয়েছে। অর্থাৎ 'কালি'তে যেটুকু কম পড়েছে 'দাসের' মধ্যে সেটা আদায় করে নিতে হল।[১] সব ফাঁকগুলি সমান ভরিয়ে দিয়েও আমি কবিতা লিখেছি।[২]...পূরবীর 'বিজয়ী' কবিতাটিতে আমি মাত্রার ফাঁক পূরণ করে দিতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সর্বত্র তা আমি পারি নি। কারণ ছন্দের নূতনত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে কবিতাকে তো খর্ব করতে পারি নে।[৩] কাজেই এ কবিতাটিতে কোনো কোনো জায়গায় মাত্রার ফাঁক আর পূরণ করা হয় নি। যারা কবিতা পড়বে তারাই ফাঁক পূরণ করে নেবে। ছন্দের ঝোঁক আপনিই পাঠককে ঠিক পথে চালায়।...

১ দ্রষ্টব্য : 'অনুষঙ্গ ১' প্রথম পত্র, 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ, 'বাংলা প্রাকৃতছন্দ' প্রথম পর্যায়, 'অনুষঙ্গ ২' চতুর্থ পত্র ইত্যাদি।

২ বেফাঁক প্রাকৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত : 'বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর' এবং 'স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন' ইত্যাদি 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগে। 'মহুয়া' কাব্যের 'অর্ঘ্য' রচনাটি এরকম বেফাঁক প্রাকৃত ছন্দের একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

৩ স্মরণীয় কবির উক্তি : 'মানুষ চাপা দেওয়ার চেয়ে মোটর ভাঙা ভালো'।— 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১' প্রথম প্রসঙ্গ।

ছন্দ এমন একটা বিষয় যাতে সকলে একমত হতে পারে না। তোমার সঙ্গে একমত হতে পারব এমন আশা করা যায় না। ছন্দ হচ্ছে কানের জিনিস। এক-এক জনের কান এক-এক রকম ধ্বনি পছন্দ করে। তাই আবৃত্তির ভঙ্গির মধ্যে এতটা পার্থক্য ঘটে। আমি দেখেছি কেউ কেউ খুব বেশি টেনে টেনে আবৃত্তি করে, আবার কেউ কেউ আবৃত্তি করে খুব তাড়াতাড়ি। কানেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে, আর আবৃত্তি করারও অভ্যাস থাকা চাই। আমি কিন্তু কবিতা রচনার সময় আবৃত্তি করতে করতেই লিখি। এমন কি, কোনো গদ্য রচনাও যখন ভালো করে লিখব মনে করি তখন গদ্য লিখতে লিখতেও আবৃত্তি করি। কারণ রচনার ধ্বনিসংগতি ঠিক হল কি না তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে কান।…

বাংলায় rhythmic prose রচনা নেই। এক সময়ে আমি rhythmic prose রচনার চেষ্টা করেছি। 'লিপিকা'তে সে rhythm ধরতে পারবে। 'লিপিকা'র রচনাগুলিকে আমি প্রথমে rhythm রক্ষার জন্য পদ্যের মতো ভাঙাভাঙা লাইনেই লিখেছিলুম। পরে গদ্যের মতো করেই ছাপানো হয়েছে।… আমি একসময় সত্যেনকে[১] বলেছিলুম বাংলায় rhythmic prose রচনা করতে। কিন্তু সে তো তা করলে না। সে কবিতার ছন্দের ঝংকারে এমন আকৃষ্ট হল যে, সে শেষের দিকে একরকম ছন্দে-পাওয়া হয়েই গিয়েছিল। অবন (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর) একসময় rhythmic prose লিখতে চেষ্টা করেছিল। তার লেখা আমার ভালো লেগেছিল, কিন্তু বেশি প্রলম্বিত এবং অসংশ্লিষ্ট হওয়াতে চলল না।…'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের proseএ যে rhythm রয়েছে তাতে সে দেশের লোকেরা আকৃষ্ট হয়েছে। মনে করেছি বাংলা গদ্যেও ওরকম rhythm রেখে কিছু রচনা করব।[২]…

আধুনিক কবিরা যে মিল বর্জন করে লাইন ভেঙে ভেঙে কবিতা রচনা করছে তাতে কিছু দোষ নেই। মিল না দেওয়াটা মোটেই অন্যায় নয়। কিন্তু অমিল কবিতা রচনা করা খুবই শক্ত, তাতে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন।…মিল জিনিসটার প্রতি কিছুকাল পূর্বেকার কবিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সতর্কতা ছিল না।

১ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

২ দ্রষ্টব্য : 'গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ' ২।

তাঁদের অনেকে পঙ্‌ক্তির শেষে কোনো রকমে একটুখানি মিল ঘটিয়েই তৃপ্ত হতেন; অনেক সময় তো শুধু রে হে ইত্যাদি দিয়েই মিলের কাজ শেষ করতেন।[১]

ছন্দ কেমন হবে কবিরাই ঠিক করবেন, তাঁরা নিজের কান আর ছন্দবোধের উপর নির্ভর করে নতুন নতুন ছন্দ রচনা করবেন। ইংরেজি সাহিত্যে একসময়ে ছন্দের ভাগ অত্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল, কোথাও ব্যতিক্রম হত না। তার পর কোলরিজ প্রভৃতি কবিরা এসে নতুন ছন্দের প্রবর্তন করলেন, তাঁরা কাটাকাটা ছন্দের ভাগ মানলেন না, কোথাও বেশি কোথাও কম চালাতে লাগলেন। প্রথম প্রথম তাতে আপত্তি হয়েছিল। পরে কিন্তু তাঁদের প্রথাটাই চলে গেল। সুতরাং ছন্দের কোনো অকাট্য নিয়ম নেই, এ কথাটা মনে রাখা দরকার।… যে ছন্দ কানকে খুশি করতে পারবে না সে ছন্দ কেউ পড়বে না। এর চেয়ে বড়ো শাস্তি আর কী আছে? কাজেই যেখানটাতে কান খুশি হয় না সেখানটাতে ছন্দপতন হয়েছে এ কথাও বলা চলে।

বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ : 'ছন্দবিচার' (অংশ)

দ্বিতীয় পর্যায়

সেদিনকার আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন উঠেছিল যে, ছন্দে[২] সিলেব্‌ল্‌ প্রধান অথবা মাত্রা প্রধান। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, মাত্রা নিয়েই ছন্দের স্বরূপ। কিঙ্কিণীতে ঘুন্টি কি ভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল কথা। যাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রত্যেক পর্বে ঊর্ধ্বসংখ্যা কয় সিলেব্‌ল্‌এর স্থান আছে তা আমি পূর্বে বিচার করে দেখি নি। 'বিচিত্রা'-সম্পাদক[৩] বলেন ছয় বা পাঁচ বা চার সবই চলে। আমি তাঁকে দৃষ্টান্তদ্বারা

১ মিলের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে 'বিহারীলালের ছন্দ' এবং 'কৌতুককাব্যের ছন্দ' প্রবন্ধে।

২ প্রশ্নটা ছিল বাংলা প্রাকৃত ছন্দ সম্বন্ধে।

৩ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'বিগত দিন' (১৩৬৪) গ্রন্থের সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ (পৃ ৩০-৪০) দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ করতে অনুরোধ করেছিলুম। তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করে দৃষ্টান্ত স্বয়ং রচনা করেছেন, পাঠকদের গোচর করা গেল।—

আজিকে তোমারে ডাক দিয়ে বলি, শুন গো সখী,
তোমার বীণায় বাজে অপরূপ ছন্দ ও কি ?[১] ···

দেখা যাচ্ছে, 'আজিকে তোমারে' ছয় সিলেব্‌ল্‌, তার পরেই 'ডাক দিয়ে বলি' পাঁচ সিলেব্‌ল্‌। পরবর্তী ছত্রে 'তোমার বীণায়' চার সিলেব্‌ল্‌, আবার 'বাজে অপরূপ' পাঁচ।

প্রাকৃত বাংলা ছন্দেও এরকম দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

৫ ৪ ৩ ১
শিবুঠাকুরের | বিয়ে হবে | তিন কন্যে | দান।

এই একটা লাইনেই দেখা যাচ্ছে চার অসমানসংখ্যক সিলেব্‌ল্‌পিণ্ড নিয়ে একই যাণ্মাত্রিক ছন্দ রচিত।

বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ : 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য'

ছন্দের মাত্রা

প্রথম পর্যায়

বহুকাল পূর্বে একটি গান রচনা করেছিলেম। 'সবুজপত্রে' সেটি উদ্‌ধৃত হয়েছিল।[২]

আঁধার রজনী পোহাল,
জগৎ পুরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত-কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

তা ছাড়া এই ছন্দে পরবর্তী কালে দুই-একটি শ্লোক লিখেছিলুম। যথা—

১ অনাবশ্যকবোধে অবশিষ্টাংশ বর্জিত হল। দ্রষ্টব্য : 'পাঠপরিচয়'।

২ দ্রষ্টব্য : 'সংগীত ও ছন্দ' প্রবন্ধ দ্বিতীয় বিভাগ। গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থে।

গোড়াতেই ঢাক বাজনা,
কাজ করা তার কাজ না।

আর-একটি—

শকতিহীনের দাপনি
আপনারে মারে আপনি।[১]

বলা বাহুল্য এগুলি নয় মাত্রার চালে লেখা।

'সবুজপত্রে'র প্রবন্ধে তার পরে দেখিয়েছিলুম ধ্বনিসংখ্যার কতরকম হেরফের করে এই ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটতে পারে, অর্থাৎ তার চলন কত ভঙ্গির হয়। তাতে যে দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেম তার পুনরুক্তি না করে নতুন বাণী প্রয়োগ করা যাক।

এইখানে বলে রাখা ভালো এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদাহরণগুলিতে প্রত্যেক ভাগে তাল দিলে ছন্দের পার্থক্য ধরা সহজ হয়।

উপরের ছন্দে ৩+৩+৩-এর লয়। নীচের ছন্দে ৩+২+৪-এর লয়।

আসন | দিলে | অনাহূতে,
ভাষণ | দিলে | বীণাতানে;
বুঝি গো | তুমি | মেঘদূতে
পাঠায়ে | ছিলে | মোর পানে।
বাদল রাতি এল যবে
বসিয়াছিনু একা-একা,
গভীর গুরু গুরু রবে
কি ছবি মনে দিল দেখা।
পথের কথা পুবে হাওয়া
কহিল মোরে থেকে থেকে;
উদাস হয়ে চলে-যাওয়া,
খ্যাপামি সেই রোধিবে কে।
আমার তুমি অচেনা যে,
সে কথা নাহি মানে হিয়া;

১ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দধাঁধা' দ্বিতীয় পর্বায়, ১৩-সংখ্যক রচনা।

তোমারে কবে মনোমাঝে
জেনেছি আমি না জানিয়া।
ফুলের ডালি কোলে দিনু,
বসিয়াছিলে একাকিনী ;
তখনি ডেকে বলেছিনু,
তোমারে চিনি, ওগো চিনি ॥

তার পরে ৪+৩+২ :

বলেছিনু | বসিতে | কাছে,
দেবে কিছু | ছিল না | আশা ;
দেব বলে | যেজন | যাচে,
বুঝিলে না | তাহারো | ভাষা।
শুকতারা চাঁদের সাথি
বলে, "প্রভু, বেসেছি ভালো,
নিয়ে যেয়ো আমার বাতি
যেথা যাবে তোমার আলো।"
ফুল বলে, "দখিন হাওয়া,
বাঁধিব না বাহুর ডোরে,
ক্ষণতরে তোমারে পাওয়া
চিরতরে দেওয়া যে মোরে ॥"

তার পরে ৩+৬ :

বিজুলি | কোথা হতে এলে,
তোমারে | কে রাখিবে বেঁধে।
মেঘের | বুক চিরি গেলে
অভাগা | মরে কেঁদে কেঁদে।
আগুনে গাঁথা মণিহারে
ক্ষণেক সাজায়েছ যারে,
প্রভাতে মরে হাহাকারে
বিফল রজনীর খেদে ॥

দেখা যাক ৪+৫ :

মোর বনে | ওগো গরবী,
এলে যদি | পথ ভুলিয়া,
তবে মোর | রাঙা করবী
নিজ হাতে | নিয়ো তুলিয়া।[১]

আর-একটা :

জলে ভরা | নয়নপাতে
বাজিতেছে | মেঘরাগিণী,
কী লাগিয়া | বিজন রাতে
উড়ে হিয়া, | হে বিবাগিনী।
ম্লানমুখে | মিলাল হাসি,
গলে দোলে | নবমালিকা।
ধরাতলে | কী ভুলে আসি
সুর ভোলে | সুরবালিকা॥

তার পরে ৪+৪+১। বলে রাখা ভালো এই ছন্দটি পড়বার সময় সবশেষ ধ্বনিটিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

বারে বারে | যায় চলি | -য়া,
ভাসায় ন | -য়ননীরে | সে।
বিরহের | ছলে ছলি | -য়া
মিলনের | লাগি ফিরে | সে॥[২]
যায় নয়নের আড়া -লে,
আসে হৃদয়ের মাঝে গো।
বাঁশিটিরে পায়ে মাড়া -লে
বুকে তার সুর বাজে গো॥
ফুলমালা গেল শুকা -য়ে,
দীপ নিবে গেল বাতা -সে।

১ এই রচনাটির অন্য রকম বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য 'ছন্দের মাত্রা' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগে।

২ এই অংশটির ঈষৎ-রূপান্তরিত পাঠ ও অন্যরকম বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য 'ছন্দের মাত্রা' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগে।

মোর ব্যথাখানি লুকা -য়ে
মনে তার রহে গাঁথা সে ॥
যাবার বেলায় তুয়া -রে
তালা ভেঙে নেয় ছিনি -য়ে।
ফিরিবার পথ উহা -রে
ভাঙা দ্বার দেয় চিনি -য়ে ॥

৩+২+৪-এর লয় পূর্বে দেখানো হয়েছে। ৫+৪-এর লয় এখানে দেওয়া গেল।

আলো এল যে | দ্বারে তব,
ওগো মাধবী | -বনছায়া।
দোঁহে মিলিয়া | নবনব
তৃণে বিছায়ে | গাঁথ মায়া ॥

চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
ফেরে বাতাস কাছে কাছে;
আজি ফাগুনে একসাথে
দোলা লাগিয়ো নাচে নাচে ॥

বধূ, তোমার দেহলিতে
বর আসিছে দেখিছ কি।
আজি তাহার বাঁশরিতে
হিয়া মিলায়ে দিয়ো সখি ॥

৬+৩-এর ঠাটেও নয় মাত্রাকে সাজানো চলে। যেমন—

সেতারের তারে | ধানশি
মিড়ে মিড়ে উঠে | বাজিয়া।
গোধূলির রাগে | মানসী
সুরে যেন এল | সাজিয়া ॥

আর-একটা:

তৃতীয়ার চাঁদ | বাঁকা সে,
আপনারে দেখে | ফাঁকা সে।

তারাদের পানে | তাকিয়ে
কার নাম যায় | ডাকিয়ে,
সাথি নাহি পায় | আকাশে ॥[1]

২

এতক্ষণ এই যে নয় মাত্রার ছন্দটাকে নিয়ে নয়-ছয় করছিলুম সেটা বাহাদুরি করবার জন্যে নয়, প্রমাণ করবার জন্যে যে এতে বিশেষ বাহাদুরি নেই। ইংরেজি ছন্দে এক্‌সেন্‌টের প্রভাব; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘহ্রস্বের সুনির্দিষ্ট ভাগ। বাংলায় তা নেই, এইজন্যে লয়ের দাবিরক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর কোনো বাধা নেই। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থেকে আরম্ভ করে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ মাত্রা পর্যন্ত বাংলা ছন্দে আমরা দেখি।

এই সুযোগে কেউ বলতে পারেন এগারো মাত্রার ছন্দ বানিয়ে নতুন কীর্তি স্থাপন করব। আমি বলি তা করো কিন্তু পুলকিত হোয়ো না, কেননা কাজটা নিতান্তই সহজ। দশ মাত্রার পরে আর-একটা মাত্রা যোগ করা একেবারেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। যেমন—

চামেলির ঘনছায়া-বিতানে
বনবীণা বেজে ওঠে কী তানে।
স্বপনে মগন সেথা মালিনী
কুসুমমালায় গাঁথা শিথানে ॥

অন্যরকমের মাত্রাভাগ করতে চাও, সেও কঠিন নয়। যেমন—

মিলন-সুলগনে | কেন বল্‌
নয়ন করে তোর | ছল্‌ছল্‌।
বিদায়দিনে যবে | ফাটে বুক,
সেদিনো দেখেছি তো | হাসিমুখ ॥

তার পরে তেরো মাত্রার প্রস্তাবটা শুনতে লাগে খাপছাড়া এবং নতুন, কিন্তু পয়ার থেকে একমাত্রা হরণ করতে দুঃসাহসের দরকার হয় না। সে কাজ অনেকবার করেছি, তা নিয়ে নালিশ ওঠে নি। যথা—

[1] তুলনীয়: 'ছন্দধাঁধা' দ্বিতীয় পর্যায়ে অষ্টম ধাঁধার 'আদর্শ'।

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।

এক মাত্রা যোগ করে পয়ারের জাতিবৃদ্ধি করাও খুবই সহজ। যথা—

হে বীর, জীবন দিয়ে মরণেরে জিনিলে,
নিজেরে নিঃস্ব করি বিশ্বেরে কিনিলে।

ষোলো মাত্রার ছন্দ দুর্লভ নয়। অতএব দেখা যাক সতেরো মাত্রা।—

নদীতীরে দুই | কূলে কূলে |
কাশবন দুলি | -ছে।
পূর্ণিমা তারি | ফুলে ফুলে |
আপনারে ভুলি | -ছে ॥

আঠারো মাত্রার ছন্দ সুপরিচিত। তার পরে উনিশ :

ঘন মেঘভার গগনতলে,
বনে বনে ছায়া তারি ;
একাকিনী বসি নয়নজলে
কোন্ বিরহিণী নারী ॥

তার পরে কুড়ি মাত্রার ছন্দ সুপ্রচলিত। একুশ মাত্রা। যথা—

বিচলিত কেন মাধবীশাখা,
মঞ্জরি কাঁপে থরথর।
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপি চুপি করে মরমর ॥

তার পরে,—আর কাজ নেই। বোধ হয় যথেষ্ট প্রমাণ করতে পেরেছি যে, বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরি করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না।

সংস্কৃত ভাষায় নূতন ছন্দ বানানো সহজ নয়, পুরানো ছন্দ রক্ষা করাও কঠিন। যথানিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের পর্যায় বেঁধে তার সংগীত। বাংলায় সেই দীর্ঘধ্বনিগুলিকে দুইমাত্রায় বিশ্লিষ্ট করে একটা ছন্দ দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্যাদা থাকবে না। মন্দাক্রান্তার[১] বাংলা রূপান্তর দেখলেই তা বোঝা যাবে।

১ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ শেষ অনুচ্ছেদ এবং 'অনুষঙ্গ ১' ষষ্ঠ পত্র

যক্ষ সে কোনো জনা আছিল আনমনা, সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত, বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জন রামগিরি -শিখরে মরে ফিরি একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা
যেথায় শীতল ছায় ঝরনা বহি যায় সীতার স্নানপূত জলধারা॥

মাস পরে কাটে মাস, প্রবাসে করে বাস প্রেয়সী-বিচ্ছেদে বিমলিন ;
কনকবলয়-খসা বাহুর ক্ষীণদশা, বিরহদুখে হল বলহীন।
একদা আষাঢ় মাসে প্রথম দিন আসে, যক্ষ নিরখিল গিরিপর
ঘনঘোর মেঘ এসে লেগেছে সানুদেশে, দন্ত হানে যেন করিবর॥[১]

পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৯ : 'নবছন্দ' (শেষাংশ)

দ্বিতীয় পর্যায়

উপরের প্রবন্ধে লিখেছি 'আঁধার রজনী পোহাল' গানটি নয় মাত্রার ছন্দে রচিত। ছন্দতত্ত্বে প্রবীণ অমূল্যবাবু ওর নয়মাত্রিকতার দাবি একেবারে নামঞ্জুর করে দিলেন।[২] আর কারো হাত থেকে এ রায় এলে তাকে আপিল করবার যোগ্য বলেও গণ্য করতুম না, এ ক্ষেত্রে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। রাস্তার লোক এসে যদি আমাকে বলে তোমার হাতে পাঁচটা আঙুল নেই তা হলে মনে উদ্‌বেগের কোনো কারণ ঘটে না। কিন্তু শারীরতত্ত্ববিদ্ এসে যদি এই সংবাদটা জানিয়ে যান তা হলে দশবার করে নিজের আঙুল গুনে দেখি, মনে ভয় হয় অঙ্ক বুঝি ভুলে গেছি। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হয়ে স্থির করি, যে-কটাকে এতদিন আঙুল বলে নিশ্চিন্ত ছিলুম বৈজ্ঞানিকমতে তার সব-কটা আঙুলই নয়। হয়তো শাস্ত্রবিচারে জানা যাবে যে, আমার আঙুল আছে মাত্র তিনটি, বাকি দুটো বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুল, তারা হরিজনশ্রেণীয়।

১ এই দুই স্তবক কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের প্রথম দুই শ্লোকের অনুবাদ।

২ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—'নয় মাত্রার ছন্দ' (পরিচয় ১৩৪০ কার্তিক)।

বর্তমান তর্কে আমার মনে সেইরকম উদ্‌বেগ জন্মেছে। 'আঁধার রজনী পোহাল' চরণের মাত্রাসংখ্যা যেদিক্ থেকে যেমন করে গনে দেখি নয় মাত্রায় গিয়ে ঠেকে। অমূল্যবাবু বললেন, এটা তো নয় মাত্রার ছন্দ নয়ই, বাংলাভাষায় আজো নয় মাত্রার উদ্ভব হয় নি, হয়তো নিরবধিকালে কোনো এক সময়ে হতেও পারে। তিনি বলেন, বাংলা ছন্দ দশ মাত্রাকে মেনেছে, নয় মাত্রাকে মানে নি। এ কথায় আরো আমার ধাঁধা লাগল।

অমূল্যবাবু পরীক্ষা করে বলছেন— এ ছন্দে জোড়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, 'আঁধার রজনী' পর্যন্ত এক পর্ব, এইখানে একটা ফাঁক, তার পরে 'পোহাল' শব্দে তিন মাত্রার একটা পঙ্গু পর্বাঙ্গ, তার পরে পুরো যতি। অর্থাৎ এ ছন্দে ছয় মাত্রারই প্রাধান্য। এর ধড়টা ছয় মাত্রার, ল্যাজটা তিন মাত্রার। চোখ দিয়ে এক পঙ্‌ক্তিতে নয় মাত্রা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অমূল্যবাবুর মতে কান দিয়ে দেখলে ওর দুটো অসমান ভাগ বেরিয়ে পড়ে।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমার অঙ্কবিদ্যায় আমি যে সংখ্যাকে 'নয়' বলি অমূল্যবাবুর অঙ্কশাস্ত্রেও তাকেই 'নয়' বলে বটে, কিন্তু ছন্দের মাত্রানির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে আমার পদ্ধতির মূলেই প্রভেদ আছে। কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো।

পৃথিবী চলছে, তার একটা ছন্দ আছে। অর্থাৎ তার গতিকে মাত্রাসংখ্যায় ভাগ করা যায়। এই ছন্দের পূর্ণায়তনকে নির্ণয় করব কোন্ লক্ষণ মতে? পৃথিবী নিয়মিত কালে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের পঞ্জিকা-অনুসারে পয়লা বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে চৈত্রসংক্রান্তিতে তার আবর্তনের এক পর্যায় শেষ হয়, তার পরে আবার সেই পরিমিত কালে পয়লা বৈশাখ থেকে পুনর্বার তার আবর্তন শুরু হয়। এই পুনরাবর্তনের দিকে লক্ষ করে আমরা বলতে পারি পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণের মাত্রাসংখ্যা ৩৬৫ দিন।

মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

এই ছন্দের যাত্রাপথে পুনরাবর্তন আরম্ভ হয়েছে কোথায় সে তো জানা কথা। সেই অনুসারে সর্বজনে বলে থাকে এর মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ। বলা বাহুল্য এই চোদ্দ মাত্রা একটা অখণ্ড নিরেট পদার্থ নয়। এর মধ্যে জোড় দেখা যায়, সেই জোড় আট মাত্রার অবসানে, অর্থাৎ 'মহাভারতের কথা' একটুখানি দাঁড়িয়েছে

যেখানে এসে। পয়ারে এই দাঁড়াবার আড্ডা দু জায়গায়, প্রথম আট ধ্বনিমাত্রার পরে ও শেষার্ধের ছয় ধ্বনিমাত্রা ও দুই যতিমাত্রার শেষে।[১] পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-ছন্দের মধ্যেও দুই ভাগ আছে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ। যতিসমেত ষোলোমাত্রা পয়ারেও তেমনি আছে উত্তরভাগ ও দক্ষিণভাগ, কিন্তু সেই দুটি ভাগ সমগ্রেরই অন্তর্গত।

মহাভারতের বাণী
অমৃতসমান মানি।
কাশীরাম দাস ভনে
শোনে তাহা সর্বজনে ॥

যদিও পয়ারের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তবু একে অন্য ছন্দ বলব, কারণ এর পুনরাবর্তন আট মাত্রায়, ষোলো মাত্রায় নয়।

আঁধার রজনী পোহাল,
জগৎ পুরিল পুলকে।

এই ছন্দের আবর্তন ছয় মাত্রার পর্যায়ে ঘটে না, তার কক্ষপথ সম্পূর্ণ হয়েছে নয় মাত্রায়। নয় মাত্রায় তার প্রদক্ষিণ নিজেকে বারে বারে বহুগুণিত করছে। এই নয় মাত্রায় মাঝে মাঝে সমভাগে জোড়ের বিচ্ছেদ আছে। সেই জোড় ছয় মাত্রায় না, তিন মাত্রায়।

এই ছন্দের লক্ষণ কী? প্রশ্নের উত্তর এই যে, এর পূর্ণভাগ নয় মাত্রা নিয়ে, আংশিক ভাগ তিন, এবং সেই প্রত্যেক ভাগের মাত্রাসংখ্যা তিন। কোনো পাঠক যদি ছয় মাত্রার পরে এসে হাঁফ ছাড়েন, তাঁকে বাধা দেবার কোনো দণ্ডবিধি নেই। সুতরাং সেটা তিনি নিজের স্বচ্ছন্দেই করবেন, আমার ছন্দে করবেন না। আমার ছন্দের লক্ষণ এই— প্রত্যেক পদে তিন কলা[২], প্রত্যেক কলায় তিন মাত্রা, অতএব সমগ্র পদের মাত্রাসমষ্টি নয়। অমূল্যবাবু এটিকে নিয়ে যে ছন্দ বানিয়েছেন তার প্রত্যেক পদে দুই কলা। প্রথম কলার মাত্রাসংখ্যা

১ দ্রষ্টব্য : 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১' তৃতীয় প্রসঙ্গ শেষাংশ ও পাদটীকা।

২ 'উপপর্ব' অর্থে ব্যবহৃত। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে 'কলা' শব্দটি কোনো কোনো স্থলে 'পর্ব' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রমতে 'কলা' শব্দের মানে 'মাত্রা', অর্থাৎ 'কলা' ও 'মাত্রা' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ছয়, দ্বিতীয় কলার তিন, অতএব সমগ্র পদের মাত্রাসমষ্টি নয়। দুটি ছন্দেরই মোট আয়তন একই হবে, কানে শোনাবে ভিন্নরকম।

ছান্দসিক যাই বলুন এখানে ছন্দরচয়িতা হিসাবে আমার আবেদন আছে। ছন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যা বলি সেটা আমার অশিক্ষিত বলা, সুতরাং তাতে দোষ স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু ছন্দের রস সম্বন্ধে আমি যদি কিছু আলোচনা করি, সংকোচ করব না, কেননা ছন্দসৃষ্টিতে অশিক্ষিতপটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়। 'আঁধার রজনী পোহাল' রচনাকালে আমার কান যে আনন্দ পেয়েছিল সেটা অন্যছন্দোজনিত আনন্দ থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। কারণটা বলি।

অন্যত্র বলেছি দুই মাত্রায় স্থৈর্য আছে, কিন্তু বেজোড় বলেই তিন মাত্রা অস্থির।[১] ত্রৈমাত্রিক ছন্দে সেই অস্থিরতার বেগটাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।

এ ছন্দে শব্দগুলি পরস্পরকে অস্থিরভাবে ঠেলা দিচ্ছে। একে জোড়মাত্রার ছন্দে রূপান্তরিত করা যাক।

যেথায় বিংশতি কোটি মানবের বাস
সেই তো ভারতবর্ষ যবনের দাস
শৃঙ্খলেতে বাঁধা পড়ে আছে।

এর চালটা শান্ত।

[কবিতায় ত্রৈমাত্রিক ছন্দে সাধারণত অশান্ত বেজোড় মাত্রার দৌড়কে পরিণামে জোড়মাত্রার সীমায় লাগাম টেনে সংযত করা হয়। প্রায়ই সংগীতের একতালাজাতীয় তালের নিয়মে বারো মাত্রায় তার চরম গতি, সেই তীর্থে এসে তবে সে খাড়া হয়ে থাকে। ঐ 'বারো' সংখ্যাটা যেন বরের

১ দ্রষ্টব্য : 'সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ' (বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের ছন্দপ্রসঙ্গ), 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ ('পাষাণ মিলায় গায়ের বাতাসে' দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ) এবং 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ শেষ অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা।

ঘরের পিসি কনের ঘরের মাসি, দুইয়ের সঙ্গেও তার যেমন কুটুম্বিতা তিনের সঙ্গেও তেমনি। তাই তিন মাত্রার ঝোঁকটা বারো মাত্রায় এসে ঠাণ্ডা হবার সুযোগ পায়। 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' পদটি বারো মাত্রায় স্থির হয়েছে।]

আলোচ্য নয় মাত্রার ছন্দে 'তিন' সংখ্যার অস্থিরতা শেষপর্যন্তই রয়ে গেছে। সেটা উচিত নয়, ছয় মাত্রার পরে থামবার একটুখানি অবকাশ দেওয়া ভালো এমন তর্ক তোলা যেতে পারে। কিন্তু ছন্দের সিদ্ধান্ত তর্কে হয় না, ওটার মীমাংসা কানে। সৌভাগ্যক্রমে এ সভায় সুযোগ পেয়েছি কানের দরবারে আরজি পেশ করবার। নয় মাত্রার চঞ্চল ভঙ্গিতে কান সায় দিচ্ছে না, এ কথা যদি সুধীজন বলেন তা হলে অগত্যা চুপ করে যাব, কিন্তু তবুও নিজের কানের স্বীকৃতিকে অশ্রদ্ধা করতে পারব না।

'আঁধার রজনী পোহাল' কবিতাটি গানরূপে রচিত। সংগীতাচার্য ভীমরাও শাস্ত্রী[১] মৃদঙ্গের বোলে একে যে তালের রূপ দিয়েছিলেন তাতে দুটি আঘাত এবং একটি ফাঁক। যথা—

১ ২ ৩

আঁধার | রজনী | পোহাল |

এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, ফাঁকটা তালের শেষ ঝোঁক, তার পরে পুনরাবর্তন। এই গানের স্বাভাবিক ঝোঁক প্রত্যেক তিনমাত্রায় এবং এর তালের অর্থাৎ ছন্দের সম্পূর্ণতা তিনমাত্রাঘটিত তিন ভাগে। অমূল্যবাবু বা শৈলেন্দ্রবাবু[২] যদি অন্য কোনো রকমের ভাগ ইচ্ছা করেন তবে রচয়িতার ইচ্ছার সঙ্গে তার ঐক্য হবে না, এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নাই।

উত্তর দিগন্ত ব্যাপি দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে,
দুই প্রান্তে দুই সিন্ধু, মানদণ্ড যেন তারি মাঝে।[৩]

এই ছন্দকে আঠারো মাত্রা যখন বলি তখন সমগ্র পদের মাত্রাসংখ্যা গণনা করেই বলে থাকি। আট মাত্রার পরে এর একটা সুস্পষ্ট বিরাম আছে বলেই এর আঠারো মাত্রার সীমানার বিরুদ্ধে নালিশ চলে না।

১ বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সংগীতশিক্ষক।

২ শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক। দ্রষ্টব্য : তাঁর 'ছন্দয়ণ' প্রবন্ধ— বিচিত্রা ১৩৩৯ শ্রাবণ

৩ এই দৃষ্টান্তটি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ।

আমাদের হাতে তিন পর্ব আছে। মণিবন্ধ পর্যন্ত এক, এটি ছোটো পর্ব, কমুই পর্যন্ত দুই, কমুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত তিন। যাকে আমরা সমগ্র বাহু বলি সে এই তিন পর্ব মিলিয়ে। আমাদের দেহে এক বাহু অন্য বাহুর অবিকল পুনরাবৃত্তি। প্রত্যেক ছন্দেরই এমনিতরো একটি সম্পূর্ণ 'রূপকল্প' অর্থাৎ প্যাটার্‌ন্ আছে। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে সেই প্যাটার্‌ন্‌কেই পুনঃপুনিত করে। সেই প্যাটার্‌নের সম্পূর্ণ সীমার মধ্যেই তার নানা পর্ব পর্বাঙ্গ প্রভৃতি যা-কিছু। সেই সমগ্র প্যাটার্‌নের মাত্রাই সেই ছন্দের মাত্রা। 'আঁধার রজনী পোহাল' গানটিকে এইজন্যেই নয় মাত্রার বলেছি। যেহেতু প্রত্যেক নয় মাত্রাকে নিয়েই তার পুনঃপুন আবর্তন।

কোন্ ছত্র কী রকম ভাগ করে পড়তে হবে, এ নিয়ে মতান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। পুরাতন ছন্দগুলির নাম অনুসারে সংজ্ঞা আছে। নতুন ছন্দের নামকরণ হয় নি। এইজন্যে তার আবৃত্তির কোনো নিশ্চিত নির্দেশ নেই। কবির কল্পনা এবং পাঠকের রুচিতে যদি অনৈক্য হয় তবে কোনো আইন নেই যা নিয়ে নালিশ চলতে পারে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যখন স্পষ্টতই আমার কোনো কাব্যের ছন্দকে নয় মাত্রার বলছি তখন সেটা অনুসরণ করাই বিহিত। হতে পারে তাতে কানের তৃপ্তি হবে না। না যদি হয় তবে সে দায় কবির। কবিকে নিন্দা করবার অধিকার সকলেরই আছে, তার রচনাকে সংশোধন করবার অধিকার কারো নেই।

এই উপলক্ষে একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্পটা বানানো নয়। পার্লামেন্টে দর্শকদের বসবার আসনে দুটি শ্রেণীভাগ আছে। সম্মুখভাগের আসনে বসেন যাঁরা খ্যাতনামা, পশ্চাতের ভাগে বসেন অপর-সাধারণ। দুই বিভাগের মাঝখানে কেবল একটিমাত্র দড়ি বাঁধা। একজন ভারতীয় দর্শক সেই সামনের দিক্ নির্দেশ করে প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "Can I go over there?" প্রহরী উত্তর করেছিল, "Yes, sir, you *can*, but you *mayn't*।" ছন্দেও যতিবিভাগ সম্বন্ধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে canএর নিষেধ বলবান্ নয়, কিন্তু তবু mayর নিষেধ স্বীকার্য।

একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। পাঠকমহলে স্বনামখ্যাত 'পয়ার' ছন্দের একটা পাকা পরিচয় আছে, এইজন্যে তার পদে কোথায় আধা যতি কোথায় পুরো যতি তা নিয়ে বচসার আশঙ্কা নেই। নিম্নলিখিত কবিতার চেহারা অবিকল

পয়ারের। সেই চোখের দলিলের জোরে তার সঙ্গে পয়ারের চালে ব্যবহার অবৈধ হয় না।

মাথা তুলে তুমি যবে চল তব রথে,
তাকাও না কোথা আমি ফিরি পথে পথে,
অবসাদজাল মোরে ঘেরে পায় পায়।
মনে পড়ে এই হাতে নিয়েছিলে সেবা,
তবু হায় আজ মোরে চিনিবে সে কেবা,
তোমারি চাকার ধুলা মোরে ঢেকে যায়॥

কিন্তু যদি পয়ার নাম বদলিয়ে এর নাম দেওয়া যায় 'ষড়ঙ্গী' এবং এর যথোচিত সংজ্ঞা নির্দেশ করি তা হলে বিনা প্রতিবাদে নিম্নলিখিত ভাগেই একে পড়া উচিত হবে।

মাথা তুলে তুমি
যবে চল তব
রথে,
তাকাও না কোথা
আমি ফিরি পথে
পথে,
অবসাদজাল
ঘেরে মোরে পায়
পায়।
মনে পড়ে এই
হাতে নিয়েছিলে
সেবা,
তবু হায় আজ
মোরে চিনিবে সে
কেবা,
তোমারি চাকার
ধুলা মোরে ঢেকে
যায়॥

এর প্রত্যেক পদে চোদ্দ মাত্রা, তিন কলা, সেই কলার মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ছয় ছয় দুই।

২

অমূল্যবাবুর মতে বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ নেই, আছে দশ মাত্রার, কিন্তু দশ মাত্রার উর্ধ্বে আর ছন্দ চলে না। আমি অনেক চিন্তা করেও তাঁর এই মতের তাৎপর্য বুঝতে পারি নি। একাদিক্রমে মাত্রাগণনা গণিতশাস্ত্রের সবচেয়ে সহজ কাজ, তাতেও যদি তিনি বাধা দেন তা হলে বুঝতে হবে তাঁর মতে গণনার বাইরে আরো কিছু গণ্য করবার আছে। হয়তো মোট মাত্রার ভাগগুলো নিয়ে তর্ক। ভাগ সকল ছন্দেই আছে।

দশ মাত্রার ছন্দ। যথা—

প্রাণে মোর আছে তার বাণী,
তার বেশি তারে নাহি জানি।

এর সহজ ভাগ এই—

প্রাণে মোর
আছে তার
বাণী।

একে অন্যরকমেও ভাগ করা চলে। যথা—

প্রাণে মোর আছে
তার বাণী।

অথবা 'প্রাণে' শব্দটাকে একটু আড় করে রেখে[১]—

প্রাণে মোর আছে তার
বাণী।

এই তিনটেই দশ মাত্রার ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তা হলেই দেখা যাচ্ছে ছন্দকে চিনতে হলে প্রথম দেখা চাই তার পদের মোট মাত্রা, তার পরে তার কলাসংখ্যা, তার পরে প্রত্যেক কলার মাত্রা।

---

১ এরকম আড়ে-রাখা শব্দের পারিভাষিক নাম 'অতিপর্ব'। দ্রষ্টব্য: 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১' ষষ্ঠ প্রসঙ্গ ও পাদটীকা।

১ ২ ৩ ৪

সকল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়

এই ছন্দের প্রত্যেক পদে সতেরো মাত্রা। এর চার কলা[১]। অন্ত্য কলাটিতে দুই ও অন্য তিনটি কলায় পাঁচ পাঁচ মাত্রা। এই সতেরো মাত্রা বজায় রেখে অন্যজাতীয় ছন্দ রচনা চলে কলাবৈচিত্র্যের দ্বারা। যথা—

১ ২ ৩

মন চায় | চলে আসে | কাছে,

৪ ৫

তবুও পা | চলে না।

বলিবার | কত কথা | আছে,

তবু কথা | বলে না॥

এ ছন্দে পদের মাত্রা সতেরো, কলার[২] সংখ্যা পাঁচ, তার মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ৪।৪।২।৪।৩। আঠারো মাত্রার দীর্ঘপয়ারে প্রথম আট মাত্রার পরে যেমন স্পষ্ট যতি আছে, এই ছন্দের প্রথম দশ মাত্রার পরে তেমনি।

নয়নে | নিঠুর | চাহনি |

হৃদয়ে | করুণা | ঢাকা।

গভীর | প্রেমের | কাহিনী |

গোপন | করিয়া | রাখা॥

এরও পদের মাত্রা সতেরো, কলার[৩] সংখ্যা ছয়, শেষ কলাটি ছাড়া প্রত্যেক কলার মাত্রা তিন।

১ ২ ৩ ৪

অন্তর তার | কী বলিতে চায় | চঞ্চল চর | -ণে।

কণ্ঠের হার | নয়ন ডুবায় | চম্পক বর | -নে॥

---

১ এখানে 'কলা' মানে 'পর্ব', 'উপপর্ব' নয়। প্রত্যেক পূর্ণ পর্বে তিন ও দুই মাত্রার দুটি উপপর্ব আছে।

২ এখানেও 'কলা' মানে 'পর্ব'।

৩ এখানে 'কলা' মানে 'উপপর্ব'।

এরও সমগ্র পদের মাত্রা সতেরো[১]। এর চারটি কলা[২]। প্রথম তিনটি কলায় মাত্রাসংখ্যা ছয়, চতুর্থ কলায় এক। সতেরো মাত্রার ছন্দকে কলাবৈচিত্র্যের দ্বারা আরো নবনব রূপ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাক্ষী আর বাড়াবার দরকার নেই।

শেষের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেছে তাতে মাত্রাসংখ্যাগণনা উপলক্ষে 'চরণে' শব্দকে ভাগ করে দিয়ে একমাত্রার 'ণে' ধ্বনিকে স্বতন্ত্র কলায় বসিয়েছি। ওটা যে স্বতন্ত্র কলাভুক্ত তার প্রমাণ এই ছন্দের তাল দেবার সময় ঐ 'ণে' ধ্বনিটির উপর তাল পড়ে।

ইতিপূর্বে অন্যত্র[৩] একটি নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দেবার সময় নিম্নলিখিত শ্লোকটি ব্যবহার করেছি। তাল দেবার রীতি বদল করে একে দুরকম করে পড়া যায়, দুটোই পৃথক্ ছন্দ।

বারে বারে যায় | চলিয়া,
ভাসায় গো আঁখি | -নীরে সে।
বিরহের ছলে | ছলিয়া
মিলনের লাগি | ফিরে সে॥

এটা নয় মাত্রার শ্রেণীর ছন্দ। এর দুই কলা এবং কলাগুলি ত্রৈমাত্রিক[৪]।

এর পদকে তিন কলায় ভাগ করে কলাগুলিকে দুই মাত্রার ছাঁদ দিলে[৫] এই একই ছড়া সম্পূর্ণ নূতন ছন্দে গিয়ে পৌঁছাবে। যথা—

১ ২ ৩
বারে বারে | যায় চলি | -য়া,
ভাসায় গো | আঁখিনীরে | সে।
বিরহের | ছলে ছলি | -য়া
মিলনের | লাগি ফিরে | সে॥

১ সতেরো নয়, উনিশ।

২ এখানে 'কলা' মানে 'পর্ব'।

৩ 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগ শেষাংশ।

৪ এখানে 'কলা' মানে 'পর্ব' এবং পর্বগুলি ত্রৈমাত্রিক উপপর্বে বিভাজ্য।

৫ এখানেও 'কলা' মানে 'পর্ব'। প্রতি পূর্ণ পর্বে চার মাত্রা এবং এগুলি দ্বৈমাত্রিক উপপর্বে বিভাজ্য।

সারাদিন | দহে তিয়া | -ষা,
বারেক না | দেখি উহা | -রে।
অসময়ে | লয়ে কী আ | -শা
অকারণে | আসে তুয়া | -রে ॥

অমূল্যবাবু বলেন, এর প্রথম দুই কলায় চার চার আট এবং শেষের কলায় এক মাত্রার ছন্দ কৃত্রিম শুনতে হয়। বোধ হয় অখণ্ড শব্দকে খণ্ডিত করা হচ্ছে বলে তাঁর কাছে এটা কৃত্রিম ঠেকছে। কিন্তু ছন্দের ঝোঁকে অখণ্ড শব্দকে দুভাগ করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এরকম তর্কে বিশুদ্ধ হাঁ এবং না -এর দ্বন্দ্ব, কোনো পক্ষে কোনো যুক্তিপ্রয়োগের ফাঁক নেই। আমি বলছি কৃত্রিম শোনায় না, তিনি বলছেন শোনায়। আমি এখনো বলি, এই রকম কলাভাগে এই ছন্দে একটি নূতন নৃত্যভঙ্গি জেগে ওঠে, তার একটা রস আছে।

দশের বেশি মাত্রাভার বাংলা ছন্দ বহন করতে অক্ষম এ কথা মানতে পারব না। নিম্নে বারো মাত্রার একটি শ্লোক দেওয়া গেল।

মেঘ ডাকে গম্ভীর গরজনে,
ছায়া নামে তমালের বনে বনে,
ঝিল্লি ঝনকে নীপ-বীথিকায়।
সরোবর উচ্ছল কূলে কূলে,
তটে তারি বেণুশাখা দুলে দুলে
মেতে ওঠে বর্ষণ-গীতিকায় ॥

শ্রোতারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আবৃত্তিকালে পদান্তের পূর্বে কোনো যতিই দিই নি, অর্থাৎ বারো মাত্রা একটি ঘনিষ্ঠ গুচ্ছের মতোই হয়েছে। এই পদগুলিকে বারো মাত্রার পদ বলবার কোনো বাধা আছে বলে আমি কল্পনা করতে পারি নে। উল্লিখিত শ্লোকের ছন্দে বারো মাত্রা, প্রত্যেক পদে তিন কলা[১], প্রত্যেক কলায় চার মাত্রা।

বারো মাত্রার পদকে চার কলায়[২] বিভক্ত করে ত্রৈমাত্রিক করলে আর-এক ছন্দ দেখা দেবে। যথা—

১ এখানে 'কলা' মানে 'পর্ব'।

২ এখানে 'কলা' মানে 'উপপর্ব'।

শ্রাবণ-গগন, ঘোর ঘনঘটা,
তাপসী যামিনী এলায়েছে জটা,
দামিনী ঝলকে রহিয়া রহিয়া।

এ ছন্দ বাংলাভাষায় সুপরিচিত।

তমালবনে ঝরিছে বারিধারা,
তড়িৎ ছুটে আঁধারে দিশাহারা।
ছিঁড়িয়া ফেলে কিরণ-কিঙ্কিণী
আত্মঘাতী যেন সে পাগলিনী॥

পঞ্চমাত্রাঘটিত এই বারো মাত্রাকেও কেন যে বারো মাত্রা বলে স্বীকার করব না, আমি বুঝতেই পারি নে।

কেবল নয় মাত্রার পদ বলার দ্বারা ছন্দের একটা সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়, সে পরিচয় বিশেষভাবে সম্পূর্ণ হয় না। আমার সাধারণ পরিচয় আমি ভারতীয়, বিশেষ পরিচয় আমি বাঙালি, আরও বিশেষ পরিচয় আমি বিশেষ পরিবারের বিশেষ নামধারী মানুষ। নয় মাত্রার পদবিশিষ্ট ছন্দ সাধারণভাবে অনেক হতে পারে।

[মোর বনে ওগো | গরবী,
এলে যদি পথ | ভুলিয়া,
তবে মোর রাঙা | করবী
নিজ হাতে নিয়ো | তুলিয়া।

এর এই নয় মাত্রার পদকে যদি দুই ভাগ করা যায় তবুও সমগ্র পদের দিকে তাকিয়ে একে নয় মাত্রার ছন্দই বলব। যথা—

মোর বনে | ওগো গরবী,
এলে যদি | পথ ভুলিয়া।[১]

এই উভয় ভাগের ছন্দকেই নয় মাত্রার ছন্দ বলছি, তার কারণ উভয়তই নয় মাত্রার পদে ছন্দের রূপকল্পটি সমাপ্ত, তার পরে পুনরাবর্তন। এই সব-কটি ছন্দেরই সাধারণ পরিচয়, এরা নয় মাত্রার ছন্দ।] আরও বিশেষ পরিচয় দাবি করলে এর কলাসংখ্যা এবং সেই কলার মাত্রাসংখ্যার হিসাব দিতে হয়।

[১] এই দৃষ্টান্তের এরকম বিভাগ দ্রষ্টব্য 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগে।

কোনো কোনো ছন্দে কলাবিভাগ করতে ভুল হবার আশঙ্কা আছে। যেমন —'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা'। পয়ারের চোদ্দ মাত্রা থেকে এক মাত্রা হরণ করে এই তেরো মাত্রার ছন্দ গঠিত। অর্থাৎ 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরিষন' এবং এই ছন্দটি বস্তুত এক, এমন মনে হতে পারে। আমি তা স্বীকার করি নে, তার সাক্ষী শুধু কান নয়, তালও বটে। এই দুটি ছন্দে তালের ঘা পড়েছে কী রকম তা দেখা উচিত।

১ ২
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরিষন।

সাধারণ পয়ারের নিয়মে এতে দুটি আঘাত।

১ ২ ৩
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বর | -ষা।

এতে তিনটি আঘাত। পদটি তিন অসমান ভাগে বিভক্ত। পদের শেষবর্ণে স্বতন্ত্র ঝোঁক দিলে তবেই এর ভঙ্গিটাকে রক্ষা করা হয়। 'বরষা' শব্দের শেষ আকার যদি হরণ করা যায় তা হলে ঝোঁক দেবার জায়গা পাওয়া যায় না, তা হলে অক্ষরসংখ্যা সমান হলেও ছন্দ কাত হয়ে পড়ে।

'আঁধার রজনী পোহালো' পদের অন্তবর্ণে দীর্ঘস্বর আছে, কিন্তু নয় মাত্রার ছন্দের পক্ষে সেটা অনিবার্য নয়। তারি একটি প্রমাণ নীচে দেওয়া গেল।

জ্বেলেছে পথের আলোক
সূর্যরথের চালক,
অরুণরক্ত গগন।
বক্ষে নাচিছে রুধির,
কে রবে শান্ত সুধীর,
কে রবে তন্দ্রামগন।
বাতাসে উঠিছে হিলোল,
সাগর-ঊর্মি বিলোল,
এল মহেন্দ্রলগন,
কে রবে তন্দ্রামগন॥

৩

এই তর্কক্ষেত্রে আর-একটি আমার কৈফিয়ত দেবার আছে। অমূল্যবাবুর নালিশ এই যে, ছন্দের দৃষ্টান্তে কোনো কোনো স্থলে দুই পঙ্‌ক্তিকে মিলিয়ে আমি কবিতার এক পদ বলে চালিয়েছি। আমার বক্তব্য এই, লেখার পঙ্‌ক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয়। আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজনমতো পা মুড়ে বসতে পারি, তৎসত্ত্বেও গণনায় ওটাকে এক পা বলেই স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি। নইলে চতুষ্পদের কোঠায় পড়তে হয়। ছন্দেও ঠিক তাই।

সকল বেলা কাটিয়া গেল,
বিকাল নাহি যায়।

অমূল্যবাবু একে দুই চরণ বলেন, আমি বলি নে। এই দুটি ভাগকে নিয়েই ছন্দের সম্পূর্ণতা। যদি এমন হত

সকল বেলা কাটিয়া গেল,
বকুলতলে আসন মেল।

তা হলে নিঃসংশয়ে একে দুই চরণ বলতুম।

পুনর্বার বলি যে, যে বিরামস্থলে পৌঁছিয়ে পদ্যছন্দ অনুরূপ ভাগে পুনরাবর্তন করে সেই পর্যন্ত এসে তবেই কোন্‌টা কোন্ ছন্দ এবং তার মাত্রার পরিমাণ কত তার নির্ণয় সম্ভব, মাঝখানে কোনো-একটা জোড়ের মুখে গণনা শেষ করা অসংগত। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এই নিয়মেরই অনুসরণ করা হয়। দৃষ্টান্ত—

পৈঙ্গল ছন্দঃসূত্রাণি

ভংজিঅ মলঅ চোলবই নিবলিঅ গংজিঅ গুজ্জরা,
মালবরাঅ মলঅগিরি লুক্কিঅ পরিহরি কুংজরা।
খুরসাণা খুহিঅ রণমহ মুহিঅ লংঘিঅ সাঅরা,
হম্মীর চলিঅ হারব পলিঅ রিউগণহ কাঅরা॥[১]

গ্রন্থকার বলছেন 'বিংশত্যক্ষরাণি' এবং 'পঞ্চবিংশতিমাত্রাঃ প্রতিপাদং দেয়াঃ'।

১ প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১৫১। এই প্রাকৃত ছন্দটির নাম 'গগনাঙ্গ' (প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১৪৯-৫০)। দ্রষ্টব্য: 'সংজ্ঞাপরিচয়'।

এর পদে পদে কুড়িটি অক্ষর ও পঁচিশটা মাত্রা, ছন্দের এই পরিচয়।[১]

পঢ়ম দহ দিজ্জিআ
পুণবি তহ কিজ্জিআ
পুণবি দহসত্ত তহ বিরই জাআ।
এম পরি বিবিহু দল
মত্ত সততীস পল
এহু কহ ঝুল্লণা ণাঅরাআ॥[২]

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই—"প্রথমং দশমাত্রা দীয়ন্তে। অর্থাৎ তত্র বিরতিঃ ক্রিয়তে। পুনরপি তথা কর্তব্যা। পুনরপি সপ্তদশমাত্রাসু বিরতির্জাতা চ। অনয়ৈব রীত্যা দলদ্বয়েপি মাত্রাঃ সপ্তত্রিংশৎ পতন্তি।" এমনি করে দলগুলিকে[৩] মিলিয়ে যে ছন্দের সাঁইত্রিশ মাত্রা, "তামিমাং নাগরাজঃ পিঙ্গলো ঝুল্লণামিতি কথয়তি"। আমি যাকে ছন্দোবিশেষের 'রূপকল্প' বা প্যাটার্ন্[৪] বলছি, 'ঝুল্লণা' ছন্দে সেইটে সাঁইত্রিশ মাত্রায় সম্পূর্ণ, তার পরে তার অনুরূপ পুনরাবৃত্তি। অমূল্যবাবু হয়তো এর কলাগুলির প্রতি লক্ষ রেখে একে পাঁচ বা দশ মাত্রার ছন্দ বলবেন, কিন্তু পাঁচ বা দশ মাত্রায় এর পদের সম্পূর্ণতা নয়।

যার ভাগগুলি অসমান এমন ছন্দ দেখা যাক।—

কুংতঅরু ধণুদ্ধরু
হঅবরু গঅবরু
ছক্কলু বিবি পা-
ইক্ক দলে।[৫]

১ শুধু তাই নয়। এই ছন্দের প্রতি পদের প্রথমে একটি 'চতুষ্কল গণ' অর্থাৎ চার মাত্রার পর্ব থাকা চাই এবং শেষ দুটি অক্ষর যথাক্রমে লঘু ও গুরু হওয়া চাই।

২ প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১৫৬। এ ছন্দের সঙ্গে জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ইত্যাদি বিখ্যাত রচনাটির ছন্দোগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৩ 'দল' মানে ছন্দের বৃহত্তম বিভাগ, 'পঙ্‌ক্তি' বা 'চরণ'। ঝুল্লণা ছন্দে দুই 'দল', প্রতি দলে সাঁইত্রিশ মাত্রা। বাংলা পরিভাষায় 'দল' মানে শব্দের স্বতন্ত্রোচ্চারিত অংশ অর্থাৎ সিলেব্‌ল্।

৪ 'প্রাকৃতপৈঙ্গলম্'-এর ভাষ্যকার এই 'রূপকল্প' বা প্যাটার্ন্ অর্থে 'পরিপাটি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'ঝুল্লণা' ছন্দের প্রতি দলে সাঁইত্রিশ মাত্রা স্থাপনের 'পরিপাটি' হচ্ছে— ১০।১০।১০।৭। দ্রষ্টব্য: 'সংজ্ঞাপরিচয়'।

৫ প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১৭৯। প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রমতে এ ছন্দের নাম 'দণ্ডকল'। দ্রষ্টব্য: 'সংজ্ঞা-পরিচয়'।

এই ছন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'দ্বাত্রিংশন্মাত্রাঃ পাদে সুপ্রসিদ্ধাঃ'। এই ছন্দকে বাংলায় ভাঙতে গেলে এইরকম দাঁড়ায়।

কুঞ্জপথে জ্যোৎস্নারাতে
চলিয়াছে সখীসাথে
মল্লিকা-কলিকার
মাল্য হাতে।[১]

চার পঙ্‌ক্তিতে এই ছন্দের পূর্ণরূপ এবং সেই পূর্ণরূপের মাত্রাসংখ্যা বত্রিশ।[২] ছন্দে মাত্রাগণনার এই ধারা আমি অনুসরণ করা কর্তব্য মনে করি। মনে নেই আমার কোনো পূর্বতন প্রবন্ধে অন্য মত প্রকাশ করেছি কি না[৩], যদি করে থাকি তবে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সবশেষে পুনরায় বলি, ছন্দের স্বরূপনির্ণয় করতে হলে সমগ্রের মাত্রাসংখ্যা, তার কলাসংখ্যা ও কলাগুলির মাত্রাসংখ্যা জানা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, যেখানে ছন্দের রূপকল্প একাধিক পদের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেখানে পদসংখ্যাও বিচার্য। যথা—

বর্ষণশান্ত
পাণ্ডুর মেঘ যবে ক্লান্ত
বন ছাড়ি মনে এল নীপরেণুগন্ধ,
ভরি দিল কবিতার ছন্দ।

এখানে চারটি পদ এবং প্রত্যেক পদ নানা অসমান মাত্রায় রচিত, সমস্তটাকে নিয়ে ছন্দের রূপকল্প। বিশেষজাতীয় ছন্দে এইরূপ পদ ও মাত্রা গণনাতেও আমি পিঙ্গলাচার্যের[৪] অনুবর্তী।

উদয়ন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ : 'ছন্দের মাত্রা'

১ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রমতে পদের অন্তস্থিত লঘুধ্বনি অনেক সময় গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়। সেই হিসাবে এখানে 'হাতে' শব্দের 'তে' ধ্বনিটিকে দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করতে হবে।

২ বস্তুতঃ দণ্ডকল ছন্দের প্রত্যেক পাদে বা দলেই অর্থাৎ পঙ্‌ক্তিতেই বত্রিশ মাত্রা। ছন্দশাস্ত্রে এ ছন্দের পাদবিভাগের কোনো পরিচয় নেই।

৩ 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ—'চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা যায় না, চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়।'

৪ বিখ্যাত ছন্দশাস্ত্রকার। এঁর নামে দুইখানি বই প্রচলিত আছে, একটি সংস্কৃত ও একটি প্রাকৃত। প্রথমটি (ছন্দঃসূত্রম্) খ্রীস্টের পূর্ববর্তী কালে এবং দ্বিতীয়টি (প্রাকৃতপৈঙ্গলম্) খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকে রচিত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

ছন্দের প্রকৃতি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)

আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।

রূপসৃষ্টির প্রবাহই তো বিশ্ব। সেই রূপটা জাগে ছন্দে, আধুনিক পরমাণুতত্ত্বে সে কথা সুস্পষ্ট। সাধারণ বিদ্যুৎপ্রবাহ আলো দেয়, তাপ দেয়, তার থেকে রূপ দেখা দেয় না। কিন্তু বিদ্যুৎকণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে আমাদের চৈতন্যের দ্বারে ঘা মারে তখনি আমাদের কাছে প্রকাশ পায় রূপ, কোনোটা দেখা দেয় সোনা হয়ে, কোনোটা হয় সীসে। বিশেষসংখ্যক মাত্রা ও বিশেষ বেগের গতি, এই দুই নিয়েই ছন্দ; সেই ছন্দের মায়ামন্ত্র না পেলে রূপ থাকে অব্যক্ত। বিশ্বসৃষ্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের শিল্পসৃষ্টিতে। তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, 'শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি'। মানুষের সব শিল্পই দেবশিল্পের স্তবগান করছে। 'এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে'। মানবলোকের সব শিল্পই এই দেবশিল্পের অনুকৃতি, অর্থাৎ বিশ্বশিল্পের রহস্যকেই অনুসরণ করে মানবশিল্প। সেই মূলরহস্য ছন্দে, সেই রহস্য আলোকতরঙ্গে, শব্দতরঙ্গে, রক্ততরঙ্গে, স্নায়ুতন্তুর বৈদ্যুততরঙ্গে।

মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেননা তার দেহ ছন্দরচনার উপযোগী। ভূতলের টান থেকে মুক্ত করে দেহকে সে তুলেছে ঊর্ধ্ব দিকে। চলমান মানুষের পদেপদেই ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা, unstable equilibrium। এতেই তার বিপদ্, এতেই তার সম্পদ্। চলার চেয়ে পড়াই তার পক্ষে সহজ। ছাগলের ছানা চলা নিয়েই জন্মেছে, মানুষের শিশু চলাকে আপনি সৃষ্টি করেছে ছন্দে। সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে পায়েপায়ে দেহভারকে মাত্রাবিভক্ত করে ওজন বাঁচিয়ে তবেই তার চলা সম্ভব হয়। সেটা সহজ নয়, মানবশিশুর চলার ছন্দসাধনা দেখলেই

তা বোঝা যায়। যে পর্যন্ত আপন ছন্দকে সে আপনি উদ্ভাবন না করে সে পর্যন্ত তার হামাগুড়ি। অর্থাৎ ভারাকর্ষণের কাছে তার অবনতি, সে-পর্যন্ত সে নৃত্যহীন।

চতুষ্পদ জন্তুর নিত্যই হামাগুড়ি। তার চলা মাটির কাছে হার মেনে চলা। লাফ দিয়ে যদিবা সে উপরে ওঠে, পরক্ষণেই মাটির দরবারে ফিরে এসেই তার মাথা হেঁট। বিদ্রোহী মানুষ মাটির একান্ত শাসন থেকে দেহভারকে মুক্ত করে নিয়ে তাতেই চালায় প্রয়োজনের কাজ এবং অপ্রয়োজনের লীলা। ভূমির টানের বিরুদ্ধে ছন্দের সাহায্যে তার এই জয়লব্ধ শক্তি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'। শিল্পই হচ্ছে আত্ম-সংস্কৃতি। সম্যক্ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক্ রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত বিশেষ ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত, কেননা বিচিত্র তার ছন্দ। 'ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।' শিল্পযজ্ঞের যজমান আত্মাকে সংস্কৃত করেন, তাকে করেন ছন্দোময়।

যেমন মানুষের আত্মার তেমনি মানুষের সমাজেরও প্রয়োজন ছন্দোময় সংস্কৃতি। সমাজও শিল্প। সমাজে আছে নানা মত, নানা ধর্ম, নানা শ্রেণী। সমাজের অন্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব যদি সক্রিয় থাকে, তা হলে সে এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে যাতে তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে কোথাও ওজনের অত্যন্ত বেশি অসাম্য না হয়। অনেক সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে ছন্দের এই ত্রুটিতে, অনেক সমাজ মরেছে ছন্দের এই অপরাধে। সমাজে যখন হঠাৎ কোনো-একটা সংরাগ অতিপ্রবল হয়ে ওঠে তখন মাতাল সমাজ পা ঠিক রাখতে পারে না, ছন্দ থেকে হয় ভ্রষ্ট। কিংবা যখন এমন-সকল মতের, বিশ্বাসের, ব্যবহারের বোঝা অচল হয়ে কাঁধে চেপে থাকে, যাকে ছন্দ বাঁচিয়ে সম্মুখে বহন করে চলা সমাজের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখন সেই সমাজের পরাভব ঘটে। যেহেতু জগতের ধর্মই চলা, সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেইজন্যেই তার বাহন ছন্দ। যে গতি ছন্দ রাখে না, তাকেই বলে দুর্গতি।

মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয়, তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয়, এমন আর কোনো জীবে দেখি নে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে, কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গির মতো সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করে নি, তাই তার তেমন শক্তি নেই, ব্যঞ্জনা নেই।

কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। মানুষ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যকে দাঁড় করাতে হয় বিশ্বগত সত্যে। সুখদুঃখ রাগবিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপসৃষ্টির উপাদান করতে চায় মানুষ। 'আমি ভালোবাসি', এই কথাটিকে ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করবার কাজে। আবার 'আমি ভালোবাসি', এই কথাটিকে 'আমি' থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে যে-সৃষ্টি সর্বজনের, সর্বকালের। যেমন সাজাহানের বিরহশোক দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের সৃষ্টি অপরূপ ছন্দে অতিক্রম করেছে ব্যক্তিগত সাজাহানকে।

নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ। গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি; সে কেবল তালের নেশা-জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল-দেওয়া। তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোলা মেশে। কিন্তু এই ভাবব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম, তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য; সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।

নাচতে দেখেছি সারসকে। সেই নাচকে কেবল আঙ্গিক বলা যায় না, অর্থাৎ টেক্‌নিকেই তার পরিশেষ নয়। আঙ্গিকে মন নেই, আছে নৈপুণ্য। সারসের নাচের মধ্যে দেখেছি ভাব এবং তার চেয়েও আরো কিছু বেশি। সারস যখনি মুগ্ধ করতে চেয়েছে আপন দোসরকে, তখনি তার মন সৃষ্টি করতে চেয়েছে নৃত্যভঙ্গির সংস্কৃতি, বিচিত্র ছন্দের পদ্ধতি। সারসের মন আপন দেহে এই নৃত্যশিল্প রচনা করতে পেরেছে, তার কারণ তার দেহভারটা অনেক মুক্ত।

কুকুরের মনে আবেগের প্রবলতা যথেষ্ট, কিন্তু তার দেহটা বন্ধক দেওয়া মাটির কাছে। মুক্ত আছে কেবল তার লেজ। ভাবাবেগের চাঞ্চল্যে কুক্কুরীয়

ছন্দে ঐ লেজটাতেই চঞ্চল হয় তার নৃত্য, দেহ আঁকুবাঁকু করে বন্দীর মতো।

মানুষের সমগ্র মুক্তদেহ নাচে, নাচে মানুষের মুক্তকণ্ঠের ভাষা। তাদের মধ্যে ছন্দের সৃষ্টিরহস্য যথেষ্ট জায়গা পায়। সাপ অপদস্থ জীব, মানুষের মতো পদস্থ নয়। সমস্ত দেহ সে মাটিকে সমর্পণ করে বসেছে। সে কখনো নিজে নাচে না। সাপুড়ে তাকে নাচায়। বাহিরের উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য দেহের এক অংশকে সে মুক্ত করে নেয়, তাকে দোলায় ছন্দে। এই ছন্দ সে পায় অন্যের কাছ থেকে, এ তার আপন ইচ্ছার ছন্দ নয়। ছন্দ মানে ইচ্ছা।[1] মানুষের ভাবনা রূপ গ্রহণের ইচ্ছা করেছে নানা শিল্পে, নানা ছন্দে। কত বিলুপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষে বিস্মৃত যুগের ইচ্ছার বাণী আজও ধ্বনিত হচ্ছে তার কত চিত্রে, জলপাত্রে, কত মূর্তিতে। মানুষের আনন্দময় ইচ্ছা সেই ছন্দলীলার নটরাজ, ভাষায় ভাষায় তার সাহিত্যে সেই ইচ্ছা নব নব নৃত্যে আন্দোলিত।

মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্য-ভাষায়। কোনো মানুষের চলাকে বলি সুন্দর, কোনোটাকে বলি তার উলটো। তফাতটা কিসে? সে কেবল একটা সমস্যাসমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তা হলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।

পালে-চলা নৌকো সুন্দর, তাতে নৌকোর ভারটার সঙ্গে নৌকোর গতির সম্পূর্ণ মিলন; সেই পরিণয়ে শ্রী উঠেছে ফুটে, অতিপ্রয়াসের অবমান হয়েছে অন্তর্হিত। এই মিলনেই ছন্দ। দাঁড়ি দাঁড় টানে, সে লগি ঠেলে, কঠিন কাজের ভারটাকে সে কমিয়ে আনে কেবল ছন্দ রেখে। তখন কাজের ভঙ্গি হয় সুন্দর। বিশ্ব চলেছে প্রকাণ্ড ভার নিয়ে বিপুল দেশে নিরবধি কালে সুপরিমিতির ছন্দে। এই সুপরিমিতির প্রেরণায় শিশিরের ফোঁটা থেকে

১ সংস্কৃত ছন্দঃ শব্দ বাংলায় হয়েছে ছন্দ। সংস্কৃতে বিসর্গহীন ছন্দ শব্দও আছে। ছন্দঃ এবং ছন্দ শব্দের অর্থ এক নয়। ছন্দঃ মানে পদ্যবন্ধ অর্থাৎ পদ্যের ধ্বনিবিন্যাসপ্রণালী। আর ছন্দ মানে ইচ্ছা (যথা—স্বচ্ছন্দ, ছন্দানুবর্তন)। মূলে হয়তো দুই শব্দের এক অর্থই ছিল। দ্রষ্টব্য: বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'ছন্দঃ' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ মাঘ, পৃ ২৯৯-৩০১।

সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সুগোল ছন্দে গড়া। এইজন্যেই ফুলের পাপড়ি সুবঙ্কিম, গাছের পাতা সুঠাম, জলের ঢেউ সুডোল।

জাপানে ফুলদানিতে ফুল সাজাবার একটি কলাবিদ্যা আছে। যেমন-তেমন আকারে পুঞ্জীকৃত পুষ্পিত শাখায় বস্তুভারটাই প্রত্যক্ষ; তাকে ছন্দ দিয়ে যেই শিল্প করা যায় তখন সেই ভারটা হয় অগোচর, হালকা হয়ে গিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে সহজে।

প্রাচীন জাপানের একজন বিখ্যাত বীর এই ফুলসাজানো দেখতে ভালো-বাসতেন। তিনি বলতেন এই সজ্জাপ্রকরণ থেকে তাঁর মনে আসত আপন যুদ্ধব্যবসায়ের প্রেরণা। যুদ্ধও ছন্দে-বাঁধা শিল্প, ছন্দের সমুৎকর্ষ থেকেই তার শক্তি। এই কারণেই লাঠি খেলাও নৃত্য।

জাপানে দেখেছি চা-উৎসব। তাতে চা-তৈরি, চা-পরিবেষণের প্রত্যেক অংশই সযত্ন-সুন্দর। তার তাৎপর্য এই যে, কর্মের সৌষ্ঠব এবং কর্মের নৈপুণ্য একসঙ্গে গাঁথা। গৃহিণীপনা যদি সত্য হয় তাকে সুন্দর হতেই হবে, অকৌশল ধরা পড়ে কুশ্রীতায়, কর্মের ও লোকব্যবহারের ছন্দোভঙ্গে। ভাঙা ছন্দের ছিদ্র দিয়েই লক্ষ্মী বিদায় নেন।

এতক্ষণ ছন্দকে দেখা গেল নৃত্যে। কেননা ছন্দের প্রথম উল্লাস মানুষের বাক্যহীন দেহেই। তার পরে দেহের ইশারা মেলে ভাষার ইশারায়। এবার ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাক ছন্দকে।

সেই একই কথা, ভার আর গতি, সেই দুইয়ের যোগে ওজন বাঁচিয়ে চলা। জন্তুর আওয়াজের পরিধি কতটুকুই বা; তাতে জোর থাকতে পারে, কিন্তু ভার সামান্য। কুকুর যতই ডাকুক, শেয়াল যতই চেঁচাক, ধ্বনির ওজন বাঁচিয়ে চলবার সমস্যা তাদের নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু আভাস পাওয়া যায়। গাধার 'পরে অবিচার করতে চাই নে। সে শুধু পরের ময়লা কাপড় বহন করে তা নয়, এ পর্যন্ত কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে আপন প্রভূত অখ্যাতি বহন করে এসেছে। কিন্তু যখনি সে নিজের ডাককে দীর্ঘায়িত করে, তখনি পর্যায়ে পর্যায়ে তাকে ধ্বনির ওজন ভাগ করতে হয়। নিজের ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ রেখে এই ব্যাপারকে ছন্দ বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি; কিন্তু আর কী বলব জানি নে।

মানুষকে বহন করতে হয় ভাষার সুদীর্ঘতা। প্রলম্বিত ভাষার ওজন তাকে রাখতেই হয়। মানুষের সেই বাক্যের সঙ্গে তার গানের সুর যখন মিশল, তখন

গীতিকলা হল দীর্ঘায়ত। নানাবিধ তাল নিযুক্ত হয়েছে তার ভার বইতে। কিন্তু তাল অর্থাৎ ছন্দকে কেবল ভারবাহক বললে চলবে না। সে তো ধ্বনিভারের ঝাঁকা-মুটে নয়। ভারগুলিকে নানা আয়তনে বিভক্ত করে যেই সে তাকে গতি দেয়, অমনি রূপ নিয়ে সংগীত আমাদের চৈতন্যকে আঘাত করে। ভাষা অবলম্বন করে যখন আমরা খবর দিতে চাই তখন বিবরণের সত্যতা রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব; কিন্তু যখন রূপ দিতে চাই তখন সত্যতার চেয়ে বেশি আবশ্যক হয় ছন্দের।

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল', এটা নিছক খবর। গল্প হিসাবে বা ঘটনা হিসাবে সত্য হলে এর আর কোনোই জবাবদিহি নেই। কিন্তু গলায় হাড়বেঁধা জন্তুটার লেজ যদি প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যের মধ্যে আছড়িয়ে নিতে চাই তবে ভাষায় লাগাতে হবে ছন্দের মন্ত্র।

বিদ্যুৎ-লাঙ্গুল করি ঘন তর্জন
বজ্রবিদ্ধ মেঘ করে বারি বর্জন।
তদ্রূপ যাতনায় অস্থির শার্দূল
অস্থিবিদ্ধগলে করে ঘোর গর্জন॥

কাব্যসাহিত্য কেবল রসসাহিত্য নয়, তা রূপসাহিত্য। সাধারণত ভাষায় শব্দগুলি অর্থবহন করে, কিন্তু ছন্দে তারা রূপগ্রহণ করে।

ছন্দ সম্বন্ধে এই গেল আমার সাধারণ বক্তব্য। বিশ্বের ভাষায় মানুষের ভাষায় রূপ দেওয়া তার কাজ। এখন বাংলা কাব্যছন্দ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করা যাক।

২

[সবচেয়ে সহজ ও প্রাথমিক ছন্দ হচ্ছে দুই ধ্বনিমাত্রার দুই পদপাতন। ছাত্র-অবস্থায় তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার ঘরের কাছে মেহেদি গাছের বেড়া। খবর নিতে গেলেম তার ছন্দটা কী। দেখি ডাঁটার ডাইনে একটি পাতা, বাঁয়ে একটি পাতা, তার পরেই একটি যতি। এই তো সমান ভাগে দুই মাত্রার ছন্দ। দ্বিপদীর চাল।[১] অন্য গাছে অন্য মাত্রার

১ মানে দুইমাত্রার বা সমমাত্রার চাল। 'দ্বিপদী' শব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণীয় নয়। পারিভাষিক অর্থে 'দ্বিপদী' মানে একপ্রকার ছন্দোবন্ধ, যেমন পয়ার।

ছন্দ। যেমন শিমুল গাছ, ছাতিম গাছ। এক সময়ে বনচ্ছায়ায় যখন গাছের অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি তখন তাদের ছন্দের খবর কিছু আদায় করতে পেরেছিলেম।]

দুই মাত্রা বা দুই মাত্রার গুণক নিয়ে যেসব ছন্দ তারা পদাতিক; বোঝা সামলিয়ে ধীরপদক্ষেপে তাদের চাল। এই জাতের ছন্দকে 'পয়ারশ্রেণীয়' বলব।[১] সাধারণ পয়ারে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে দুটি করে ভাগ, ধ্বনির মাত্রা ও যতির মাত্রা মিলিয়ে প্রত্যেক ভাগে আটটি করে মাত্রা। সুতরাং সমগ্র পয়ারের ধ্বনি-মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ এবং তার সঙ্গে মিলেছে যতিমাত্রাসংখ্যা দুই, অতএব সর্ব-সমেত ষোলো মাত্রা।[২]

বচন নাহি তো মুখে | তবু মুখখানি ০ ০
হৃদয়ের কানে বলে | নয়নের বাণী ০ ০।

আট মাত্রার উপর ঝোঁক না রেখে প্রত্যেক দুই মাত্রার উপর ঝোঁক যদি রাখি তবে সেই দুলকি চালে পয়ারের পদমর্যাদার লাঘব হয়।

কেন | তার | মুখ | ভার | বুক | ধুক | ধুক | ০ ০,
চোখ | লাল | লাজে | গাল | রাঙা | টুক | টুক | ০ ০।

অথবা প্রত্যেক চার মাত্রায় ঝোঁক দিয়ে পয়ার পড়া যেতে পারে। যেমন—

সুনিবিড় | শ্যামলতা | উঠিয়াছে | জেগে ০ ০
ধরণীর | বনতলে | গগনের | মেঘে ০ ০।

[ছন্দের দুটি জিনিস দেখবার আছে— এক হচ্ছে তার সমগ্র অবয়ব, আর তার সংঘটন।[৩] পয়ারের অবয়বের মাত্রাসমষ্টি ষোলো সংখ্যায়। এই ষোলো মাত্রা সংঘটিত হয়েছে দুই মাত্রার অংশযোজনায়।]

১ তুলনীয়: এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ারজাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই 'পয়ার' নাম দিচ্ছি।—'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

২ পয়ারের অনুরূপ বিশ্লেষণ ও ষোলো মাত্রা গণনার নিদর্শন পাওয়া যায় 'মহাভারতের কথা' ('বাংলা ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম বিভাগ, 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১' তৃতীয় প্রসঙ্গ ও 'ছন্দের মাত্রা' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম বিভাগ), 'বসন্ত পাঠায় দূত' ও 'গম্ভীর পাতাল যথা' ('ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ) ইত্যাদি তিনটি দৃষ্টান্তের আলোচনাপ্রসঙ্গে। 'বচন নাহি তো মুখে', 'কেন তার মুখ ভার' ও 'সুনিবিড় শ্যামলতা', অব্যবহিত পরবর্তী এই তিনটি দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণেও ওই নীতিই অনুসৃত হয়েছে।

৩ তুলনীয়: সবশেষে পুনরায় বলি…জানা আবশ্যক।—'ছন্দের মাত্রা' দ্বিতীয় পর্যায় শেষ অনুচ্ছেদ।

অনেকগুলি ছন্দ আছে যাতে খানিকটা করে বড়ো মাত্রাকে একটি করে ছোটো মাত্রা দিয়ে বাধা দেবার কায়দা দেখা যায়। দশ মাত্রার ছন্দ তার দৃষ্টান্ত। এর ভাগ— আট+দুই, অথবা, চার+চার+দুই।

মোর পানে | চাহ মুখ | তুলি,
পরশিব | চরণের | ধূলি।

ছয় মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়ো-ছোটোর ভাগ চলে। সে ভাগ— ছয়+দুই, অথবা, তিন+তিন+দুই। যেমন—

আঁখিতে | মিলিল | আঁখি,
হাসিল | বদন | ঢাকি।
মরম-বারতা শরমে মরিল,
কিছু না রহিল বাকি ॥[1]

ধ্বনিরূপসৃষ্টিতে 'দুই' সংখ্যার একটি বিশেষ প্রভাব আছে, 'তিন' সংখ্যা থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দৃষ্টান্ত দেখাই।

শ্রাবণ-ধারে সঘনে
কাঁদিয়া মরে যামিনী,
ছোটে তিমির-গগনে
পথহারানো দামিনী।

এই ছন্দটির সমগ্র অবয়ব ষোলো মাত্রায়। সেই ষোলো মাত্রাটি সংঘটিত হচ্ছে তিন-দুই-তিন মাত্রার যোগে, এইজন্যেই পয়ারের মতো এর চাল-চলন নয়। যে আট মাত্রা দুইয়ের অংশ নিয়ে সে চলে সোজা সোজা পা ফেলে, কিন্তু যে আট মাত্রা তিন-দুই-তিনের ভাগে সে চলছে হেলতে দুলতে মরালগমনে।

চেয়ে থাকে মুখপানে,
সে চাওয়া নীরব গানে
মনে এসে বাজে,
যেন ধীর ধ্রুবতারা

১ "অনেকগুলি ছন্দ···কিছু না রহিল বাকি।"— এই অংশটুকু প্রথম সংস্করণে নূতন যোজনা।

কহে কথা ভাষাহারা
জনহীন সাঁঝে।

যতিমাত্রাসমেত চব্বিশ মাত্রায় এই 'ত্রিপদী'র অবয়ব। এই চব্বিশ মাত্রা দুইমাত্রা-খণ্ডের সমষ্টি, এইজন্তেই একে 'পয়ারশ্রেণী'তে গণ্য করব।

রিমি ঝিমি বরিষে শ্রাবণধারা
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনি ঝিনি ;
দুরু দুরু হৃদয়ে বিরামহারা
তাকায়ে পথপানে বিরহিণী।

এ ছন্দেরও অবয়ব চব্বিশ[1] মাত্রায়। কিন্তু এর গড়ন স্বতন্ত্র ; এর অংশগুলি দুই-তিনের মিশ্রিত মাত্রা।

পয়ার ছন্দের বিশেষ গুণ এই যে, তার বুনোনি ঠাসবুনোনি নয়, তাকে বাড়ানো-কমানো যায়। সুর করে টেনে টেনে পড়বার সময় কেউ যদি যতির যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ ও শেষ ভাগে আট মাত্রা পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে। যেমন—

মহাভারতের কথা ॰ ॰ | অমৃত-সমান ॰ ॰।
কাশীরাম দাস ভণে ॰ ॰ | শুনে পুণ্যবান্ ॰ ॰॥

অথবা

মহা ॰ ॰ ভারতের কথা ॰ ॰ | অমৃত ॰ ॰ সমা ॰ ॰ ন।
কাশীরা ॰ ॰ ম দাস ভণে ॰ ॰ | শুনে ॰ ॰ পুণ্যবা ॰ ॰ ন্॥

পয়ার ছন্দ স্থিতিস্থাপক[2] বলেই এটা সম্ভব, আর সেই গুণেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সে এমন করে অধিকার করেছে।

[যাকে 'মহাপয়ার' নাম দেওয়া যায় সেটা 'পয়ারশ্রেণী'র সবচেয়ে প্রশস্ত ছন্দ।[3] সেই ছন্দ আমার পূজনীয় অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের সৃষ্টি।[4] আঠারো মাত্রায়

১ তেইশ ধ্বনিমাত্রা ও এক যতিমাত্রা, মোট চব্বিশ মাত্রা।

২ দ্রষ্টব্য : 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১' শেষ অনুচ্ছেদ ও 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ।

৩ এই 'মহাপয়ার' একপদী ও দ্বিপদী ছন্দের মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত। 'পয়ারশ্রেণী'র ত্রিপদী ও চৌপদী আরও প্রশস্ত।

৪ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগের শেষাংশে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের প্রসঙ্গ ও পাদটীকা ১।

এর অবয়ব, এর প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির প্রথম ভাগে আট মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে দশ মাত্রা। তাঁরই কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত দেখাই।

গম্ভীর পাতাল যথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য, শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে। ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসংঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে, প্রাণ যথা কালের কবল।[১]

স্থিতিস্থাপকতা ছাড়া 'পয়ারজাতীয়' ছন্দের আর দুটি মহদ্‌গুণ আছে। এক তার ভারবহনশক্তি[২], আর তার গাম্ভীর্য। যাকে 'ধ্বনিমাত্রা' বলি তার আছে সরুমোটা ভেদ। 'চন্দনচর্চিত' শব্দটা অক্ষরগণনায় আট মাত্রা, অন্তত সংস্কৃত ছন্দে তার এই ওজনই পাকা।[৩] দুর্বল বাহনের পিঠে চড়ালেই ওজনের কমি-বেশি পড়ে ধরা।]

তিন-তিন মাত্রায় যার গ্রন্থিযোজনা এমন একটি ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখাই।

আঁখির পাতায় নিবিড় কাজল
গলিছে নয়ন-সলিলে।

অক্ষরসংখ্যা সমান রেখে এই দুটো পদে যুক্তবর্ণ যদি চড়াই তা হলে সেটা কেমন হয়, যেমন এক-এক সময়ে দেখা যায় জোয়ান পুরুষ ক্ষীণ স্ত্রীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে পথে চলে নির্মমভাবে। প্রমাণ দিই।

চক্ষুর পল্লবে নিবিড় কজ্জল
গলিছে অশ্রুর নির্ঝরে।

কিন্তু এই বোঝা পয়ারজাতীয় পালোয়ানের স্কন্ধে চাপালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকবে না। প্রথমে বিনা-বোঝার চালটা দেখানো যাক।

১ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ শেষাংশ।

২ অন্যত্র বলেছেন 'শোষণশক্তি'। দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগে 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

৩ সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র অনুসারে 'চন্দনচর্চিত' শব্দে 'অক্ষর' আছে ছয়টি, কিন্তু 'কলা' বা 'মাত্রা' অর্থাৎ উচ্চারণকালের একক (য়ুনিট) আছে আটটি।

শ্রাবণের কালো ছায়া নেমে আসে তমালের বনে
যেন দিক্‌-ললনার গলিত কাজল-বরিষনে।

এইটিকে গুরুভার করে দিই।

বর্ষার তমিস্রচ্ছায়া ব্যাপ্ত হল অরণ্যের তলে
যেন অশ্রুসিক্তচক্ষু দিগ্‌বধূর গলিত কজ্জলে।

এতটা ভারবৃদ্ধি যে সম্ভব হয় তার কারণ পয়ার স্থিতিস্থাপক।

[একদিন এই তত্ত্বটি বিশেষ করে আমার গোচর হয়েছিল, তার ইতিহাসটা বলি।

সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক শব্দেই দীর্ঘহ্রস্ব ধ্বনির অসাম্য, ইংরেজি ভাষায় ধ্বনির অসমানতা তার একসেন্টবিদ্ধ শব্দে। মসৃণপথে তারা গড়গড় করে গড়িয়ে যায় না, ধাক্কা দিতে দিতে মনের মধ্যে দাগ রেখে রেখে চলে। বাংলাভাষায় রেলপাতা পথে ঠেলাগাড়ির মতো শব্দগুলোকে এক ঝোঁকে আট-দশ মাত্রা অনায়াসে পিছলিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে, মনের মধ্যে তারা জোরে দাগ কাটে না ; যথেষ্ট সময় পায় না নিজেকে বিশেষ করে জানান দেবার।[১] এই ত্রুটি লাঘব করবার জন্যে মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি পদে-পদে ঝংকৃত করে পয়ারের একটানা চালের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন।[২] সাধারণ পয়ারে এই শক্তির সম্ভাবনা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় সে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর অনবধানতা 'মেঘনাদবধ' কাব্যের আরম্ভেই প্রকাশ পেয়েছে।

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি।

১ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ছন্দ' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভাংশ।

২ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধে 'মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ, 'বিহারীলালের ছন্দ' প্রবন্ধে 'কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত-অক্ষরের স্থান হয় না' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ এবং 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় 'ইংরেজি ভাষার একটা মস্ত গুণ' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ।

এতগুলি পঙ্‌ক্তির আরম্ভে ও শেষে দুটিমাত্র যুক্তবর্ণের ধাক্কা। এর সঙ্গে 'প্যারাডাইস্‌ লস্ট্‌'-এর সূচনা মিলিয়ে দেখলে প্রভেদ স্পষ্ট হবে।

একদিন তৎকালপ্রচলিত বাংলা ছন্দের ক্ষীণতা-প্রতিকারের উপায় আমাকে ভাবতে হয়েছিল। সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলা স্বরবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘতার প্রচলন করতে গেলে এই কৃত্রিমতা বেশিক্ষণ সয় না। তার অসংগতি অধিকাংশ স্থলে ব্যঙ্গকাব্যেরই প্রয়োজন মেটাতে পারে।[১] যথা—

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গউড়ে
অরণ্যে যে-জন্যে গৃহগবিহগপ্রাণ দউড়ে॥
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজনবশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না॥[২]

'মানসী' লেখবার সময় আমার মনে প্রথম সংকল্প এল যে, যুক্তধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব দিয়ে ছন্দকে ধ্বনিবন্ধুর করব।[৩] সকলেই জানেন বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণ তখন ঐকমাত্রিক শ্রেণীতে গণ্য ছিল। সেই জন্যেই 'বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া' এমনতরো লাইনের সৃষ্টিতেও কবির সংকোচ ছিল না।[৪]

প্রথমত সেদিন যুক্তবর্ণকে পয়ারেও দিলেম দুই মাত্রার আসন।[৫] লিখলেম

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছশীতল,
উর্ধ্বে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল।

১ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগ উপান্ত্য অনুচ্ছেদ এবং 'আমার ছন্দের গতি' চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

২ শিখরিণী ছন্দ। অকারান্ত ধ্বনিকে অকারান্তরূপে এবং দীর্ঘস্বরান্ত ধ্বনিকে দীর্ঘরূপে উচ্চারণ করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা থেকে গৃহীত। দ্রষ্টব্য: ভারতী ১২৮৬ আশ্বিন, পৃ ২৬৪। মূলে ছিল 'গৌড়ে-দৌড়ে'। তাতে ছন্দোগত ত্রুটি ঘটে। 'গউড়ে-দউড়ে' ত্রুটিহীন। দ্রষ্টব্য: সংজ্ঞাপরিচয়, 'শিখরিণী'।

৩ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ 'মানসী' প্রসঙ্গ ও 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় প্রথম দুই অনুচ্ছেদ।

৪ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

৫ এই নূতন রীতির পয়ারকে বলা যায় 'মাত্রাবৃত্ত পয়ার'। এইজাতীয় পয়ারের প্রথম দৃষ্টান্ত 'মানসী' কাব্যের 'নিম্নে যমুনা বহে' ইত্যাদি 'নিষ্ফল উপহার'-নামক কবিতাটি।

অনতিকাল পরেই বোঝা গেল পয়ারের উপর এ আইন চালাবার কোনোই প্রয়োজন নেই। বিনা বাধায় লেখা যেতে পারে।

উন্মত্ত যমুনা বহে, আবর্তিত জল
দুর্গম শৈলের তটে উদ্দাম উচ্ছল।[১]

যদি লেখা যায়

হিমালয় নামে গিরি নগ-অধিরাজ

তা হলে হিমালয়ের মতো অত বড়ো পদার্থেরও উপর মন চলে যায় ঘুমিয়ে-পড়া গাড়োয়ানকে নিয়ে রাতের বেলার গোরুর গাড়ির মতো। কিন্তু ঐ পয়ারেই লেখা চলে

বিখ্যাত হিমাদ্রি নামে শৈল-অধিরাজ।[২]

এ লাইনে হিমালয়ের মানরক্ষা হতে পারে।]

যেমন দুইমাত্রামূলক পয়ার তেমনি তিনমাত্রামূলক ছন্দও বাংলাদেশে অনেককাল থেকে প্রচলিত। পয়ারের ব্যবহার প্রধানত আখ্যানে, রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে। তিনমাত্রামূলক ছন্দ গীতিকাব্যে, যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে।

পূর্বেই বলেছি পয়ারের চাল পদাতিকের চাল, পা ফেলে ফেলে চলে।

অভিসার-যাত্রাপথে হৃদয়ের ভার
পদে পদে দেয় বক্ষে ব্যথার ঝংকার।

এই পা ফেলে চলার মাঝে মাঝে যতি পাওয়া যায় যথেষ্ট, ইচ্ছা করলে তাকে বাড়ানো-কমানো চলে। কিন্তু তিন মাত্রার তালটা যেন গোল গড়নের, গড়িয়ে চলে[৩], পরস্পরকে ঠেলে নিয়ে দৌড় দেয়।

১ বস্তুতঃ 'নিয়ে যমুনা বহে' ইত্যাদি রচনাটি পরবর্তী কালে রূপান্তরিত হয় 'নিয়ে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল' ইত্যাদি রূপে (নিষ্ফল উপহার, 'কথা ও কাহিনী')। আরও পরবর্তী কালে 'মানসী'তে প্রবর্তিত পয়ার রচনার এই নূতন (মাত্রাবৃত্ত) রীতি আবার দেখা দেয় নানা কবিতায়। যেমন— 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থের (১৩৬১) আগমনী, উৎসব, ফাল্গুন প্রভৃতি কবিতায়।

২ তুলনীয় : 'উত্তর দিগন্ত ব্যাপি' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত— 'ছন্দের মাত্রা' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম বিভাগ।

৩ দ্রষ্টব্য : 'সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ' উপান্ত্য অনুচ্ছেদ, 'বাংলা ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ তৃতীয় অনুচ্ছেদ এবং 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ 'পশুপক্ষীদের চলন' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ।

চলিতে চলিতে চরণে উছলে
চলিবার ব্যাকুলতা,
নূপুরে নূপুরে বাজে বনতলে
মনের অধীর কথা।

এইজন্যে মাত্রা যদি কোথাও তিনের মাপের একটু বেশি হয় এ ছন্দ তাকে প্রসন্নমনে জায়গা দিতে পারে না। দায়ে পড়ে এই অত্যাচার কখনো করি নি এমন কথা বলতে পারব না।

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি,
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ
-নিনাদে।

এ কথা বোঝা শক্ত নয় যে, 'অনাথপিণ্ডদ' নামটার খাতিরে নিয়ম রদ করেছিলেম। গার্ড্ এসে গাড়ির কামরায় বরাদ্দর বেশি মানুষকে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ঘুষ খেয়ে থাকবে কিংবা আগন্তুক ভারি দরের।[১]

সেকালে অক্ষরগনতিকরা তিনমাত্রামূলক ছন্দে যুক্তধ্বনি বর্জন করে চলতুম। কিন্তু তাতে রচনায় অতিলালিত্যের দুর্বলতা এসে পৌঁছত।[২] সেটা যখন আমার কাছে বিরক্তিকর হল তখন যুক্তধ্বনির শরণ নিলুম। ছন্দটা একদিন ছিল যেন নবনী দিয়ে গড়া।

বরষার রাতে জলের আঘাতে
পড়িতেছে যুথী ঝরিয়া,
পরিমলে তারি সজল পবন
করুণায় উঠে ভরিয়া।

এই দুর্বলতার মধ্যে যুক্তবর্ণ এসে দেখা দিল।

নববর্ষার বারিসংঘাতে
পড়ে মল্লিকা ঝরিয়া,

১ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ও প্রাসঙ্গিক পাদটীকা।

২ দ্রষ্টব্য: 'বিহারীলালের ছন্দ' উপান্ত্য অনুচ্ছেদ, 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ এবং 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় প্রথম অনুচ্ছেদ।

সিন্ধুপবন সুগন্ধে তারি
কারুণ্যে উঠে ভরিয়া।

ধ্বনির দুই মাত্রা এবং তিন মাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান। তার পরে এই দুই এবং তিনের যোগে যৌগিক মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। তিন+দুই, তিন+চার, তিন+দুই+চার প্রভৃতি নানাপ্রকার যোগ চলেছে আধুনিক বাংলা ছন্দে। তিন+দুই-মাত্রামূলক ছন্দের দৃষ্টান্ত।

আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
অযুতকোটি তারা,
আপন কারা-ভবনে পাছে
আপনি হয় হারা।

দেখা যাচ্ছে এখানে পদশেষের অংশটিকে খর্ব করা হয়েছে। যদি লেখা যেত

আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
আকাশ ভরি অযুত তারা

তা হলে ছন্দের কাছে দেনা বাকি থাকত না। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রথম শ্লোকটির পদশেষে পাঁচ মাত্রার থেকে তিন মাত্রাকে জবাব দেওয়া হয়েছে। তা হলে বুঝতে হবে সেই তিন মাত্রা দেহত্যাগ করে ঐখানেই বসে আছে যতিকে ভর করে।[১]

কিন্তু এই কৈফিয়তটা সম্পূর্ণ হল বলে মনে হয় না, আরো কথা আছে। প্রকৃতির কাজের অলংকরণতত্ত্বটা আলোচ্য। দুই পা দুই হাত নিয়ে দেহটা দাঁড়াল, দুই কাঁধে দুটো মুণ্ড বসালেই সম্মিতি অর্থাৎ **symmetry** ঘটত। তা না করে দুই কাঁধের মাঝখানে একটি মুণ্ড বসিয়ে সমাপ্তিটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছে ডাঁটার দুধারে দুটি করে পত্রগুচ্ছ চলতে চলতে প্রান্তে এসে থামল একটিমাত্র গুচ্ছে। অলংকরণের ধারা যেখানে পূর্ণ হয়েছে সেখানে একটিমাত্র তর্জনী, ছোটো একটি ইশারা।

১ অর্থাৎ এই শেষ পর্বটিতে দুই ধ্বনিমাত্রার পরে তিনটি যতিমাত্রা আছে বলে ধরা হল। পূর্ববর্তী 'বচন নাহি তো মুখে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের আলোচনাপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। কিন্তু এরকম যতিমাত্রার স্বীকৃতি যে অত্যাবশ্যক নয় তা বলা হয়েছে পরবর্তী অনুচ্ছেদে।

সকল ভাষারই যতি আছে, কিন্তু যতিকে বাটখারাস্বরূপ করে ছন্দের ওজন পূরণ বাংলা ছন্দ ছাড়া আর কোনো ছন্দে আছে কি না জানি নে। সংস্কৃত ছন্দে এই রীতি বিরল, তবু একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি-ঘোরম্ ০ ০।[১]

যতিকে কেবল বিরতির স্থান না দিয়ে তাকে পূর্তির কাজে লাগাবার অভ্যাস আরম্ভ হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে। ছড়া আবৃত্তি করবার সময় আপনি যতির জোগান দেয় আমাদের কান।[২]

কাক কালো বটে, পিক সেও কালো,
কালো সে ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো যে কন্যা
তোমার চিকন কেশ।

এমন করে ছন্দটাকে পুরোপুরি ভরিয়ে দিলে কানের কাছে ঋণী হতে হত না। কিন্তু এতে ছড়ার জাত যেত। ছড়ার রীতি এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে; এ দুয়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ।[৩] প্রকৃতি আমের মধুরতায় জল মিশিয়েছেন, তাকে আমসত্ত্ব করে তোলেন নি; সেজন্যে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই কৃতজ্ঞ। তেমনি যথেষ্ট যতি মিশোল করা হয়েছে ছড়ার ছন্দে, শিশুকাল থেকে বাঙালি তাতে আনন্দ পায়। সে সহজেই আউড়েছে

কাক কালো, কোকিল কালো,
কালো ফিঙের বেশ,

১ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ। এখানে 'ঘোরম্'-এর পরে যতিমাত্রা মেনে নিলেও তার সংখ্যা দুই হবে না, হবে এক।

২ দ্রষ্টব্য: 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১' তৃতীয় প্রসঙ্গ প্রথমাংশ ও ষষ্ঠ প্রসঙ্গ শেষাংশ এবং প্রাসঙ্গিক পাদটীকা, 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় ('আমি যদি জন্ম নিতেম' ইত্যাদি প্রসঙ্গ) ও দ্বিতীয় পর্যায়, 'ছন্দের প্রকৃতি' তৃতীয় বিভাগ এবং 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' তিন পর্যায়।

৩ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায়, 'আমি যদি জন্ম নিতেম' ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

তাহার অধিক কালো কন্তে
তোমার চিকন কেশ।[১]

কিংবা

টুমুস টুমুস বাদ্যি বাজে,
লোকে বলে কী,
শামুকরাজা বিয়ে করে
ঝিনুকরাজার ঝি।[২]

৩

প্রত্যেক ভাষার একটি স্বকীয় ধ্বনি-উদ্ভাবনা আছে। তার থেকে তার স্বরূপ চেনা যায়। ইংরেজিতে বেশির ভাগ শব্দের স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা নেই বলে সে যেন হয়েছে সরোদ যন্ত্রের মতো, আঙুলের আঘাতে তার ঐকমাত্রিক ধ্বনিগুলি উচ্চকিত, ইটালিয়নে ছড়ির লম্বা টানে বেহালার টানা সুর।

বাংলাভাষারও নিজের একটা বিশেষ ধ্বনিস্বরূপ আছে। তার ধ্বনির এই চেহারা হসন্তবর্ণের যোগে। যে বাংলা আমাদের মায়ের কণ্ঠগত, জ্যেষ্ঠতাতের লেখনীগত নয়, ইংরেজির মতো তারও সুর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে। আজ সাধু-ভাষার ছন্দে জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্তবর্ণের আয়োজনে লেগেছি, অথচ প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে।[৩] এই ভাষায় একটি শ্লোক রচনা করা যাক একটিও যুক্তবর্ণ না দিয়ে।

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে,

১ সমগ্র ছড়াটি 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া'-নামক প্রবন্ধে সংকলিত হয়েছে। ছড়াটির আরম্ভ 'জাদু, এতো বড়ো রঙ্গ'। উক্ত প্রবন্ধে 'চিকন কেশ'-এর স্থলে আছে 'মাথার কেশ'।

২ দ্রষ্টব্য: 'অনুষঙ্গ ২', চতুর্থ পত্র।

৩ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগ শেষাংশ, 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় চতুর্থ বিভাগ এবং 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' প্রথম পর্যায়।

রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

হসন্তের ধাক্কায় যুক্তবর্ণের ঢেউ আপনি উঠছে।

চীনদেশের সাংঘাই নগরে একটি আরামবাগ আছে। অনেককাল সেখানে চীনের লোকেরই প্রবেশ-নিষেধ ছিল। তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্য-আরামবাগ থেকে বাংলা ভাষার স্বকীয় ধ্বনিরূপটি পণ্ডিত-পাহারাওয়ালার ধাক্কা খেয়ে অনেক কাল বাইরে বাইরে ফিরেছিল।[১]

ভাষার শব্দে অর্থ আছে, স্বর আছে। অর্থ জিনিসটা সকল ভাষাতেই এক, স্বরটা প্রত্যেক ভাষাতেই স্বতন্ত্র। 'জল' শব্দে যা বোঝায়, 'water' শব্দেও তাই বুঝি ; কিন্তু ওদের সুর আলাদা। ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেই রূপসৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলাভাষার আপন সম্বল, পণ্ডিতরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। কেননা, তাঁরা অর্থের মহাজন, কিন্তু যাঁরা রূপরসিক তাঁদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহতপ্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই 'অশিক্ষিত'-লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ্ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্‌ধৃত করে দিই।

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা॥
কাছে রয়, ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন্ পাগেলা।
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকে ভোলা॥

১ এই অনুচ্ছেদের পরে প্রাকৃত বাংলা গদ্যের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিছু দীর্ঘ একটা মন্তব্য ছিল। অপ্রাসঙ্গিকবোধে ওই অংশটা পূর্ববর্তী দুই সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণেও বর্জিত হল। দ্রষ্টব্য : 'পাঠপরিচয়'।

যেথা যার ব্যথা নেহাত
সেইখানে হাত
ডলামলা।
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা॥
যে জনা দেখে সে রূপ
করিয়া চুপ,
রয় নিরালা।
ওরে লালন[1] ভেড়ের লোকদেখানো
মুখে হরি হরি বোলা॥

আর-একটি

এমন মানব-জনম আর কি হবে?
যা কর মন ত্বরায় কর
এই ভবে॥
অনন্তরূপ ছিষ্টি করেন সাঁই,
শুনি মানবের তুলনা কিছুই নাই।
দেবদেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে॥···
এই মানুষে হবে মাধুর্যভজন,
তাইতে মানুষ-রূপ গঠিল নিরঞ্জন;
এবার ঠকলে আর

১ লালনচন্দ্র কর, দাস বা রায়। পরে ইনি লালন শাহ ফকির নামে পরিচিত হন। দ্রষ্টব্য: প্রবাসী ১৩৩২ শ্রাবণ, পৃ ৪৯৭; ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'বঙ্গবীণা' (১৯৩৪), পৃ ৪৯৩; মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -প্রণীত 'হারামণি' ভূমিকা, পৃ ১৫০; এবং মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র -সম্পাদিত 'লালন-গীতিকা' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮) ভূমিকা, পৃ ।০-।৶০।

না দেখি কিনার
লালন কয় কাতরভাবে ॥[১]

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো বড়ো নানাভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজে-ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।

এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস। ব্যঙ্গকবিতায় এ ভাষার জোর কত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকে তার নমুনা দিই। কুইন ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে কবি বলছেন—

তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গোরু,
শিখি নি শিঙ-বাঁকানো,
কেবল খাব খোলবিচালি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না।
আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব,
ঘুষি খেলে বাঁচব না ॥[২]

কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়।

অথচ এই প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত।—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে

১ এই গান-দুটি রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত : প্রবাসী ১৩২২ আশ্বিন ও পৌষ। দ্রষ্টব্য : 'লালন-গীতিকা' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), পদ ৭ এবং ৪১৪। এই পাঠ, প্রবাসীর পাঠ ও 'লালন-গীতিকা'র পাঠে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

২ 'নীলকর' কবিতার প্রথম গীত থেকে উদ্‌ধৃত। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ' গ্রন্থের (১২৯২ আশ্বিন) ভূমিকার পাঠ (পৃ ৫৫) অনুসৃত হল। 'উদয়ন' পত্রিকায় এবং প্রথম সংস্করণে ছিল— 'মোরা' সব পোষা গোরু, 'খড়বিচিলি' ঘাস, ভুষি পেলেই খুশি 'রব', ঘুষি 'পেলে আর' বাঁচব না। দ্রষ্টব্য : 'পাঠপরিচয়'।

যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে এ কথা মানব না।

এই যে-বাংলা বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা, এর একটি মস্ত গুণ এ ভাষা প্রাণবান্। এইজন্যে সংস্কৃত বল, পারসি বল, ইংরেজি বল সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে।[১] খাঁটি হিন্দি ভাষারও সেই গুণ। যারা হেডপণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়ে নি তাদের একটা লেখা তুলে দিই।

চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়,
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
বসে নিগম ঠাঁই।
এখানে না দেখলেম তারে,
চিনব তবে কেমন করে,
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
চিনতে যদি পাই॥[২]

প্রাকৃত বাংলাকে গুরুচণ্ডালি দোষ স্পর্শই করে না। সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয় না।

চলতি বাংলাভাষার প্রসঙ্গটা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। তার কারণ এ ভাষাকে যাঁরা প্রতিদিন ঘরে দেন স্থান, তাঁদের অনেকে সাহিত্যে একে অবজ্ঞা করেন। সেটাতে সাহিত্যকে তার প্রাণরসের মূল আধার থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে জেনে আমার আপত্তিকে বড়ো করেই জানালুম। ছন্দের তত্ত্ববিচারে ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনিপ্রকৃতির বিচার অত্যাবশ্যক, সেই কথাটা এই উপলক্ষে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

১ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় চতুর্থ বিভাগ শেষ অনুচ্ছেদ।

২ লালন-রচিত। দ্রষ্টব্য: প্রবাসী ১৩২২ আশ্বিন এবং 'লালন-গীতিকা' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), পদ ৬০ ('কোথা আছে রে সেই' ইত্যাদি)। এ ক্ষেত্রেও পাঠভেদ দেখা যায়।

৩

বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করে নি।[১] আর-একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলার হসন্ত শব্দের ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে।[২] আর-একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।[৩]

শিখরিণী মালিনী মন্দাক্রান্তা শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বড়ো বড়ো গম্ভীর চালের ছন্দ গুরুলঘুস্বরের যথানির্দিষ্ট বিন্যাসে অসমান মাত্রাভাগের ছন্দ। বাংলায় আমরা বিষমমাত্রামূলক ছন্দ কিছু কিছু চালিয়েছি, কিন্তু বিষমমাত্রার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির দ্বারা তারও একটা সম্মিতি রক্ষা হয়।

শিমূল রাঙা রঙে
　　চোখেরে দিল ভরে।
নাকটা হেসে বলে,
　　হায় রে যাই মরে॥
নাকের মতে, গুণ
　　কেবলি আছে ঘ্রাণে,
রূপ যে রঙ খোঁজে
　　নাকটা তা কি জানে॥

এখানে বিষমমাত্রার পদগুলি জোড়ে-জোড়ে এসে চলনের অসমানতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বিষমমাত্রার বিস্তার আরো অনেক বড়ো। এই সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরকে সমান করে নিয়ে কেবলমাত্র মাত্রা মিলিয়ে ছন্দ রচনা বাংলায় দেখেছি, সে বহুকাল পূর্বে 'স্বপ্নপ্রয়াণে'।

লজ্জা বলিল, "হবে
　　কি লো তবে,

১ সাধু রীতির ছন্দ।

২ বাংলা প্রাকৃত রীতির ছন্দ।

৩ রবীন্দ্রনাথ অন্য কোথাও এ শাখাটিকে স্বতন্ত্র নামে উল্লেখ করেন নি। অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দগুলি এর অন্তর্গত। এই শাখার প্রচলিত নাম 'মাত্রাবৃত্ত'। পরবর্তী অংশে আলোচিত শিখরিণী প্রভৃতি সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দগুলিও এই শ্রেণীভুক্ত।

কতদিন পরান রবে
অমন করি।
হইয়ে জলহীন
যথা মীন
রহিবি ওলো কতদিন
মরমে মরি" ॥[১]

এর প্রত্যেক ভাগে মাত্রাসংখ্যা স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত ছন্দে বিবিধ মাত্রার এই গতিবৈচিত্র্য যা সম্মিতি উপেক্ষা করেও ভঙ্গিলীলা বাঁচিয়ে চলে, বাংলায় তার অনুকৃতি এখনো যথেষ্ট প্রচলিত হয় নি। নূতন ছন্দ বাংলায় সৃষ্টি করবার শখ যাঁদের প্রবল, এই পথে তাঁরা অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাবেন। তবু বলে রাখি তাতে তাঁরা সংস্কৃত ছন্দের মোট আয়তনটা পাবেন, তার ধ্বনিতরঙ্গ পাবেন না। মন্দাক্রান্তার মাত্রাগোনা একটা বাংলা ছন্দের নমুনা দেওয়া যাক।

সারা প্রভাতের বাণী
বিকালে গেঁথে আনি'
ভাবিনু হারখানি
দিব গলে।
ভয়ে ভয়ে অবশেষে
তোমার কাছে এসে
কথা যে যায় ভেসে
আঁখিজলে॥
দিন যবে হয় গত
না-বলা কথা যত
খেলার ভেলা-মতো
হেলাভরে।

১ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) দ্বিতীয় সর্গ ১২৫। শিখরিণী ছন্দ। 'লজ্জা' শব্দে দুই মাত্রা গণনীয়। দ্রষ্টব্য: পরবর্তী রবীন্দ্রকৃত শিখরিণী ছন্দের দৃষ্টান্ত ও পাদটীকা।

লীলা তার করে সারা
যে পথে ঠাঁই-হারা
রাতের যত তারা
যায় সরে ॥[১]

শিখরিণীকেও এই ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

কেবলি অহরহ মনে মনে
নীরবে তোমা সনে
যা-খুশি কহি কত।
বিরহব্যথা মম নিজে নিজে
তোমারি মুরতি যে
গড়িছে অবিরত ॥
এ পূজা ধায় যবে তোমা পানে
বাজে কি কোনোখানে,
কাঁপে কি মন তব।
জান কি দিবানিশি বহুদূরে
গোপনে বাজে সুরে
বেদনা অভিনব ॥[২]

ছন্দ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকি রইল, আর কোনো সময়ে পরে বলবার ইচ্ছা আছে।[৩] উপসংহারে আজ কেবল এই কথাটি বলতে চাই যে, ছন্দের

---

১ দ্রষ্টব্য : 'অনুষঙ্গ ১' ষষ্ঠ পত্র, 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায় শেষ অনুচ্ছেদ এবং 'ছন্দোহার' ১৩২।

২ এটির সঙ্গে 'স্বপ্নপ্রয়াণ'এর 'লজ্জা বলিল' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটির মাত্রাবিভাগগত পার্থক্য লক্ষিতব্য। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রমতে শিখরিণীর প্রতি পঙক্তির দুই ভাগ; প্রথম ভাগে এগারো এবং দ্বিতীয় ভাগে চোদ্দো মাত্রা। পূর্ণ বিবরণ দ্রষ্টব্য 'সংজ্ঞাপরিচয়' অংশে। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম ভাগের এগারো মাত্রাকে ভেঙে সাত ও চার মাত্রার দুই পর্ব এবং দ্বিতীয় ভাগে চোদ্দো মাত্রাকে ভেঙে নয় ও পাঁচ মাত্রার দুই পর্ব রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এগারো মাত্রা একত্র স্থাপন করে দ্বিতীয় ভাগটিকে সাত মাত্রার দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য "বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ" প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ ১৩৪১ অগ্রহায়ণ, পৃ ৮৫৭-৫৮)।

৩ দ্রষ্টব্য : পরবর্তী 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' তৃতীয় পর্যায়।

শিখরিণীকেও এইভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

কেবলি অহরহ মনে মনে
নীরবে তোমা সনে
যা-খুশি কহি কত;
বিরহব্যথা মম নিতি নিতি
তোমারি মূরতি সে
গড়িছে অবিরত।
এ দুখ যায় যবে তোমাপানে
তখন কি তোমাপ্রাণে
কাঁপে কি মনতল?
জানো কি দিবানিশি এত দূরে
গোপনে ঝরে সুরে
বেদনা আঁখিনীর?

ছন্দ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকি রইল আর কোনো সময়ে পরে বলবার ইচ্ছা আছে। উপসংহারে আজ কেবল এই কথাটি বলতে চাই যে, কেউ কেউ

'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের এক পৃষ্ঠা

একটা দিক্ আছে যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল। কিন্তু তার চেয়ে আছে বড়ো জিনিস যেটাকে বলি সৌষ্ঠব। বাহাদুরি তার মধ্যে নেই, সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির কাছে ছন্দের আত্মবিস্মৃত আত্মনিবেদনে তার উদ্ভব। কাব্য পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে ছন্দ পড়ছি, তা হলে সেই প্রগল্‌ভ ছন্দকে ধিক্‌কার দেব। মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড পাকস্থলী অতি আশ্চর্য যন্ত্র, সৃষ্টিকর্তা তাদের স্বাতন্ত্র্য ঢাকা দিয়েছেন। দেহ তাদেরকে ব্যবহার করে, প্রকাশ করে না। করে প্রকাশ যখন রোগে ধরে; তখন যকৃৎটা হয় প্রবল, তার কাছে মাথা হেঁট করে লাবণ্য। শরীরে স্বাস্থ্যের মতোই কবি ছন্দকে ভুলে থাকে, ছন্দ যখন তার যথার্থ আপন হয়।[১]

উদয়ন, বৈশাখ ১৩৪১ : 'ছন্দ'

আমার ছন্দের গতি

কলিকাতা বিশ্বভারতী-সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণ[২]

মনে হয় কবিতা যখন ছাপা হত না তখনই তার স্বরূপ উজ্জ্বল ছিল; কারণ কণ্ঠে আবৃত্তিতেই ছন্দের বিশেষত্ব ভালো করে প্রকাশ পায়। ছাপায় আমরা চোখ দিয়ে কবিতাকে দেখি, তার পঙ্‌ক্তি, গঠন লক্ষ করি। মনে মনে ধ্বনি উচ্চারণ করে কবিতাকে সম্ভোগ করতে আমরা আজকাল শিখেছি। কিন্তু কবিতা নিঃশব্দে পড়বার বস্তু নয়, কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়েই তার রূপ ভালো করে প্রকাশ পায়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাল্যকালের সেই ইচ্ছাই ছিল স্বাভাবিক— শোনালেই কবিতার সম্পূর্ণ রস পাওয়া যায়, নইলে অভাব ঘটে।…

অল্পবয়সে প্রথমটা কিছুকাল অন্যের অনুকরণ অবশ্য করেছি। আমাদের বাড়িতে যে কবিদের সমাদর ছিল, মনে করতুম তাঁদের মতো কবিতা লিখতে পারলে ধন্য হব। তাই তখনকার প্রচলিত ছন্দ অনুকরণের চেষ্টা অল্পকাল

১ এই প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ প্রথম সংস্করণে স্থাপিত হয়েছিল 'মোট কথা' বিভাগে দ্রষ্টব্য : 'পাঠপরিচয়'।

২ শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক অনুলিখিত।

কিছু করেছি।[১] অকস্মাৎ একসময় খাপছাড়া হয়ে কেমন ভাবে নিজের ছন্দে পৌঁছলাম। শুধু এইটুকু মনে আছে, একদিন তেতলার ছাদে স্লেট হাতে, মনটা বিষণ্ণ— কাগজে পেনসিলে নয়, স্লেটে লিখতে অভ্যাসের পরিবর্তনেই হয়তো ছন্দের একটা পরিবর্তন এল যেটা তৎকালপ্রচলিত নয়। আমি বুঝতে পারলুম এটা আমার নিজস্ব। তারই প্রবল আনন্দে সেই নূতন ধারাতে চললাম। ভয় করি নি।[২]…

আমার কাব্যজীবনে দেখছি ক্রমাগত এক পথ থেকে অন্য পথে চলবার প্রবণতা, নদী যেমন করে বাঁক ফেরে। এক-একটা ছন্দ বা ভাবের পর্ব যখন শেষ হয়ে এসেছে বোধ হয় তখন নূতন ছন্দ বা ভাব মনে না এলে আর লিখিই নে।…

'মানসী'তে আবার নূতন ভাঙন লেগেছিল, অন্য পথে চলেছিলাম, ছন্দেরও কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গি চেষ্টা করেছিলাম। এ কথা মনে রাখতে অনুরোধ করি যে, কৌতূহলবশত বাহাদুরি নেবার জন্য আমি কখনো নূতন ছন্দ বানাবার চেষ্টা করি নি ; সেটা আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়। মানসীতে যে ছন্দের পরিবর্তন এসেছিল সেটা ধ্বনির দিক্ থেকে। লক্ষ করেছিলাম, বাংলা কবিতায় জোর পাওয়া যায় না, তার মধ্যে ধ্বনির উচ্চনীচতা নেই, বাংলা কবিতা অতি দ্রুত গড়িয়ে চলে যায়। ইংরেজিতে একসেন্ট্, সংস্কৃতে তরঙ্গায়িততা আছে। বাংলায় তা নেই বলেই পূর্বে পয়ারে সুর করে পড়া হত, টেনে টেনে অতিবিলম্বিত করে পড়া হত, তাই অর্থবোধে কষ্ট হত না। লক্ষ করেছি বাংলা কবিতা কানের ভিতর ধরে না, বোঝবার সম্ভাবনাও ঝাপসা হয়ে যায়।[৩] এর প্রতিকার চাই। বাংলায় দীর্ঘহ্রস্ব উচ্চারণ চালানোটা হাস্যকর, সেটা হাস্যরসেই প্রযুক্ত হতে পারে, যেমন আমার বড়োদাদা চালিয়ে ছিলেন।[৪]

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গউড়ে।

১ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় প্রথম অনুচ্ছেদ।

২ দ্রষ্টব্য : 'সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ' প্রবন্ধ ।

৩ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় এবং 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

৪ তুলনীয় : আমার বড়োদাদা… কৌতুক করিয়া।— 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় ; তার অসংগতি… মেটাতে পারে।— 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগ। দ্রষ্টব্য : 'অনুষঙ্গ ২' দ্বিতীয় পত্র।

কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে সেটা অচল। এজন্ত আমি যুক্তাক্ষরগুলিকে পুরোমাত্রার ওজন দিয়ে ছন্দ-রচনা মানসীতে আরম্ভ করেছিলাম। এখন সেটা চলতি হয়ে গেছে; ছন্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য তাতে বেড়েছে।[১] পরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছি। 'ক্ষণিকা' যখন লিখলুম তখন লোকের ধাঁধা লেগে গেল।… এমনি করে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছি। 'বলাকা'য় নূতন পর্ব এসেছে, ভাব ভাষা ও ছন্দ নূতন পথে গেছে। দেখেছি কাব্যের নূতন রূপ স্বীকার করে নিতে সময় লাগে, অনভ্যস্ত ধ্বনি ও ভাবের রস গ্রহণে মন স্বভাবতই বিমুখ হয়।…

বাংলায় নূতন ছন্দ অনেক আমিই প্রবর্তিত করেছি। একসময়ে যা রীতি-বিরুদ্ধ ছিল আজ সেটাই orthodox, classical হয়ে গেছে। আমার এখনকার কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই, যা গদ্য তা কখনো কবিতা হতে পারে না।… ভাষার যে একটুখানি আড়াল কাব্যে মাধুর্য জোগায়, গদ্যে তার অভাব; গদ্য হচ্ছে কথার ভাষা, খবর দেবার ভাষা। যে ভাষা সর্বদা প্রচলিত নয় তার মধ্যে যে একটা দূরত্ব আছে তারই প্রয়োগে কাব্যের রস জমে ওঠে। অধুনা 'শেষসপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে 'গদ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়,[২] তার একটা বিশেষত্ব আছে যাতে সেটা কাব্যের বাহন হতে পারে; সে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা লিখিত হলে তার গ্রাহক-সংখ্যা কমবেই, বাড়বে না। এর একটা বিশেষত্ব আছে যাকে আমার মন কাব্যের ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এই ভঙ্গিতে আমি যা লিখেছি, আমি জানি তা অন্য কোনো ছন্দে বলতে পারতুম না।… অনেকে মনে করেন কবিতা লেখা এতে সহজ হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় বাঁধা ছন্দেই তো

১ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর'।

২ তুলনীয়: গদ্য বললে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে।… তৈজস গদ্য।— 'গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ' ৪।

রচনা হুহু করে চলে, ছন্দই প্রবাহিত করে নিয়ে যায়; কিন্তু যেখানে বন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেখানে মনকে সর্বদা সতর্ক করে রাখতে হয়।

প্রবাসী. আষাঢ় ১৩৪৩ : 'আমার কাব্যের গতি' (অংশ)

বাংলা প্রাকৃত ছন্দ

প্রথম পর্যায়

সংস্কৃত বাংলা এবং প্রাকৃত বাংলার গতিভঙ্গিতে একটা লয়ের তফাত আছে। তার প্রকৃত কারণ প্রাকৃত বাংলার দেহতত্ত্বটা হসন্তের ছাঁচে, সংস্কৃত বাংলার হলন্তের।[১] অর্থাৎ উভয়ের ধ্বনিস্বভাবটা পরস্পরের উলটো।[২] প্রাকৃত বাংলা স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে পদে পদে তার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে আঁট করে তোলে। সুতরাং তার ছন্দের বুনানি সমতল নয়, তা তরঙ্গিত। সোজা লাইনের সুতো ধরে বিশেষ কোনো প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে মাপলে হয়তো বিশেষ কোনো সংস্কৃত বাংলার ছন্দের সঙ্গে সে বহরে সমান হতে পারে, কিন্তু সুতোর মাপকে কি আদর্শ বলে ধরা যায়?

মনে করা যাক রাজমিস্ত্রি দেয়াল বানাচ্ছে, ওলনদণ্ড ঝুলিয়ে দেখা গেল সেটা হল বারো ফিট। কিন্তু মোটের উপর দেয়াল খাড়া দাঁড়িয়ে থাকলেও সেটার উপরিতল যদি ঢেউখেলানো হয়, তবে কারুবিচারে সেই তরঙ্গিত ভঙ্গিটাই বিশেষ আখ্যা পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক।

'বউ কথা কও, বউ কথা কও'
যতই গায় সে পাখি,
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি।

১ 'হলন্ত' শব্দটি 'স্বরান্ত' অর্থে প্রযুক্ত। দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় তৃতীয় বিভাগের শেষ পাদটীকা।

২ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের প্রকৃতি' তৃতীয় বিভাগ আরম্ভাংশ।

খাড়া স্থতোর মাপে দাঁড়ায় এই।—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
'বউ ক | থা কও | বউ ক | থা কও'

১ ২ ১ ২ ১ ২
য তই | গায় সে | পা খি,

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
নি জের | ক থাই | কুন্ জ | ব নের

১ ২ ১ ২ ১ ২
সব ক | থা দেয় | ঢা কি।

সেই স্থতোর মাপে এর সংস্কৃত সংস্করণকে মাপা যাক।—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
'ক থা | ক হ | ক থা | ক হ'

১ ২ ১ ২ ১ ২
পা খি | য ত | ডা কে,

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
নি জ | ক থা | কা ন | নে র

১ ২ ১ ২ ১ ২
স ব | ক থা | ঢা কে।

স্থতোর মাপে সমান। কিন্তু কান কি সেই মাপে আঙুল গুনে ছন্দের পরিচয় নেয়? ছন্দ যে ভঙ্গি নিয়ে, বস্তুর পরিমাপ নিয়ে নয়।

তোমার সঙ্গে আমার মিলন
বাধল কাছেই এসে।
তাকিয়ে ছিলেম আসন মেলে,
অনেক দূর যে পেরিয়ে এলে,
আঙিনাতে বাড়িয়ে চরণ
ফিরলে কঠিন হেসে।

তীরের হাওয়ায় তরী উধাও
পারের নিরুদ্দেশে ॥

এরই সংস্কৃত রূপান্তর দেওয়া যাক।—

তোমা সনে মোর প্রেম
বাধে কাছে এসে।
চেয়েছিনু আঁখি মেলে,
বহুদূর হতে এলে,
আঙিনাতে পা বাড়িয়ে
ফিরে গেলে হেসে।
তীর-বায়ে তরী গেল
ওপারের দেশে ॥

মাপে মিলল, কিন্তু লয়ে মিলেছে কি? সমুদ্র যখন স্থির থাকে আর সমুদ্র যখন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে তখন তার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সমান থাকে, কিন্তু তার ভঙ্গির বৈচিত্র্য ঘটে। এই ভঙ্গি নিয়েই ছন্দ। বিধাতা সেই ভঙ্গির দিকে তাকিয়েই মৃদঙ্গ বাজান, বোল বদলিয়ে দেন, তাই মনের মধ্যে ভিন্নরকমের আঘাত লাগে।

আমি অন্যত্র[১] বলেছি, প্রাকৃত বাংলার ছন্দে যতিবিভাগ সকল সময় ঠিক কাটাকাটা সমান ভাগে নয়। পাঠক এক জায়গায় মাত্রা হরণ করে আর-এক জায়গায় ওজন রেখে তা পূরণ করে দিলে নালিশ চলে না। এইজন্যে একই কবিতা পাঠক আপন রুচি-অনুসারে কিছুপরিমাণে ভিন্নরকম করে পড়তে পারেন।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ফিরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী ॥

এই কবিতাটি আমি পড়ি 'রূপ' এবং 'ডুব' এবং 'অরূপ' শব্দের ধ্বনিকে দীর্ঘ

১ দ্রষ্টব্য 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগে 'হারিয়ে ফেলা বাঁশি আমার' ইত্যাদি প্রসঙ্গ এবং 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায়ে 'আমি যদি জন্ম নিতেম' ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

করে। অর্থাৎ ঐ উকারগুলোর ওজন হয় দুই মাত্রার কিছু বেশি। তখন তারই পূরণস্বরূপে 'ডুব দিয়েছি'র পরে যতিকে থামতে দেওয়া যায় না। অপর পক্ষে 'ঘাটে ঘাটে' শব্দে মাত্রাহ্রাসের ত্রুটি পূরণ করবার বরাত দেওয়া যায় 'ফিরব না' শব্দের উপর। নইলে লিখতে হত 'সাতঘাটে আর ফিরব না ভাই'।[১]

সংস্কৃত বাংলা ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দে লয়ের যে ভেদ কানে লাগে তার কারণ সংস্কৃত বাংলায় অনেক স্থলেই যে-শব্দের মাপ দুইএর তার ওজনও দুইএর। যেমন—

১	২	১	২
তো	মা	স	নে

কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় প্রায়ই সে স্থলে মাপ দুইএর হলেও ওজন তিনের। যেমন—

১	২	১	২
তো	মার্	সঙ্	গে।

এতে করে তিনঘেঁষা ছন্দের প্রকৃতি বদলে যায়। 'রূপসাগরে' গানটির পরিবর্তে লেখা যেতে পারত

রূপরসে ডুব দিনু অরূপের আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ফিরিব না বেয়ে মোর ভাঙা তরী॥

যদি কেউ বলেন দুটোর একই ছন্দ তা হলে এইটুকু বলে চুপ করব যে, আমার সঙ্গে মতে মিলল না। কেননা আমি ছন্দ গুনি নে, আমি ছন্দ শুনি।

পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৯ : 'ছন্দবিতর্ক'

দ্বিতীয় পর্যায়

ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্রসমাজে সভাযোগ্য

১ 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় চতুর্থ বিভাগেও এই দৃষ্টান্তটির বিশ্লেষণ আছে। এই দুই বিশ্লেষণে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই।[১] এর ভঙ্গিতে এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সবচেয়ে কম সহজ।

ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা। আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে দুটো উলটো কথা বলে। এক হচ্ছে আলোর রূপ ঢেউএর রূপ, আর হচ্ছে সেটা কণাবৃষ্টির রূপ। বাংলা সাধু ভাষার রূপ ঢেউএর, বাংলা প্রাকৃত ভাষার রূপ কণাবৃষ্টির। সাধু ভাষার শব্দগুলি গায়ে গায়ে মিলিয়ে গড়িয়ে চলে, শব্দগুলির ধ্বনি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিতায় আঁট বাঁধতে পারে না।[২] দৃষ্টান্ত যথা—

শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম।[৩]

বাংলা প্রাকৃত ভাষায় হসন্তপ্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিকে নিবিড় করে দেয়। পাতলা, আঁজলা, বাদলা, পাপড়ি, চাঁদনি প্রভৃতি নিরেট শব্দগুলি সাধু ভাষার ছন্দে গুরুপাক। সাধু ভাষার ছন্দে ভদ্র বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়, বসতে তার নিষেধ, বসিতে সে বাধ্য।[৪]

ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেইসব ভাবের উপযুক্ত— যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে-চলার চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়।

ছড়ার ছবি (আশ্বিন ১৩৪৪) : 'ভূমিকা' (অংশ)

১ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ, 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় শেষ অনুচ্ছেদ এবং 'ছন্দের প্রকৃতি' তৃতীয় বিভাগ।

২ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগ শেষ অনুচ্ছেদ।

৩ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

৪ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম বিভাগের 'টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ', 'এক্‌টি কথা শুনিবারে' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত এবং চতুর্থ বিভাগের শেষ দুটি দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় পর্যায়

মানুষের উদ্ভাবনী-প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা-বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে। ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল মোটবাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে-মুখে চলল ভাষার দেনাপাওনা।···

একদা ছিল না ছাপাখানা; অক্ষরের ব্যবহার হয় ছিল না, নয় ছিল অল্প। অথচ মানুষ যেসব কথা সকলকে জানাবার যোগ্য মনে করেছে, দলের প্রতি শ্রদ্ধায় তাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে এবং চালিয়ে দিতে চেয়েছে পরস্পরের কাছে।

একশ্রেণীর কথা ছিল যেগুলো সামাজিক উপদেশ। আর ছিল চাষবাসের পরামর্শ, শুভ-অশুভের লক্ষণ, লগ্নের ভালোমন্দ ফল। এইসমস্ত পরীক্ষিত এবং কল্পিত কথাগুলোকে সংক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, ছন্দে বাঁধতে হয়েছে, স্থায়িত্ব দেবার জন্যে। দেবতার স্তুতি, পৌরাণিক আখ্যান বহন করেছে ছন্দ। ছন্দ তাদের রক্ষা করেছে যেন পেটিকার মধ্যে। সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মানুষের শুধু খেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা বড়ো সৃষ্টি; আধুনিক কালে যেমন সৃষ্টি তার ছাপাখানা। ছন্দ তার সংস্কৃতির ধাত্রী, ছন্দ তার স্মৃতির ভাণ্ডারী।

চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার ও ঘুমপাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়। সাধুভাষী সাহিত্যমহলের বাইরে তাদের বসতি।[১] তারা যে সমস্তই প্রাচীন তা নয়। লক্ষণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় তাদের অনেক আছে যারা আমাদের সমান-বয়সেরই আধুনিক; এমন-কি, ছন্দে মিলে ভাবে আমাদেরই শাকরেদি সন্দেহ করি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই।

১ দ্রষ্টব্য: পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভাংশ ও পাদটীকা।

অচিন ডাকে নদীর বাঁকে
ডাক যে শোনা যায়।
অকূল পাড়ি থামতে নারি,
সদাই ধারা ধায়।
ধারার টানে তরী চলে,
ডাকের চোটে মন যে টলে,
টানাটানি ঘুচাও জগার[১],
হল বিষম দায়॥

এর মিল, এর মাজাঘষা ছাঁদ ও শব্দবিন্যাস আধুনিক। তবুও যেটা লক্ষ করবার বিষয় সে হচ্ছে এর চলতি ভাষা। চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ।[২] উপরের ঐ কবিতাকে সাধু ভাষার ছন্দে ঢালাই করলে তার চেহারা হয় নিম্নলিখিত মতো।—

অচিনের ডাকে নদীটির বাঁকে
ডাক যেন শোনা যায়।
কূলহীন পাড়ি থামিতে না পারি,
নিশিদিন ধারা ধায়।
সে ধারার টানে তরীখানি চলে,
সেই ডাক শুনে মন মোর টলে,
এই টানাটানি ঘুচাও জগার,
হয়েছে বিষম দায়॥

যদি উচ্চারণ মেনে বানান করা যেত তা হলে বাউলের গানের চেহারা হত

অচিণ্ডাকে নদীর্বাঁকে ডাক্‌যে শোনা যায়।

সাধু ভাষার কবিতায় বাংলা শব্দের হসন্তরীতি যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু

১ জগা কৈবর্ত। দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বাংলাকাব্য-পরিচয়', পৃ ৬৮
২ দ্রষ্টব্য: পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষাংশ ও পাদটীকা।

তাদের পরস্পরকে ঠোকাঠুকি ঘেঁষাঘেঁষি করতে দেওয়া হয় না। বাউলের গানে আছে 'ডাকের চোটে মন যে টলে'। এখানে 'ডাকের' আর 'চোটে', 'মন' আর 'যে' এদের মধ্যে উচ্চারণের কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু সাধু ভাষার গানে 'মন' আর 'মোর' হসন্ত শব্দ হলেও হসন্ত শব্দের স্বভাব রক্ষা করে না, সন্ধির নিয়মে পরস্পর এঁটে যায় না।[১]

বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো ছন্দ পয়ারের ছাঁদের, অর্থাৎ 'দুই' সংখ্যার ওজনে। যেমন্—

খনা ডেকে বলে যান,
রোদে ধান ছায়ায় পান।
দিনে রোদ রাতে জল,
তাতে বাড়ে ধানের বল॥

এমনি করে হতে হতে ছন্দের মধ্যে এসে পড়ে তিনের মাত্রা। যেমন—

আনহি বসত আনহি চাষ,
বলে ডাক তাহার বিনাশ।

কিংবা

আষাঢ়ে কাড়ান নামকে,
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে।
ভাদরে কাড়ান শিষকে,
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে॥

এর অর্থ বোঝাবার দায়িত্ব নিতে পারব না।

দুই মাত্রার ছড়ার ছন্দ পরিণত রূপ নিয়েছে পয়ারে। বাঙালি বহুকাল ধরে এই ছন্দে গেয়ে এসেছে রামায়ণ মহাভারত একটানা সুরে। এই ছন্দে প্রবাহিত প্রাদেশিক পুরাণকাহিনী রঙিয়েছে বাঙালির হৃদয়কে। দারিদ্র্য ছিল তার জীবনযাত্রায়, তার ভাগ্যদেবতা ছিল অত্যাচারপরায়ণ, সে এমন নৌকোয় ভাসছিল যার হাল ছিল না তার নিজের হাতে; যখন তার আকাশ থাকত শান্ত তখন গ্রামের এঘাটে-ওঘাটে চলত তার আনাগোনা সামান্য কারবার

---

১ দ্রষ্টব্য : পরবর্তী 'সতত হে নদ তুমি' এবং 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ইত্যাদি দুটি দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণপ্রণালী এবং পাদটীকা।

নিয়ে; কখনো বা দিনের পর দিন দুর্যোগ লেগেই থাকত, ভাগ্যের অনিশ্চয়তায় হঠাৎ কে কোথায় পৌঁছয় তার ঠিক ছিল না, হঠাৎ নৌকোসুদ্ধ হত ভরাডুবি। এরা ছড়া বাঁধে নি নিজের কোনো স্মরণীয় ইতিহাস নিয়ে। এরা গান বাঁধে নি ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনায়। এরা নিঃসন্দেহই ভালোবেসেছে, কিন্তু নিজের জবানিতে প্রকাশ করে নি তার হাসি-কান্না। দেবতার চরিত্রবৃত্তান্তে এরা ঢেলেছে এদের অন্তরের আবেগ; হরপার্বতীর লীলায় এরা নিজের গৃহস্থালির রূপ ফুটিয়েছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানে এরা সেই প্রেমের কল্পনাকে মনের মধ্যে ঢেউ লাগিয়েছে যে প্রেম সমাজবন্ধনে বন্দী নয়, যে প্রেম শ্রেয়োবুদ্ধিবিচারের বাইরে। একমাত্র কাহিনী ছিল রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন করে, যা মানবচরিত্রের নতোন্নতকে নিয়ে হিমালয়ের মতো ছিল দিক্ থেকে দিগন্তরে প্রসারিত। কিন্তু সে হিমালয় বাংলা দেশের উত্তরতম সীমার দূর গিরিমালার মতোই; তার অভ্রভেদী মহত্ত্বের কঠিনমূর্তি সমতল বাংলার রসাতিশয্যের সঙ্গে মেলে না। তা বিশেষভাবে বাংলার নয়, সনাতন ভারতের। অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে কবিকঙ্কণের সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা করলে উভয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে। অন্নদামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল বাংলার, তাতে মনুষ্যত্বের বীর্য প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে অকিঞ্চিৎকর প্রাত্যহিকতার অনুজ্জ্বল জীবনযাত্রা।

এই কাব্যের পণ্য ভেসেছিল পয়ার ছন্দে। ভাঙাচোরা ছিল এর পদবিন্যাস। গানের সুর দিয়ে এর অসমানতা মিলিয়ে দেওয়া হত, দরকার হত না অক্ষর সাজাবার কাজে সতর্ক হবার। পুরোনো কাব্যের পুঁথি দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। অত্যন্ত উঁচুনিচু তার পথ। ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌষম্যের নিয়মে বেঁধেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় পণ্ডিত। ভাষাবিন্যাসে ছন্দে প্রাদেশিকতার শৈথিল্য তিনি মানতে পারেন নি।

পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীতে।[১] তার একটা কারণ এগুলি একটানা গল্প নয়। এই পদগুলিতে

১ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগে 'কেন তোরে আনমন দেখি' ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত লেগেছে। দোলায়িত হয়েছে সেই আবেগ তিন মাত্রার ছন্দে। দ্বৈমাত্রিক এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনো পর্যন্ত ঐ দুই জাতের মাত্রাকে নানাপ্রকারে সাজিয়ে বাংলায় ছন্দের লীলা চলছে। আর আছে দুই এবং তিনের জোড়-বিজোড় সংখ্যা মিলিয়ে পাঁচ কিংবা নয়ের অসমমাত্রার ছন্দ।

মোট কথা বলা যায় দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলার সকল ছন্দের মূলে।[১] তার রূপের বৈচিত্র্য ঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে এবং নানা ওজনের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসে। এইরকম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পঙ্‌ক্তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলি বেড়ে চলেছে।

একসময়ে শ্রেণীবদ্ধ মাত্রা গুনে ছন্দ-নির্ণয় হত। বালকবয়সে একদিন সেই চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে ছেলেমানুষি পয়ার রচনা করে নিজের কৃতিত্বে বিস্মিত হয়েছিলুম।[২] তার পরে দেখা গেল কেবল অক্ষর গণনা করে যে ছন্দ তৈরি হয় তার শিল্পকলা আদিম জাতের। পদের নানা ভাগ আর মাত্রার নানা সংখ্যা দিয়ে ছন্দের বিচিত্র অলংকৃতি। অনেক সময়ে ছন্দের নৈপুণ্য কাব্যের মর্যাদা ছাড়িয়ে যায়।

চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্তসংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। সেটা পয়ার হলেও অক্ষরগোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রাগোনা পয়ার। কিন্তু কথাটা ঠিক হল না, বস্তুত সাধু ভাষার পয়ারও মাত্রাগোনা। সাহিত্যিক কবুলতিপত্রে সাধু ভাষায় অক্ষর এবং মাত্রা এক পরিমাণের বলে গণ্য হয়েছে। এইমাত্র রফা হয়েছে যে, সাধু ভাষার পদ্য উচ্চারণকালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না, অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।—

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে।...
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে॥[৩]

১ তুলনীয়: 'ধ্বনির দুই মাত্রা এবং তিন মাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান।' —'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগে 'আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি' ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

২ দ্রষ্টব্য: 'জীবনস্মৃতি', কবিতা-রচনারম্ভ।

৩ মধুসূদন: 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', কপোতাক্ষ নদ।

চলতি বাংলায় 'নদ' আর 'তুমি', 'মোর' আর 'মনে' হসন্তের বাঁধনে বাঁধা। এই পয়ারে ঐ শব্দগুলিকে হসন্ত বলে যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু ওর বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়েছে। 'কান' আর 'আমি', 'ভ্রান্তির' আর 'ছলনে' হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুক্তশব্দ, কিন্তু সাধু ছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাঁধতে বাধা দেওয়া হয়েছে।[১] একটা খাঁটি ছড়ার নমুনা দেখা যাক।

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর।[২]

এটা পয়ার, কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না।

এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন্‌শিবু সদাগর।[৩]

ছড়ায় প্রায় দেখা যায় মাত্রার ঘনতা কোথাও কম কোথাও বেশি, আবৃত্তিকারের উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে তার তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজনমতো স্বর বাড়ায় কমায়।

শিবু ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান

এখানে 'বিয়ে হবে' শব্দে মাত্রা ঢিলে হয়ে গেছে। যদি থাকত

শিবু ঠাকুরের বিয়ের সভায় তিন কন্যে দান

তা হলে মাত্রা পুরো হত। কিন্তু বাংলা দেশে ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই যে আপনিই 'বিয়ে- হবে-' স্বরে টান না দেয়।[৪]

১ দ্রষ্টব্য : পূর্ববর্তী 'সাধু ভাষার কবিতায়' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ এবং 'মহাভারতের কথা' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের ছন্দোবিশ্লেষণপ্রণালী—'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১'।

২ 'লোকসাহিত্য', ছেলেভুলানো ছড়া।

৩ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' প্রবন্ধের 'মন বেচারির কি দোষ আছে' ও পূর্ববর্তী 'অচিন ডাকে নদীর বাঁকে' ইত্যাদি দুটি দৃষ্টান্তের ছন্দোবিশ্লেষণপ্রণালী।

৪ দ্রষ্টব্য : 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' এবং 'মা আমায় ঘুরাবি কত' ইত্যাদি দুটি দৃষ্টান্তের ছন্দোবিশ্লেষণপ্রণালী—'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১'।

বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস,
তাহার অধিক ধলো, কন্তে, তোমার হাতের শঙ্খ।[১]

দুটো লাইনের মাত্রার কমি-বেশি স্পষ্ট; কিন্তু ভয়ের কারণ নেই, স্বতই আবৃত্তির টানে দুটো লাইনের ওজন মিলে যায়। ছন্দে চলতি ভাষা আইনজারি না করেও আইন মানিয়ে নিতে পারে।

'বাংলাভাষা-পরিচয়' (কার্তিক ১৩৪৫) : অধ্যায় ১১ (অংশ)

অনুষঙ্গ ২

পত্রধারা : দুই

১

ছান্দসিক ও ছন্দরসিক

১৩৩৯ মাঘ ১৩

ছন্দ সম্বন্ধে তুমি অতিমাত্র সচেতন হয়ে উঠেছ। শুধু তাই নয়, কোনো মতে নতুন ছন্দ তৈরি করাকে তুমি বিশেষ সার্থকতা বলে কল্পনা কর। আশা করি এই অবস্থা একদিন তুমি কাটিয়ে উঠবে এবং ছন্দ সম্বন্ধে একেবারেই সহজ হবে তোমার মন। আজ তুমি ভাগবিভাগ করে ছন্দ যাচাই করছ, প্রাণের পরীক্ষা চলছে দেহব্যবচ্ছেদ করে। যারা ছান্দসিক তাদের উপর এই কাটাছেঁড়ার ভার দাও, তুমি যদি ছন্দরসিক হও তবে ছুরিকাঁচি ফেলে দিয়ে কানের পথ খোলসা রাখ যেখান দিয়ে বাঁশি মরমে প্রবেশ করে।[২]

গীতার একটা শ্লোকের আরম্ভ এই—

অপরং ভবতো জন্ম;

১ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে ধৃত 'জাদু, এতো বড় রঙ্গ' ইত্যাদি ছড়া। দ্রষ্টব্য 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগের শেষাংশে 'কাক কালো, কোকিল কালো' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ ও পাদটীকা।

২ তুলনীয় 'চণ্ডীদাসের গানে…মরমে পৌঁছত না।— 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ উপান্ত্য অনুচ্ছেদ, এবং 'বাহাদুরি নেবার জন্ত…অদ্ভুত মনে হয়।'—'আমার ছন্দের গতি' চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

ঠিক তার পরবর্তী শ্লোক—

বহূনি মে ব্যতীতানি।[১]

দ্বিতীয়টির সমান ওজনে প্রথমটি যদি লিখতে হয় তা হলে লেখা উচিত 'অপারং ভাবতো জন্ম'। কিন্তু যাঁরা এই ছন্দ[২] বানিয়েছিলেন তাঁরা ছান্দসিকের হাটে গিয়ে নিক্তি নিয়ে বসেন নি।

আমি যখন 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা' লিখেছিলুম তখন জানতুম কোনো কবির কানে খটকা লাগবে না, ছান্দসিকের কথা মনে ছিল না।[৩]

দিলীপকুমার রায়কে লেখা :
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি।

২

ছন্দ ও উচ্চারণরীতি ১

১৯৩৬ জুলাই ৬

ছন্দ নিয়ে যে কথাটা তুলেছ সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলি। বাংলার উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণভেদ নেই, সেইজন্যে বাংলা ছন্দে সেটা চালাতে গেলে কৃত্রিমতা আসেই।

। । । । । ।
হেসে হেসে হল যে অস্থির,

। । । । ।
মেয়েটা বুঝি ব্রাহ্মণ -বস্তির।[৪]

এটা জবরদস্তি। কিন্তু

১ 'গীতা', চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোক।

২ অনুষ্টুপ্ বক্ত্র ছন্দ। দ্রষ্টব্য : 'সংজ্ঞাপরিচয়'।

৩ দ্রষ্টব্য : পরবর্তী ২-সংখ্যক পত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা।

৪ এই দৃষ্টান্তটির দীর্ঘস্বরগুলি সংস্কৃত পদ্ধতিতে দ্বিমাত্রকরূপে উচ্চার্য। এর প্রতি পংক্তিতে আছে চার পর্ব এবং প্রতি পর্বে চার মাত্রা। দ্বিমাত্রক ধ্বনিগুলি দণ্ডচিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট।

হেসে কুটিকুটি এ কী দশা এর,
এ মেয়েটি বুঝি রায়মশায়ের।[১]

এর মধ্যে কোনো অত্যাচার নেই। রায়মশায়ের চঞ্চল মেয়েটির কাহিনী যদি বলে যাই লোকের মিষ্টি লাগবে। কিন্তু দীর্ঘে হ্রস্বে পা ফেলে চলেন যিনি, তাঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ চলে না। যেটা একেবারে প্রকৃতিবিরুদ্ধ তার নৈপুণ্যে কিছুক্ষণ বাহবা দেওয়া চলে, তার সঙ্গে ঘরকরা চলে না।[২]

'জনগণমনঅধিনায়ক'— ওটা যে গান। দ্বিতীয়ত সকল প্রদেশের কাছে যথাসম্ভব সুগম করবার জন্যে যথাসাধ্য সংস্কৃত শব্দ লাগিয়ে ওটাকে আমাদের পাড়া থেকে জয়দেবীয় পল্লীতে চালান-করে দেওয়া হয়েছে।[৩]

বাংলা শব্দে একসেন্ট্‌ দিয়ে বা ইংরেজি শব্দে না দিয়ে কিংবা সংস্কৃত কাব্যে দীর্ঘহ্রস্বকে বাংলার মতো সমভূম করে যদি রচনা করা যায় তবে কেবলমাত্র ছন্দকৌশলের খাতিরে সাহিত্যসমাজে তার নতুন মেলবন্ধন করা চলবে না। বিশেষত চিহ্ন উঁচিয়ে চোখে খোঁচা দিয়ে পড়াতে চেষ্টা করলে পাঠকদের প্রতি অসৌজন্য করা হয়।

| | | |
Autumn flaunteth in his bushy bowers

এতে একটা ছন্দের সূচনা থাকতে পারে, কিন্তু সেইটেই কি যথেষ্ট? অথবা

| | | |
সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চুড়ামণি বীরবাহু।

১ এই দৃষ্টান্তের দীর্ঘস্বরগুলিও বাংলা পদ্ধতিতে হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রিক রূপেই উচ্চার্য। এটির প্রতি পংক্তিতে আছে দুই পর্ব এবং প্রতি পর্বে ছয় মাত্রা।

২ দ্রষ্টব্য 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগে 'Equality, Fraternity' ইত্যাদি দুটি অনুচ্ছেদ, 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগে 'একদিন তৎকালপ্রচলিত' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ এবং 'আমার ছন্দের গতি' চতুর্থ অনুচ্ছেদ শেষাংশ।

৩ এই পর্যন্ত প্রকাশিত— 'চলার পথে' পত্রিকা ১৩৩৫ ফাল্গুন : 'চিঠি' (শেষাংশ) এবং দিলীপকুমারের 'তীর্থংকর' গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫১) 'রবীন্দ্রনাথের পত্রমর্মর' বিভাগ, পৃ ২০৮।

'জনগণমন' গানের ছন্দপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১' ষষ্ঠ প্রসঙ্গ প্রথমাংশ ও পাদটীকা এবং 'সঞ্চয়িতা' কাব্যসংকলনের গ্রন্থপরিচয় বিভাগে 'ভারতবিধাতা' রচনাটির 'ছন্দপরিচয়' অংশ।

এক্‌সেন্‌ট্‌এর তাড়ায় ধাক্কা মেরে চালালে এইরকম লাইনের আলস্য ভেঙে দেওয়া যায় যদি মানি, তবু আর কিছু মানবার নেই কি ?

দিলীপকুমার রায়কে লেখা

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি, 'চলার পথে' পত্রিকা ১৩৪৫ ফাল্গুন এবং দিলীপকুমারের 'তীর্থংকর' গ্রন্থের (১৩৫১) 'রবীন্দ্রনাথের পত্রমর্মর' বিভাগ, পৃ ২০৮।

৩

ছন্দ ও উচ্চারণরীতি ২

১৯৩৬ জুলাই ৮

'দীর্ঘহ্রস্ব' ছন্দ সম্বন্ধে আর-একবার বলি। ও এক বিশেষ ধরনের লেখায় বিশেষ ভাষারীতিতেই চলতে পারে। আকবর বাদশার যোধপুরী মহিষীর জন্যে তিনি মহল বানিয়েছিলেন স্বতন্ত্র, সমগ্র প্রাসাদের মধ্যে সে আপন জাত বাঁচিয়ে নির্লিপ্ত ছিল। বাংলার উচ্চারণরীতিকে মেনে চলে যে ছন্দ, তার চলাফেরা সাহিত্যের সর্বত্র, কোনো গণ্ডির মধ্যে নয়। তা পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকল পাঠকের পক্ষেই সুগম। তুমি বলতে পার সকল কবিতাই সকলের পক্ষে সুগম হবেই এমনতরো কবুলতিনামায় লেখককে সই দিতে বাধ্য করতে পারি নে। সে তর্ক খাটে ভাবের দিক্ থেকে চিন্তার দিক্ থেকে, কিন্তু ভাষার সর্বজনীন উচ্চারণরীতির দিক্ থেকে নয়। তুমি বেলের শরবতই কর দইএর শরবতই কর, মূল উপাদান জলটা সাধারণ জল, ভাষার উচ্চারণটাও সেইরকম। My heart aches— কোনো ধ্বনিসৌষ্ঠবের খাতিরেই বা বাঙালির অভ্যাসের অনুরোধে heartএর আ এবং achesএর এ-কে হ্রস্ব করা চলবে না। এই কারণে বাংলায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দ চালাতে গেলে দীর্ঘ স্বরধ্বনির জায়গায় যুক্তবর্ণের ধ্বনি দিতে হয়। সেটার জন্যে বাংলা ভাষা ও পাঠককে সর্বদা ঠেলা মারতে হয় না। অথবা দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রার মূল্য দিলেও চলে।[১] যদি লিখতে

১ তুলনীয় বাংলায় সেই…দাঁড় করানো যেতে পারে।— 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায় শেষাংশ।

হে অমল চন্দনগন্ধিত, তনু রঞ্জিত
হিমানীতে সিঞ্চিত স্বর্ণ।[১]

তা হলে চতুষ্পাঠীর বহির্বর্তী পাঠকের দুশ্চিন্তা ঘটাত না।

দিলীপকুমার রায়কে লেখা :
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

বাংলা প্রাকৃত ছন্দের মাত্রাবিচার

১৯৩৬ জুলাই ২৫

বাংলায় প্রাক্‌হসন্ত স্বর দীর্ঘায়িত হয় এ কথা বলেছি। জল এবং জলা, এই দুটো শব্দের মাত্রাসংখ্যা সমান নয়।[২] এইজন্যেই 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে' পদটাকে ত্রৈমাত্রিক বলেছি।[৩] টু-মু দুই সিলেব্‌ল্, পরবর্তী হসন্ত স্-ও এক সিলেব্‌ল্-এর মাত্রা নিয়েছে পূর্ববর্তী উ স্বরকে সহজেই দীর্ঘ করে। 'টুমু-টুমু বাজা বাজে' এবং 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে' এক ছন্দ নয়। 'রণিয়া রণিয়া বাজিছে বাজনা' এবং 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে' এক ওজনের ছন্দ। দুটোই ত্রৈমাত্রিক। আমি প্রচলিত ছড়ার দৃষ্টান্তও দেখিয়েছি।[৪]

দিলীপকুমার রায়কে লেখা :
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি এবং দিলীপকুমারের 'তীর্থংকর' গ্রন্থ (১৩৫১), 'রবীন্দ্রনাথের পত্রমর্মর' বিভাগ, পৃ ২১১।

১ এ ছন্দটি জয়দেবের

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস

ইত্যাদি গানটির (গীতগোবিন্দ, প্রথম সর্গ, দ্বিতীয় গীত) অনুসরণে রচিত।

২ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' চতুর্থ পর্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা।

৩ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগ শেষাংশ।

৪ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগের শেষাংশে 'কাক কালো, কোকিল কালো' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ ও পাদটীকা।

ছন্দোহার১

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত

১

ভাবি নব নব বাণী
যতনে গেঁথে আনি
ছন্দোহারখানি
দিব গলে।
ভয়ে ভয়ে অবশেষে
তোমার কাছে এসে
কথা যে যায় ভেসে
আঁখিজলে॥

—মন্দাক্রান্তা

২

কোনো এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবাকাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা,
তাই দেবতার শাপে
অস্তগত হল
মহিমা-সম্পদ্‌
যত কিছু।
কান্তাবিরহগুরু
দুঃখদিনগুলি
বর্ষকাল তরে
যাপে একা,

স্নিগ্ধপাদপছায়া
　　সীতার স্নানজলে
　　　　পুণ্য রামগিরি
　　　　　　-আশ্রমে ॥[1]

—মন্দাক্রান্তা

৩

ডাকিল কি তবে
　　মধু বাঁশরিরবে,
　　　　একেলা যবে
বিজন নদীপুলিনে
　　　　ছিনু বসে।
কেন এত ত্বরা,—
　　হল না ঘটভরা,
　　　　　　মনভ্রমরা
অজানা দূর-বিপিনে
　　　　উড়িল সে ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত

৪

ভেঙে ভেঙে পড়িছে পা চলে যেতে
　　নবদল ধানক্ষেতে,
　　　　বসন শিশিরে ভিজিল।
নবারুণরাগ গিরিশিখরে
　　ঘনছায়াময় বনের 'পরে
　　　　কি শোভা সৃজিল ॥

—পথ্যাগীতি ?

১ এই দৃষ্টান্তটি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ। এই অনুবাদে সংস্কৃত অমিত্রাক্ষর রীতি অনুসৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : 'বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দ' শেষাংশ ও পাদটীকা।

৫

নয়ন-অতিথিরে
শিমুল দিল ডালি ;—
নাসিকা-প্রতিবেশী
তা নিয়ে দেয় গালি।
সে জানে গুণ শুধু
প্রমাণ হয় ঘ্রাণে,—
রং যে লাগে রূপে
সে কথা নাহি জানে ॥[১]

—প্রতি পর্বে সাত কলামাত্রা

৬

বিশ্বের সৃষ্টিতে
যে বিধাতা শিল্পী ও কবি,
রসিকের দৃষ্টিতে
গাঁথিছেন কাব্য ও ছবি।
তোমাদের সংসারখানি
যুগলের চিত্তের
সংগীত-নৃত্যের
রচি দিক শিল্প ও বাণী ॥

—প্রতি পর্বে চার কলামাত্রা

৭

মোহন কণ্ঠ সুরের ধারায় যখন বাজে
বাহির-ভুবন তখন হারায় গহন-মাঝে।

১ এই দৃষ্টান্তটির পরিমার্জিত রূপ ('শিমুল রাঙা রঙে' ইত্যাদি) দ্রষ্টব্য 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের চতুর্থ বিভাগে।

বিশ্ব তখন নিজেরে ভুলায়,[১]
আকাশের বাণী ধরার ধুলায়
ধরে অপরূপ নব নব কায়
নবীন সাজে ॥

—প্রতি পর্বে ছয় কলামাত্রা

৮

পৌর্ণমাসী উচ্চ হাসি
কয় তারাকে—
আজকে কেন আর দেখি নে
পথহারাকে।
আপন দীপে অন্ধকারে
পাও না বাধা,
আমার দীপে চক্ষে লাগে
আলোর ধাঁধা ॥

—প্রতি পর্বে চার দলমাত্রা ও পাঁচ কলামাত্রা

৯

দূরের মানুষ কাছের হলেই
নতুন প্রাণের খেলা।
নতুন হাওয়ায় নতুন ঋতুর
ফুলের বসায় মেলা ॥

—প্রতি পর্বে চার দলমাত্রা ও ছয় কলামাত্রা

১০

প্রাণধারণের প্রবল ইচ্ছা থেকে
আমার বাঁধন ছাড়িয়ে থাকো যদি,

১ বর্তমান পাঠ রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পাঠের (১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি) অনুরূপ। বিশ্বভারতী পত্রিকায় (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯, পৃ ৪) প্রকাশকালে এই লাইনটা অনবধানতাবশতঃ স্থাপিত হয়েছে পরবর্তী লাইনের নীচে।

গেলেম আমি রেখে

পায়ে তোমার প্রণাম নিরবধি।

বাঁচবে না কেউ নিত্যকালের তরে,

মরল যে জন ফিরবে না আর ঘরে,

যাত্রা-অন্তে মিলবে সাগর 'পরে

যতই দীর্ঘ হোক না ক্লান্ত নদী ॥

তখন সূর্য কিংবা রাতের তারা

ভাঙিয়ে স্বপন চাইবে না আর ফিরে—

মত্তমুখর ঝরনাজলের ধারা

গর্জনে আর চেতন করবে কি রে?

শীতের কিংবা চৈত্রেরি পল্লবে

নতুন ঋতুর বার্তা কি আর কবে,

অন্তবিহীন নিদ্রা কেবল রবে

অনন্ত রাত্তিরে?

—প্রতি পর্বে চার দলমাত্রা

ছন্দের নিয়ম ও রসতত্ত্ব

পয়ারে চোদ্দো অক্ষরের নড়চড় হইবার জো নাই, তাহার ভাষা ছন্দ ও অর্থের সুবিহিত সুসংগতি আছে। কিন্তু আমরা যদি পয়ারে কেবল চোদ্দো অক্ষরই দেখিতাম অথবা কেবলই প্রত্যেক শব্দের ও পদের সহিত একটা যুক্তিসংগত অর্থ আছে ইহাই জানিতাম তবে তাহাকে কাব্যই বলিতাম না। কিন্তু কাব্যের সমস্ত অটল অমোঘ স্খলনহীন নিয়মের ভিতর দিয়াই তাহার গভীরতম সৌন্দর্য ও সংগীত, কাব্যকর্তার অন্তরতম আনন্দ ও প্রেম প্রকাশ পাইতেছে, সেইজন্যই তাহা কাব্য। আলংকারিক তাহার মধ্যে অলংকারশাস্ত্রের নিয়ম দেখিয়া বাহবা দেয়, বৈয়াকরণ তাহার মধ্যে ব্যাকরণের সূত্র ঠিকমত বজায় আছে দেখিয়া পুলকিত হয়, অভিধানবাগীশ তাহার শব্দ ও অর্থের সংগতি দেখিয়া খুশি হইয়া নস্য লইতে থাকে। কিন্তু সমস্ত নিয়ম ও সংগতির ভিতর হইতে নিয়ম ও সংগতির অতীত আনন্দ তাহারাই দেখে যাহারা রসিক। তাহারা ইহার মধ্যে কবির নিয়মনৈপুণ্য দেখে না, কবির আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে। তাহারা যখন জগৎকে দেখে তখন বৈজ্ঞানিকের মতো কেবল সত্যকেই দেখে না, দার্শনিকের মতো চিত্তকেও দেখে, এবং কবির মতো আনন্দকে দেখে। কারণ তাহার নিজের মধ্যে সত্য আছে, চিত্ত আছে, আনন্দ আছে; তাহার মধ্যে কার্যকারণশৃঙ্খলসংগত নিয়মবন্ধনও আছে, চেতনাময় গতিশক্তিও আছে এবং আনন্দময় মুক্তির অনুভূতিও আছে। জগতের মধ্যে যখন সে এই তিনের যোগ দেখে তখনি সচ্চিদানন্দকে দেখে, এবং তখনি তাহার দেখা সম্পূর্ণ হয়। নতুবা যখন একটাকে দেখে অন্যটাকে দেখে না তখনই তো সে বিদ্রোহ করে, অহংকার করে, তর্ক করিতে থাকে এবং নীরস হইয়া মরে। আনন্দ আছে অতএব নিয়ম নাই এ কথা যেমন মিথ্যা, নিয়ম আছে অতএব আনন্দ নাই এ কথাও তেমনি মিথ্যা। আনন্দ হইতেই নিয়ম হইয়াছে, নতুবা নিয়ম আমাদিগকে জর্জরিত করিত। নিয়মের মধ্য দিয়াই আনন্দ প্রকাশ পায়, নতুবা জগতে কোথাও আমরা সৌন্দর্য দেখিতাম না, প্রেম উপলব্ধি করিতাম না।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র : ৮ কার্তিক ১৩১৭;
তাঁর 'স্মৃতি' গ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৪৮) সংকলিত। মূলপত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

বাংলা বানান ও ছন্দ

আমাদের এই যে দেশকে মুসলমানেরা 'বাঙ্গালা' বলিতেন তাহার নামটি বর্তমানে আমরা কিরূপ বানান করিয়া লিখিব, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় চৈত্রের প্রবাসীতে তার আলোচনা করিয়াছেন। আমি মনে করি এর জবাবদিহি আমার। কেননা আমিই প্রথমে 'বাংলা' এই বানান ব্যবহার করিয়াছিলাম।

আমার কোনো কোনো পদ্য রচনায় যুক্ত অক্ষরকে যখন দুই মাত্রা হিসাবে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম[১] তখনই প্রথম বানান সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক হইতে হইয়াছিল। 'ঙ্গ' অক্ষরটি যুক্ত অক্ষর, উহার পুরা আওয়াজ আদায় করিতে হইলে এক মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। সেটা আমার ছন্দের পক্ষে যদি আবশ্যক হয় তো ভালোই, যদি না হয় তবে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

এক-একটি অক্ষর প্রধানত এক-একটি আওয়াজের পরিচয়, শব্দতত্ত্বের নহে। সেটা বিশেষ করিয়া অনুভব করা যায় ছন্দ রচনায়। শব্দতত্ত্ব অনুসারে লিখিব এক, আর ব্যবহার অনুসারে উচ্চারণ করিব আর, এটা ছন্দ পড়িবার পক্ষে বড়ো অসুবিধা। যেখানে যুক্ত অক্ষরেই ছন্দের আকাঙ্ক্ষা, সেখানে যুক্ত অক্ষর লিখিলে পড়িবার সময় পাঠকের কোনো সংশয় থাকে না। যদি লেখা যায়—

বাঙ্গলা দেশে জন্মেছ বলে
বাঙ্গালী নহ তুমি;
সন্তান হতে সাধনা করিলে
লভিবে জন্মভূমি।

তবে আমি পাঠকের নিকট 'ঙ্গ' যুক্ত অক্ষরের পুরা আওয়াজ দাবি করিব। অর্থাৎ এখানে মাত্রাগণনায় 'বাঙ্গলা' শব্দ হইতে চার মাত্রার হিসাব চাই। কিন্তু যখন লিখিব "বাংলার মাটি বাংলার জল" তখন উক্ত বানানের দ্বারা কবির এই প্রার্থনা প্রকাশ পায় যে, 'বাংলা' শব্দের উপর পাঠক যেন তিন মাত্রার অতিরিক্ত নিশ্বাস খরচ না করেন। "বাঙ্গলার মাটি" যথারীতি পড়িলে এইখানে ছন্দ মাটি হয়।

ঝিঙা না ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙ্গা
ছন্দ তখনি ফুঁকিবে শিঙ্গা।

এই গেল ছন্দব্যবসায়ী কবির কৈফিয়ত।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৩: 'বাংলা বানান' (অংশ)

---

১ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর' এবং বিভিন্ন রচনায় 'মানসী' কাব্যের প্রসঙ্গ।

গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ

প্রথম পর্যায়

গদ্য ও পদ্যের চাল

গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের। এই নাচের গতির প্রত্যেক অংশের মধ্যে সুসংগতি থাকা চাই। যদি কোনো গতির মধ্যে নাচের ধরনটা থাকে অথচ সুসংগতি না থাকে তবে সেটা চলাও হবে না, নাচও হবে না, হবে খোঁড়ার চাল অথবা লম্ফঝম্প। কোনো ছন্দে বাঁধন বেশি কোনো ছন্দে বাঁধন কম, তবু ছন্দমাত্রের অন্তরে একটা ওজন আছে। সেটার অভাব ঘটলে যে টলমলে ব্যাপার দাঁড়ায় তাকে বলা যেতে পারে মাতালের চাল। তাতে সুবিধাও নেই, সৌন্দর্যও নেই।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত পত্র : ২২ জুলাই ১৯৩২;
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ফোটো-প্রতিলিপি

দ্বিতীয় পর্যায়

গদ্যরীতির প্রবর্তন

গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্য-ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তার পরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।[১] আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে

১ দ্রষ্টব্য : 'পাহাড়িয়া' নামক চারটি গদ্যকবিতা : বিচিত্রা, শ্রাবণ-কার্তিক ১৩৩৪

এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্য তাতে পরিমাণরক্ষা হয় নি। আর-একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

এই উপলক্ষে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্য ছন্দ আছে; কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি।[১] যেমন— তরে, সনে, মোর প্রভৃতি যেসকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এইসকল কবিতায় স্থান দিই নি।

'পুনশ্চ' (প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৩৯): 'ভূমিকা'

তৃতীয় পর্যায়

'পুনশ্চ' কাব্যের গদ্যরীতি

১

যখন কবিতাগুলি পড়বে তখন পূর্বাভ্যাস মতো মনে কোরো না ওগুলো পদ্য। অনেকে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে রুষ্ট হয়ে ওঠে। গদ্যের প্রতি গদ্যের সম্মান রক্ষা করে চলা উচিত। পুরুষকে সুন্দরী রমণীর মতো ব্যবহার করলে

১ কোমল গান্ধার, শালিখ, অস্থানে, ঘরছাড়া, ছুটি, গানের বাসা, পয়লা আশ্বিন, এই সাতটি কবিতায় মিল নেই, চলতি রীতির ছন্দ আছে। 'মৃত্যু' কবিতায় আছে সাধু রীতির ছন্দ, আর 'খেলনার মুক্তি' প্রভৃতি যে ছয়টি কবিতা 'পরিশেষ' থেকে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হয়েছে সেগুলিতেও তাই। এই সাতটি কবিতায় সাধু ছন্দোরীতি ব্যবহৃত হলেও সাধু ভাষারীতি ব্যবহৃত হয় নি— সাধু রীতির ছন্দে হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ ছাড়া এই কাব্যের অনেক কবিতাই অন্নবিস্তর ছন্দঘেঁষা, আগাগোড়া ছন্দ রক্ষিত না হলেও নানাস্থানেই কিছু কিছু ছন্দ এসে পড়েছে।

তার মর্যাদাহানি হয়। পুরুষেরও সৌন্দর্য আছে, সে মেয়ের সৌন্দর্য নয়— এই সহজ কথাটা বলবার প্রয়াস পেয়েছি পরবর্তী পাতাগুলিতে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উপহৃত 'পুনশ্চ' কাব্যের একটি কপিতে লিখিত মন্তব্য (২৬ আশ্বিন ১৩৩৯); রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি।

২

'পুনশ্চ'র কবিতাগুলোকে কোন্ সংজ্ঞা দেবে? পদ্য নয়, কারণ পদ নেই। গদ্য বললে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। পক্ষিরাজ ঘোড়াকে পাখি বলবে, না ঘোড়া বলবে? গদ্যের পাখা উঠেছে এ কথা যদি বলি তবে শত্রুপক্ষ বলে বসবে, 'পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে'। জলে স্থলে যে সাহিত্য বিভক্ত, সেই সাহিত্যে এ জিনিসটা জল নয়, তাই বলে মাটিও নয়। তা হলে খনিজ বলতে দোষ আছে কি? সোনা বলতে পারি এমন অহংকার যদি-বা মনে থাকে, মুখে বলবার সাহস নেই। না হয় তাঁবাই হল। অর্থাৎ এমন কোনো ধাতু যাতে মূর্তিগড়ার কাজ চলে। গদাধরের মূর্তিও হতে পারে, তিলোত্তমারও হয়। অর্থাৎ রূপরসাত্মক গদ্য, অর্থ ভারবহ গদ্য নয়। তৈজস গদ্য।

সংজ্ঞা পরে হবে, আপাতত প্রশ্ন এই— ওতে চেহারা গড়ে উঠেছে কি না। যদি উঠে থাকে তা হলেই হল।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র: কার্তিক ৭ ১৩৩৯;
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি।

৩

গানের আলাপের সঙ্গে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকা-রীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয় নি। কেননা আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্ম-বিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের

সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে, "যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব"। বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাক্ -এর একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি, মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয়, যখন "এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান"। যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে এ কথা অজীর্ণরোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূলখাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধি-ভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলংকৃত করা হয় না। তা হোক, পাশেই আছেন কাঁকনপরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্ছেন। নিজের রচনা নিয়ে অহংকার করছি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্ছে না; তার যেটি আদর্শ, এই চিঠিতে তারি আলোচনা চলছে। বক্ষ্যমাণ কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ -সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহসভায় চন্দনচর্চিত বর-কনে টোপর মাথায় আলপনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুত পড়ে চলেছে মন্ত্র, ও দিকে আকাশ থেকে আসছে সাহানা রাগিণীতে সানাইএর সংগীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেছে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট। মিশ্রিত ছন্দওয়ালা কাব্যে সেই সানাই-বাজনা সেই মন্ত্রপড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা,

ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সম্ভ-মিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সমস্তে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারো মাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত সাহানা-সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ-অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হল কিন্তু বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে সাহানা রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন-কি, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্তশ্রুত কড়া সুরও না-মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না-মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি-বেনারসিটা তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদ্‌জনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে। এমন-কি, বাম দিক্‌ থেকে রুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশ-ভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধারীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই অথচ সংসারযাত্রা আছে এমনও ঘটে। কিন্তু সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না, তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না, সে কেবল লোকভয়ে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তনস্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন-কি হনুমানের চরিত্রকেও বাদ দেওয়া চলবে না। কিন্তু সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রঙফলানো চওড়া বলেই লোকে ঐটের দিকে তাকিয়ে হায় হায়

করে। ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে 'উত্তররামচরিত' রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ঐ দেখো, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই —কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিকে অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সবসময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চার দিক্ বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাইবা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর, বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মাল-মসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে।[১] সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি শাড়ির প্রান্ত তুলে-ধরা আধাঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত। আরো একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না, এমন পণ করি নি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ঐ পর্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে

---

১ দ্রষ্টব্য: 'গদ্যছন্দের স্বরূপ' প্রথম পর্যায় উপান্ত্য অনুচ্ছেদ শেষাংশ।

আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারি নে। যাঁরা দৈবদুর্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারি বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দিনের পূর্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো।

এর পরে মন্ত্রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরোবে, তার নাম 'বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে, আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র : ১৩৩৯ দেওয়ালি [কার্তিক ১২] ; পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪০ : 'পুনশ্চ' ; সাহিত্যের স্বরূপ (১৩৫০) : 'কাব্যে গদ্যরীতি ১'।

গদ্যছন্দ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত (১৯৩৩ শেষভাগ)

কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন সে কেবলমাত্র আপন অর্থটুকু নিবেদন করে। যখন তাকে ছন্দের আঘাতে নাড়া দেওয়া যায় তখন তার কাছ থেকে অর্থের বেশি আরো কিছু বেরিয়ে পড়ে। সেটা জানার জিনিস নয়, বেদনার জিনিস। সেটাতে পদার্থের পরিচয় নয়, রসের সম্ভোগ।[1]

আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ ; সে চলে, চালায়। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখন স্পন্দিত হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার সাধর্ম্য ঘটে।

চলতি ভাষায় আমরা বলি কথাকে ছন্দে বাঁধা। বাঁধা বটে, কিন্তু সে বাঁধন বাইরে, রূপের দিকে ; ভাবের দিকে মুক্তি। যেমন সেতারে তার বাঁধা, তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ সেই সেতারের বাঁধা তার, সুরের বেগে কথাকে অন্তরে দেয় মুক্তি।

উপনিষদে আছে আত্মার লক্ষ্য ব্রহ্ম, ওংকারের ধ্বনিবেগ তাকে ধনুর মতো

১ এই পঙ্‌ক্তি কয়টি অনেকাংশে 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধের গোড়ার কথাগুলির অনুরূপ। প্রথম বাক্যটি সম্বন্ধে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। এতে বলা হচ্ছে বাক্যের দ্বারা যুক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জানবার বিষয় নন, তিনি আত্মার সঙ্গে একাত্ম হবার বিষয়। এই উপলব্ধিতে ধ্বনিই সহায়তা করে, শব্দার্থ করে না।

জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে মোকাবিলা হয় মাত্র; অর্থাৎ সান্নিধ্য হয়, সাযুজ্য হয় না। কিন্তু এমন-সকল বিষয় আছে যাকে জানার দ্বারা পাওয়া যায় না, যাকে আত্মস্থ করতে হয়। আম বস্তুটাকে সামনে রেখে জানা চলে, কিন্তু তার রসটাকে আত্মগত করতে না পারলে বুদ্ধিমূলক কোনো প্রণালীতে তাকে জানবার উপায় নেই। রসসাহিত্য মুখ্যত জ্ঞানের জিনিস নয়, তা মর্মের অধিগম্য। তাই সেখানে কেবল অর্থ যথেষ্ট নয়, সেখানে ধ্বনির প্রয়োজন; কেননা ধ্বনি বেগবান্। ছন্দের বন্ধনে এই ধ্বনিবেগ পায় বিশিষ্টতা, পায় প্রবলতা।

নিত্যব্যবহারের ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মজাল দিয়ে বাঁধতে হয়। রস-প্রকাশের ভাষাকে বাঁধতে হয় ধ্বনিসংগতের নিয়মে। সমাজেই বল, ভাষাতেই বল, সাধারণ ব্যবহারবিধির প্রয়োজন বাইরের দিকে; কিন্তু তাতেই সম্পূর্ণতা নেই। আর-একটা বিধি আছে যেটা আত্মিকতার বিধি। সমাজের দিক্ থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।

জাপানে গিয়ে দেখা গেল জাপানি সমাজস্থিতি। সেই স্থিতি ব্যবস্থাবন্ধনে। সেখানে চোরকে ঠেকায় পুলিস, জুয়াচোরকে দেয় সাজা, পরস্পরের দেনাপাওনা পরস্পরকে আইনের তাড়ায় মিটিয়ে দিতে হয়। এই যেমন স্থিতির দিক্ তেমনি গতির দিক্ আছে; সে চরিত্রে, যা চলে যা চালায়। এই গতি হচ্ছে অন্তর থেকে উদ্গত সৃষ্টির গতি, এই গতিপ্রবাহে জাপানি মনুষ্যত্বের আদর্শ নিয়ত রূপ গ্রহণ করে। জাপানি সেখানে ব্যক্তি, সর্বদাই তার ব্যঞ্জনা চলছে। সেখানে জাপানির নিত্যউদ্ভাবিত সচল সত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। দেখতে পেলেম, স্বভাবতই জাপানি রূপকার। কেবল যে শিল্পে সে আপন সৌষম্যবোধ প্রকাশ করছে তা নয়, প্রকাশ করছে আপন ব্যবহারে। প্রতিদিনের আচরণকেও সে শিল্পসামগ্রী করে তুলেছে। সৌজন্যে তার শৈথিল্য নেই; আতিথেয়তায় তার দাক্ষিণ্য আছে, হৃদ্যতা আছে, বিশেষভাবে আছে সুষমা। জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরে গেলেম। মন্দিরসজ্জায় উপাসকদের আচরণে অনিন্দ্যনির্মল শোভনতা, বহুনৈপুণ্যে নির্মিত মন্দিরের ঘণ্টার গম্ভীর মধুর ধ্বনি
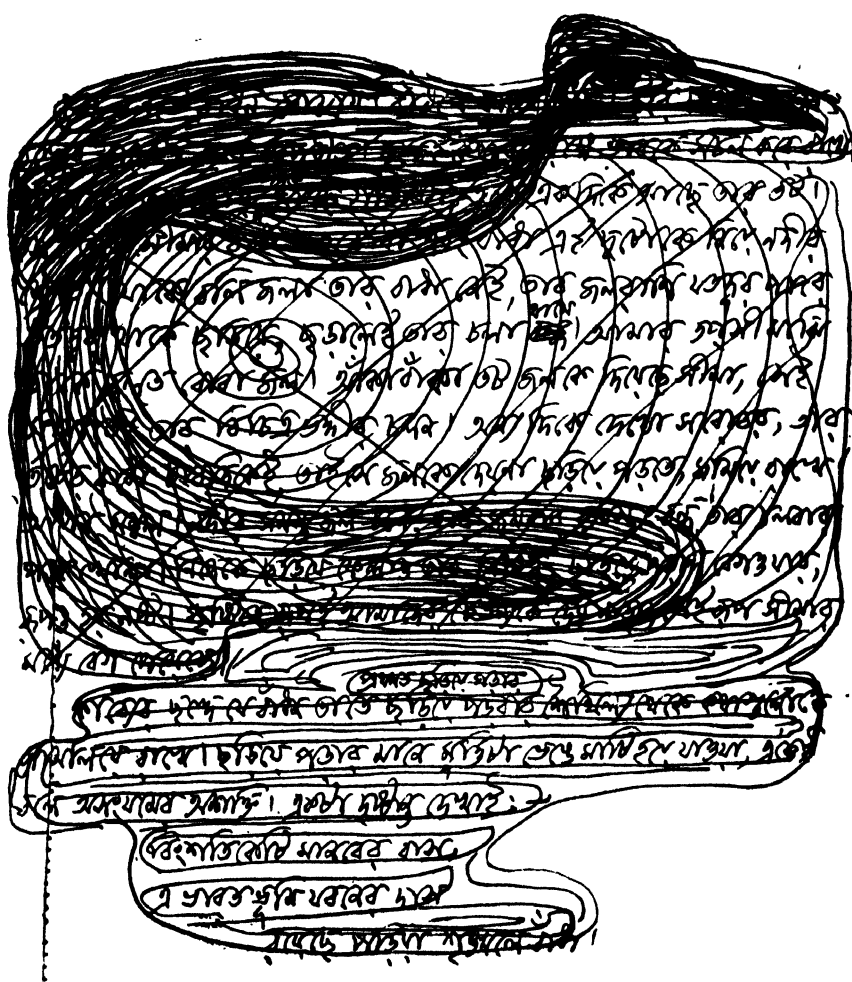
'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধের একপৃষ্ঠা

মনকে আনন্দে আন্দোলিত করে। কোথাও সেখানে এমন কিছুই নেই যা মানুষের কোনো ইন্দ্রিয়কে কদর্যতা বা অপারিপাট্যে অবমানিত করতে পারে। এই সঙ্গে দেখা যায় পৌরুষের অভিমানে জাপানির প্রাণপণ নির্ভীকতা। চারুতা ও বীর্যের সম্মিলনে এই যে তার আত্মপ্রকাশ, এ তো ফৌজদারি দণ্ডবিধির সৃষ্টি নয়। অথচ জাপানির ব্যক্তিস্বরূপ বন্ধনের সৃষ্টি, তার পরিপূর্ণতা সীমার দ্বারাতেই। নিয়ত প্রকাশমান চলমান এই তার প্রকৃতিকে শক্তিদান রূপদান করে যে আন্তরিক বন্ধন, যে সজীব সীমা, তাকেই বলি ছন্দ। আইনের শাসনে সমাজস্থিতি, অন্তরের ছন্দে আত্মপ্রকাশ।

বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস,
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্যাবর্তজয়ী মানব যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা,
জন কত শুধু প্রহরী-পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা॥[১]

দেখা যাচ্ছে ছন্দের বন্ধনে শব্দগুলোকে শৈথিল্য থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এলিয়ে পড়ছে না, তারা একটা বিশেষ রূপ নিয়ে চলেছে। বাঁধন ভেঙে দেওয়া যাক।—

ভারতভূমিতে বিংশতি কোটি মানব বাস করিয়া থাকে, তথাপি এই দেশ দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা একদা আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিল, ইহারা কি সেই বংশ হইতে উদ্ভূত? কয়েকজন মাত্র প্রহরীর পরিক্রমণ দেখিয়াই ইহাদের চক্ষুতে কি দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়াছে?

কথাগুলোর কোনো লোকসান হয় নি, বরঞ্চ হিসাব করে দেখলে কয়েক পারসেন্ট্ মুনাফাই দেখা যায়। কিন্তু কেবল ব্যাকরণের বাঁধনে কথাগুলোকে

১ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: 'কবিতাবলী', ভারতসংগীত। এই দৃষ্টান্তটির ছন্দপরিচয় দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের মাত্রা' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম বিভাগে। 'বিংশতি' শব্দে চার মাত্রা গণনীয়, এখানে তৎকালপ্রচলিত অক্ষরগণনার রীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। তুলনীয় 'বংশোদ্ভব' শব্দ। দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগে 'রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা' এই দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ।

অন্তরের দিকে সংঘবদ্ধ করে নি, তারি অভাবে সে শক্তি হারিয়েছে। উদাস মনের রুদ্ধ দ্বার ভাঙবার উদ্দেশে সবাই মিলে এক হয়ে ঘা দিতে পারছে না।

২

ছন্দর সঙ্গে অছন্দর তফাত এই যে, কথা একটাতে চলে, আর-একটাতে শুধু বলে কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো খেলে, কখনো নাচে, কখনো লড়াই করে, হাসে কাঁদে। যে স্থির বসে থাকে সে আপিস চালায়, তর্ক করে, বিচার করে, হিসাব দেখে, দল পাকায়। ব্যবসায়ীর শুষ্ক প্রবীণতা ছন্দোহীন বাক্যে, অব্যবসায়ীর সরস চঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোময় ছবিতে কাব্যে গানে।

এই ছবি-গান-কাব্যকে আমরা গড়ে-তোলা জিনিস বলে অনুভব করি নে; মনে লাগে যেন তারা হয়ে-ওঠা পদার্থ। তাদের মধ্যে উপাদানের বাহ্য সংঘটনটা অত্যন্ত বেশি ধরা দেয় না; দেখা যায় উদ্ভাবনার একটা অখণ্ড প্রকাশ, যে প্রকাশ একান্তভাবে আমাদের বোধের সঙ্গে মেলে। বিশ্বসৃষ্টিতে স্পন্দিত আকাশ, কম্পিত বাতাস, চঞ্চল হৃদয়াবেগ স্নায়ুতন্তুতে ছন্দোবিভঙ্গিত হয়ে আলোতে গানেতে বেদনায় আমাদের চৈতন্যে কেবলি এঁকে দিচ্ছে আলিম্পন। ছবি-গান-কাব্যও আপন ছন্দঃস্পন্দনের চলদ্‌বেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিমান্‌ আকৃতিমান্‌ করে তুলছে নানাপ্রকার চাঞ্চল্যে। অন্তরে যেটা এসে প্রবেশ করছে সেটা মিলে যাচ্ছে আমাদের চৈতন্যে, সে আর স্বতন্ত্র থাকছে না।

ঘোড়ার ছবি দেখি প্রাণিতত্ত্বের বইএ। সেখানে ঘোড়ার আকৃতির সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত হিসাব ঠিকঠাক মেলে। তাতে খবর পাই, সে খবর বাইরের খবর। তাতে জ্ঞানলাভ করি, ভিতরটা খুশি হয়ে ওঠে না। এই খবরটা স্থাবর পদার্থ। রূপকার ঘোড়ার যে ছবি আঁকে তার চরম উদ্দেশ্য খবর নয়, খুশি। এই খুশিটা বিচলিত চৈতন্যের বিশেষ উদ্‌বোধন। ভালো ছবির মধ্যে বরাবরের মতো একটা সচলতার বেগ রয়েই গেল, তাকে বলা চলে পর্‌পেচুয়ল মুভ্‌মেন্ট্‌। প্রাণিতত্ত্বের বইএ ঘোড়ার ছবিটা চার দিকেই সঠিক করে বাঁধা, খাঁটি খবরের যাথার্থ্যে পিলপেগাড়ি-করা তার সীমানা। রূপকারের রেখায় রেখায় তার তুলি মৃদঙ্গের বোল বাজিয়েছে, দিয়েছে সুষমার নাচের দোলা। সেই ঘোড়ার ছবিতে চতুষ্পদজাতীয় জীবের খাঁটি খবর না মিলতেও

পারে, মিলবে ছন্দ যার নাড়া খেয়ে সচকিত চৈতন্য সাড়া দিয়ে বলে ওঠে, 'হাঁ, এই তো বটে'। আপনারই মধ্যে সেই সৃষ্টিকে সে স্বীকার করে, সেই থেকে চিরকালের মতো সেই ধ্বনিময় রূপ আমাদের বিশ্বপরিচয়ের অন্তর্গত হয়ে থাকে। আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্ণ, ব্যাপারটা এর বেশি কিছুই নয়; খবরটা এক বারের বেশি দু বার বললে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। কবি বরাবরকার মতো বলতে থাকলেন—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।[১]

কবির মনের মেঘলা দিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দ-পক্ষিরাজের পিঠে, চলল চিরকালের মনোহরণ করতে।

গদ্যে প্রধানত অর্থবান্ শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান্ শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যূহ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়। ভিড় জমে রাস্তায়, তার মধ্যে সাজাই-বাছাই নেই, কেবল এলোমেলো চলাফেরা। সৈন্যের ব্যূহ সংহত সংযত, সাজাই-বাছাইএর দ্বারা সবগুলি মানুষের যে সম্মিলন ঘটে তার থেকে একটা প্রবল শক্তি উদ্‌ভাবিত হয়। এই শক্তি স্বতন্ত্রভাবে যথেচ্ছভাবে প্রত্যেক সৈনিকের মধ্যে নেই। মানুষকে উপাদান করে নিয়ে ছন্দোবিন্যাসের দ্বারা সেনাপতি এই শক্তিরূপের সৃষ্টি করে। এ যেন বহু-ইন্ধনের হোমহুতাশন থেকে যাজ্ঞসেনীর আবির্ভাব। ছন্দঃসজ্জিত শব্দব্যূহে ভাষায় তেমনি একটি শক্তিরূপের সৃষ্টি।

চিত্রসৃষ্টিতেও এ কথা খাটে। তার মধ্যে রেখার ও রঙের একটা সামঞ্জস্যবদ্ধ সাজাই-বাছাই আছে। সে প্রতিরূপ নয়, সে স্বরূপ। তার উদ্দেশ্য রিপোর্ট করা নয়, তার উদ্দেশ্য চৈতন্যকে কবুল করিয়ে নেওয়া 'এই তো স্বয়ং দেখলুম'। গুণীর হাতে রেখা ও রঙের ছন্দোবন্ধন হলেই ছবির নাড়ির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন চলতে থাকে, আমাদের চিৎস্পন্দন তার লয়টাকে স্বীকার করে, ঘটতে থাকে গতির সঙ্গে গতির সহযোগিতা বাতাসের হিল্লোলের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো।

ভারতবর্ষে বেদমন্ত্রে ছন্দ প্রথম দেখা দিল, মন্ত্রে প্রবেশ করল প্রাণের বেগ,

১ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম শ্লোকের প্রথম পাদ। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ। দ্রষ্টব্য: 'গদ্যকবিতার ভাষা ও ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম দৃষ্টান্ত ও আনুষঙ্গিক পাদটীকা।

সে প্রবাহিত হতে পারল নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আবর্তিত হতে থাকল মননধারায়।[1] মন্ত্রের ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয়, তা প্রাণে মনে। স্মৃতির মধ্যে তা চিরকাল স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করে। ছন্দের এই গুণ।

ছন্দকে কেবল আমরা ভাষায় বা রেখায় স্বীকার করলে সব কথা বলা হয় না। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার।[2] ভাবকে এমন করে সাজানো যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় না, প্রাণ পেয়ে ওঠে আমাদের অন্তরে। বাছাই করে সুবিন্যস্ত সুবিভক্ত করে ভাবের শিল্প রচনা করা যায়। বর্জন গ্রহণ সজ্জীকরণের বিশেষ প্রণালীতে ভাবের প্রকাশে সঞ্চারিত হয় চলৎশক্তি। যেহেতু সাহিত্যে ভাবের বাহন ভাষা, সেই কারণে সাহিত্যে যে ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সে ছন্দ ভাষার সঙ্গে জড়িত। তাই অনেক সময়ে এ কথাটা ভুলে যাই যে, ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম ক'রে আমাদের মনকে বিচলিত করে। সেই ছন্দ ভাবের সংযমে, তার বিন্যাসনৈপুণ্যে।

জ্ঞানের বিষয়কে প্রাঞ্জল ও যথার্থ করে ব্যক্ত করতে হলেও প্রকাশের উপাদানকে আঁট করে তাকে ঠিকমতো শ্রেণীবদ্ধ করা চাই। সে তাকে প্রাণের বেগ দেবার জন্যে নয়, তাকে প্রকৃষ্ট অর্থ দেবার জন্যেই। শংকরের বেদান্তভাষ্য তার একটি নিদর্শন। তার প্রত্যেক শব্দই সার্থক, তার কোনো অংশেই বাহুল্য নেই, তাই তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে তা এমন সুস্পষ্ট। কিন্তু এই শব্দযোজনার সংযমটি যৌক্তিকতার সংযম, আর্থিক যাথাতথ্যের সংযম, শব্দগুলি লজিক-সংগত পঙ্‌ক্তিবন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শংকরাচার্যের নামে যে সৌন্দর্যলহরী[3] কাব্য প্রচলিত তার ভাবের প্রকাশ লজিকের পক্ষ থেকে অসংযত, অথচ প্রাণবান্ গতিমান্ রূপসৃষ্টির পক্ষ থেকে তার কলাকৌশল দেখতে পাই।—

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।

১ স্মরণীয়: যাস্কের বচন—'মন্ত্রা মননাৎ, ছন্দাংসি ছাদনাৎ'।

২ তুলনীয়: 'মূলকথাটা এই যে…উদ্‌ভাবিত হচ্ছে।'—পরবর্তী পঞ্চম বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ।

৩ বঙ্গশ্রী ও প্রথম সংস্করণের পাঠে আছে 'আনন্দলহরী', পাণ্ডুলিপিতেও তাই। একই কাব্য আনন্দলহরী ও সৌন্দর্যলহরী এই দুই নামে পরিচিত।

তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ ॥[১]

ঐ সিঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক, যে রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্যধারার স্রোতঃপথের মতো। আর যে সিঁদুর আঁকা রয়েছে তোমার ঐ সিঁথিতে, সে যেন নবীন সূর্যের আলো, তাকে ঘনকবরীভারের অন্ধকার শত্রু হয়ে বন্দী করে রেখেছে।

সৌন্দর্যলহরীতে[২] যে নারীরূপের কথা পাই সে সাধারণ নারী নয়, সে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিমা। নিয়ত বয়ে চলেছে তার সৌন্দর্যের প্রবাহ, পিছনে তার ঘনকবরীপুঞ্জে রাত্রি, সম্মুখে তার সীমন্তরেখার সিন্দূররাগে তরুণসূর্যকিরণ,— এই অল্পকথায় ভাবের যে স্তবকগুলি সংবদ্ধ তাতে কবিহৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আঁকা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ছবিটি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ।

যে ছন্দ দিয়ে এই ছবি আঁকা এ শুধু ভাষার ছন্দ নয়, এ ভাবের ছন্দ। এতে ভাবের গুটিকয়েক উপকরণ উপমার গুচ্ছে সাজানো, তাই দিয়েই ওর জাদু। ওর নিত্যসচল কটাক্ষে অনেক না-বলা কথার ইশারা রয়ে গেল।

৩

একদিন ছিল যখন ছাপার অক্ষরের সাম্রাজ্যপত্তন হয় নি।[৩] যেমন কলকারখানার আবির্ভাবে পণ্যবস্তুর ভূরি-উৎপাদন সম্ভবপর হল তেমনি লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরের প্রসাদে সাহিত্যে শব্দসংকোচের প্রয়োজন চলে গেছে। আজ সরস্বতীর আসনই বল, আর তাঁর ভাণ্ডারই বল, প্রকাণ্ড আয়তনের। সাবেক সাহিত্যের দুই বাহন, তার উচ্চৈঃশ্রবা আর তার ঐরাবত, তার শ্রুতি ও স্মৃতি; তারা নিয়েছে ছুটি। তাদের জায়গায় যে যান এখন চলল, তার নাম

---

১ সৌন্দর্যলহরী, ৪৪-সংখ্যক শ্লোক। শংকরাচার্যের গ্রন্থাবলীর বাণীবিলাস স্মৃতিসংস্করণে এই শ্লোকটির প্রথমার্ধ আছে দ্বিতীয়ার্ধের পরে; সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ১৩৬। শিখরিণী ছন্দ। দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগে 'বিলাতে পালাতে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ এবং চতুর্থ বিভাগে 'লজ্জ বলিল' ও 'কেবলি অহরহ' ইত্যাদি দুটি দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ ও আনুষঙ্গিক পাদটীকা।

২ বঙ্গশ্রী ও প্রথম সংস্করণের পাঠে আছে 'আনন্দলহরী', কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে 'সৌন্দর্যলহরী'।

৩ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' তৃতীয় পর্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

দেওয়া যেতে পারে লিখিতি। সে রেলগাড়ির মতো, তাতে কোনোটা যাত্রীর কামরা, কোনোটা মালের। কোনোটাতে বস্তুর পিণ্ড, সংবাদপুঞ্জ, কোনোটাতে সজীব যাত্রী অর্থাৎ রসসাহিত্য। তার অনেক চাকা, অনেক কক্ষ; একসঙ্গে মস্ত মস্ত চালান। স্থানের এই অসংকোচে গদ্যের ভূরিভোজ।

সাহিত্যে অক্ষরের অতিথিশালায় বাক্যের এত বড়ো সদাব্রতের আয়োজন যখন ছিল না তখন ছন্দের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। তাতে বাধা পেত শব্দের অতিব্যয়িতা, আর ছন্দ আপন সাংগীতিক গতিবেগে স্মৃতিকে রাখত সচল করে।[১] সেদিন পদ্যছন্দের সতিন ছিল না ভাষায়, সেদিন বাণীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের অদ্বয়-বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত। এখন বই-পড়াটা অনেক স্থলেই নিঃশব্দ পড়া, কানের একান্ত শাসন তাই উপেক্ষিত হতে পারে। এই সুযোগেই আজকাল কাব্যশ্রেণীয় রচনা অনেক স্থলে পদ্যছন্দের বিশেষ অধিকার এড়িয়ে ভাবচ্ছন্দের মুক্তি দাবি করছে।

গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ থেকেই তার মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করেছে ছন্দের অন্তঃশীলা ধারা। রস যেখানেই চঞ্চল হয়েছে, রস যেখানেই চেয়েছে রূপ নিতে, সেখানেই শব্দগুচ্ছ স্বতই সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ভাবরসপ্রধান গদ্য আবৃত্তির মধ্যে সুর লাগে[২] অথচ তাকে রাগিণী বলা চলে না, তাতে তালমানসুরের আভাসমাত্র আছে। তেমনি গদ্যরচনায় যেখানে রসের আবির্ভাব সেখানে ছন্দ অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, কেবল তার মধ্যে থেকে যায় ছন্দের গতিলীলা।[৩]

করবী গাছের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় তার ডালে-ডালে জুড়ি-জুড়ি সমানভাগে পত্রবিন্যাস। কিন্তু বটগাছে প্রশাখাগত সুনিয়মিত পত্রপর্যায় চোখে পড়ে না। তাতে দেখি বহু শাখাপ্রশাখায় পত্রপুঞ্জের বড়ো বড়ো স্তবক। এই অনতিসমান রাশীকৃত ভাগগুলি বনস্পতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য পেয়েছে, তাকে

১ তুলনীয়: 'ছন্দ তার স্মৃতির ভাণ্ডারী।'—'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' তৃতীয় পর্যায় তৃতীয় অনুচ্ছেদ শেষ মন্তব্য; 'স্মৃতির মধ্যে তা··· ছন্দের এই গুণ।'— পূর্ববর্তী দ্বিতীয় বিভাগ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ; 'যে সুনিবিড় সুনিয়মিত ছন্দ···এখন আর নেই।'— পরবর্তী পঞ্চম বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ; এবং 'আমরা যাকে···মুখস্থ করা যায় না।'— 'গদ্যছন্দের স্বরূপ' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

২ তুলনীয়: 'এমন-কি, কোনো গদ্যরচনাও···প্রমাণ হচ্ছে কান।'—'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় অন্তিমাদি চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

৩ দ্রষ্টব্য: 'গদ্যছন্দের স্বরূপ' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ মন্তব্য ও পাদটীকা।

দিয়েছে একটি বৃহৎ চরিত্ররূপ।[১] অথচ পাথরের যে পিণ্ডীকৃত স্থাবর বিভাগগুলি দেখা যায় পাহাড়ে, এ সেরকম নয়। এর মধ্যে দেখতে পাই প্রাণশক্তি অবলীলাক্রমে আপন নানায়তন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওজন প্রতিনিয়ত বিশেষ মহিমার সঙ্গে বাঁচিয়ে চলেছে, তার মধ্যে দেখি যেন মহাদেবের তাণ্ডব, বলদেবের নৃত্য, সে অপ্সরীর নাচ নয়। একেই তুলনা করা যায় সেই আধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে, গদ্যের সঙ্গে যার বাহ্যরূপ মেলে আর পদ্যের সঙ্গে আন্তররূপ।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ' গ্রন্থে কোল নারীদের নাচের বর্ণনা করেছেন। নৃতত্ত্বে যেমন করে বিবরণ লেখা হয় এ তা নয়, লেখক ইচ্ছা করেছেন নাচের রূপটা রসটা পাঠকদের সামনে ধরতে। তাই এ লেখায় ছন্দের ভঙ্গি এসে পৌঁছেছে অথচ কোনো বিশেষ ছন্দের কাঠামো নেই। এর গদ্য সমমাত্রায় বিভক্ত নয়, কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টা আছে এর গতির মধ্যে।

গদ্যসাহিত্যে এই যে বিচিত্রমাত্রার ছন্দ মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়, সংস্কৃত বিশেষত প্রাকৃত আর্যা প্রভৃতি ছন্দে তার তুলনা মেলে। সেসকল ছন্দে সমান পদক্ষেপের নৃত্য নেই, বিচিত্রপরিমাণ ধ্বনিপুঞ্জ কানকে আঘাত করতে থাকে।[২] যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলেই গণ্য করা হয়েছে। তার থেকে দেখা যায় প্রাচীন কালেও ছন্দের মূলতত্ত্বটি গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই স্বীকৃত। অর্থাৎ যে পদবিভাগ বাণীকে কেবল অর্থ দেবার জন্যে নয়, তাকে গতি দেবার জন্যে, তা সমমাত্রার না হলেও তাতে ছন্দের স্বভাব থেকে যায়।

পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পঙ্‌ক্তিসীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক-একটি পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ। সেই পঙ্‌ক্তিশেষে একটি করে বড়ো যতি। বলা বাহুল্য গদ্যে এই নিয়মের শাসন নেই। গদ্যে বাক্য যেখানে আপন অর্থ সম্পূর্ণ করে সেইখানেই তার দাঁড়াবার জায়গা। পদ্যছন্দ যেখানে আপন ধ্বনিসংগতিকে অপেক্ষাকৃত বড়ো রকমের সমাপ্তি দেয়, অর্থনির্বিচারে সেইখানে পঙ্‌ক্তি শেষ করে। পদ্য সবপ্রথমে এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে অমিত্রাক্ষর

১ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ ও 'আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের পরবর্তী অনুচ্ছেদ, এবং 'গদ্যকবিতার ভাষা ও ছন্দ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ মন্তব্য।

২ দ্রষ্টব্য: পরবর্তী পঞ্চম বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদে 'বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের ভূমিকা ও আনুষঙ্গিক পাদটীকা।

ছন্দে, পঙ্‌ক্তির বাইরে পদচারণা শুরু করলে। আধুনিক পদ্যে এই স্বৈরাচার দেখা দিল পয়ারকে আশ্রয় করে।[১]

৪

বলা বাহুল্য এক মাত্রা চলে না। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। যেই দুইএর সমাগম, অমনি হল চলা শুরু। থাম আছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেমে। জন্তুর পা, পাখির পাখা, মাছের পাখনা 'দুই' সংখ্যার যোগে চলে। সেই নিয়মিত গতির উপরে যদি আর-একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। এই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বিচিত্র হয়ে ওঠে। মানুষের দেহটা তার দৃষ্টান্ত।[২] আদিমকালের চারপেয়ে মানুষ আধুনিক কালে দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার কোমর থেকে পদতল পর্যন্ত দুই পায়ের সাহায্যে মজবুত, কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত টলমলে। এই দুই ভাগের অসামঞ্জস্যকে সামলাবার জন্যে মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত। পাখিও দুই পায়ে চলে, কিন্তু তার দেহ স্বভাবতই দুই পায়ের ছন্দে নিয়মিত, টলবার ভয় নেই তার। দুই মাত্রায় অর্থাৎ জোড় মাত্রায় যে পদ বাঁধা হয় তার মধ্যে দাঁড়ানোও আছে, চলাও আছে, বেজোড় মাত্রায় চলার ঝোঁকটাই প্রধান। এইজন্যে অমিত্রাক্ষরে যেখানে-সেখানে থেমে যাবার যে নিয়ম আছে সেটা পালন করা বিষমমাত্রার ছন্দের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্যে বেজোড় মাত্রায় পদ্যধর্মই একান্ত প্রবল। চেষ্টা করে

১ পদ্যে পঙ্‌ক্তিসীমালঙ্ঘনের রীতি কেন পয়ারেই দেখা দিল তা ব্যাখ্যাত হয়েছে 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগে 'ওহে পান্থ, চলো পথে' ইত্যাদি প্রসঙ্গে এবং 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগে 'নিখিল আকাশভরা' ইত্যাদি চারটি দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গে। বস্তুতঃ এই প্রবন্ধটি যখন 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত হয় তখন 'পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব··· রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি', 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধের এই অংশটুকুকে ঈষৎ-পরিবর্তিতরূপে 'আশ্রয় করে'র পরে সন্নিবেশ করা হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এই অংশটা বর্জিত হয়।

২ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রথম বিভাগ প্রথম ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় বিভাগে 'কিন্তু এই কৈফিয়তটা' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ।

দেখা যাক বেজোড় মাত্রার দরজাটা খুলে দিয়ে। প্রথম পরীক্ষা হোক তিন মাত্রার মহলে।[১] —

বিরহী গগন ধরণীর কাছে
পাঠাল লিপিকা। দিকের প্রান্তে
নামে তাই মেঘ, বহিয়া সজল
বেদনা, বহিয়া তড়িৎ-চকিত
ব্যাকুল আকুতি। উৎসুক ধরা
ধৈর্য হারায়, পারে না লুকাতে
বুকের কাঁপন পল্লবদলে।
বকুলকুঞ্জে রচে সে প্রাণের
মুগ্ধ প্রলাপ ; উল্লাস ভাসে
চামেলিগন্ধে পূর্ব গগনে।

পয়ার ছন্দের মতো এর গতি সিধে নয়। এই তিন মাত্রার এবং জোড়-বিজোড় মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ মাঘনৈষধের নায়িকাদের মতো মরালগমনে, ডাইনে-বাঁয়ে ঝোঁকে-ঝোঁকে হেলতে দুলতে।[২]

এবার যে ছন্দের নমুনা দেব সেটা তিন-দুই মাত্রার, গানের ভাষায় ঝাঁপতাল-জাতীয়।—

চিত্ত আজি দুঃখদোলে
আন্দোলিত। দূরের সুর
বক্ষে লাগে। অজানের
সম্মুখেতে পান্থ মম
ক্লান্তপদে গিয়েছে চলি
দিগন্তরে। বিরহবেণু
ধ্বনিছে তাই মন্দবায়ে।

১ তিন মাত্রার ছন্দে যে ইচ্ছামতো যেখানে-সেখানে থামা চলে না, এ কথা 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগেও 'ওহে পান্থ, চল পথে' ইত্যাদি প্রসঙ্গের পরে 'নিশি দিল ডুব অরুণসাগরে' এই দৃষ্টান্তযোগে বোঝানো হয়েছে।

২ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগে 'তরণী বেয়ে শেষে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ এবং 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগে 'শ্রাবণধারে সঘনে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের অনুষঙ্গ।

ছন্দে তারি কুন্দফুল
ঝরিছে কত, চঞ্চলিয়া
কাঁপিছে কাশগুচ্ছশিখা।

এ ছন্দ পাঁচ মাত্রার মাঝখানে ভাগ করে থামতে পারে না ; এর যতিস্থাপনায় বৈচিত্র্যের যথেষ্ট স্বাধীনতা নেই।

এবার দেখানো যাক তিন-চার মাত্রার ছন্দ।—

মালতী সারাবেলা ঝরিছে রহি রহি
কেন যে বুঝি না তো। হায় রে উদাসিনী,
পথের ধূলিরে কি করিলি অকারণে
মরণসহচরী। অরুণ-গগনের
ছিলি তো সোহাগিনী। শ্রাবণ-বরিষনে
মুখর বনভূমি তোমারি গন্ধের
গর্ব প্রচারিছে সিক্ত সমীরণে
দিশে-দিশান্তরে। কী অনাদরে তবে
গোপনে বিকশিয়া বাদল রজনীতে
প্রভাত-আলোকেরে কহিলি 'নহে, নহে'।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে দেখা যায় অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দে পঙ্‌ক্তি-লঙ্ঘন[১] চলে বটে, কিন্তু তার এক-একটি ধ্বনিগুচ্ছ সমান মাপের, তাতে ছোটো-বড়ো ভাগের বৈচিত্র্য নেই। এইজন্যেই একমাত্র পয়ার ছন্দই অমিত্রাক্ষর রীতিতে কতকটা গদ্যজাতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে।

৫

এইবার আমার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেবার সময় এল যে, এইসব পঙ্‌ক্তি-লঙ্ঘক ছন্দের কথাটা উঠেছে প্রসঙ্গক্রমে। মূলকথাটা এই যে, কবিতায় ক্রমে ক্রমে ভাষাগত ছন্দের আঁটা-আঁটির সমান্তরে ভাবগত ছন্দ উদ্ভাবিত হচ্ছে। পূর্বেই বলেছি তার প্রধান কারণ কবিতা এখন কেবলমাত্র শ্রাব্য নয়, তা

১ তুলনীয়: 'লাইনডিঙোনো চাল'। 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগে 'হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের ভূমিকা।

প্রধানত পাঠ্য। যে সুনিবিড় সুনিয়মিত ছন্দ আমাদের স্মৃতির সহায়তা করে তার অত্যাবশ্যকতা এখন আর নেই।[১] একদিন খনার বচনে চাষবাসের পরামর্শ লেখা হয়েছিল ছন্দে।[২] আজকালকার বাংলায় যে 'কৃষ্টি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে, খনার এইসমস্ত কৃষির ছড়ায় তাকে নিশ্চিত এগিয়ে দিয়েছিল।[৩] কিন্তু এই ধরনের কৃষ্টি প্রচারের ভার আজকাল গদ্য নিয়েছে। ছাপার অক্ষর তার বাহন, এইজন্যে ছন্দের পুঁটুলিতে ঐ বচনগুলো মাথায় করে বয়ে বেড়াবার দরকার হয় না। একদিন পুরুষও আপিসে যেত পালকিতে, মেয়েও সেই উপায়েই যেত শ্বশুরবাড়িতে। এখন রেলগাড়ির প্রভাবে উভয়ে একত্রে একই রথে জায়গা পায়। আজকাল গদ্যের অপরিহার্য প্রভাবের দিনে ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাবে কাব্যও আপন গতিবিধির জন্যে বাঁধা ছন্দের ময়ূরপঙ্খিটাকে অত্যাবশ্যক বলে গণ্য করবে না। পূর্বেই বলেছি অমিত্রাক্ষর ছন্দে সর্বপ্রথমে পালকির দরজা গেছে খুলে, তার ঘটাটোপ হয়েছে বর্জিত। তবুও পয়ার যখন পঙ্‌ক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চলতে শুরু করেছিল তখনো সাবেকি চালের পরিশেষ-রূপে গণ্ডির চিহ্ন পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে রয়ে গেছে। ঠিক যেন পুরানো বাড়ির অন্দরমহল; তার দেয়ালগুলো সরানো হয় নি, কিন্তু আধুনিক কালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার করে অনায়াসে সদরে যাতায়াত করছে। অবশেষে হাল আমলের তৈরি ইমারতে সেই দেয়ালগুলো ভাঙা শুরু হয়েছে। চোদ্দো অক্ষরের গণ্ডিভাঙা পয়ার একদিন 'মানসী'র এক কবিতায় লিখেছিলুম, তার নাম 'নিষ্ফল প্রয়াস'[৪]। অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়াভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য় 'পলাতকা'য়। এতে করে কাব্যছন্দ গদ্যের কতকটা কাছে এল বটে, তবু মেয়ে-কম্পার্টমেণ্ট রয়ে গেল, পুরাতন ছন্দো-

১ দ্রষ্টব্য: পূর্ববর্তী তৃতীয় বিভাগের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ও 'গদ্যছন্দের স্বরূপ' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম মন্তব্য, এবং প্রাসঙ্গিক পাদটীকা।

২ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' তৃতীয় পর্যায় তৃতীয় অনুচ্ছেদ এবং 'খনা ডেকে বলে যান' প্রভৃতি দৃষ্টান্ত।

৩ দ্রষ্টব্য: 'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব (১৩৪০ ভাদ্র), 'আমাদের পেট ভরাবার জন্যে' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ।

৪ 'নিষ্ফল প্রয়াস' নয়, 'নিষ্ফল কামনা' (১৮৮৭। অগ্রহায়ণ ১৩)

রীতির বাঁধন খুলল না। এমন কি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় আর্যা প্রভৃতি ছন্দে ধ্বনিবিভাগ যতটা স্বাধীনতা পেয়েছে আধুনিক বাংলায় ততটা সাহসও প্রকাশ পায় নি।[১] একটি প্রাকৃত ছন্দের শ্লোক উদ্‌ধৃত করি।—

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মণহরণ
কণঅ-পিঅরি ণচই বিজুরি ফুল্লিআ ণীবা।
পথ্থর-বিথ্থর-হিঅলা
পিঅলা ণিঅলং ণ আবেই ॥[২]

মাত্রা মিলিয়ে এই ছন্দ বাংলায় লেখা যাক।—

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে,
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনক-বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জন করে।
নিষ্ঠুর-অন্তর মম
প্রিয়তম নাই ঘরে ॥[৩]

১ দ্রষ্টব্য : পূর্ববর্তী তৃতীয় বিভাগ উপান্ত্য অনুচ্ছেদের প্রথম মন্তব্য এবং 'গদ্যকবিতার ভাষা ও ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সংস্কৃত ছন্দের প্রসঙ্গ।

২ প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১৬৬। এই ছন্দটির নাম 'মালা'। মালা ছন্দের প্রথম অর্ধে পঁয়তাল্লিশ মাত্রা। এর পরিপাটি হচ্ছে এরকম : প্রথমে ছত্রিশটি লঘু দল, তার পরে গুরু-লঘু-গুরু ক্রমে তিন দল ও সর্বশেষে দুটি গুরু দল। দ্বিতীয় অর্ধের দুই ভাগ, প্রথম ভাগে বারো ও দ্বিতীয় ভাগে পনরো মাত্রা। 'আবেই' শব্দের 'ই' ধ্বনিটি দ্বিমাত্রক বলে গণনীয়। 'ছন্দের মাত্রা' দ্বিতীয় পর্যায় উপান্ত্য অনুচ্ছেদে 'কুঞ্জপথে জ্যোৎস্না রাতে' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য। 'ণিঅলং' (মানে নিকটে) শব্দটি বোধ করি অনবধানতাবশতই বঙ্গশ্রী ও প্রথম সংস্করণের ধৃত পাঠে বাদ পড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৬৯ কার্তিক) শব্দটিকে প্রথম যথাস্থানে স্থাপন করা হয়।

৩ এই তরজমাটিতে মালা ছন্দের মাত্রাবিন্যাস স্থলে স্থলে লঙ্ঘিত হয়েছে। 'বৃষ্টি' শব্দে লঘুত্বের বিধান রক্ষিত হয় নি। প্রথম অর্ধের শেষ ভাগে তিন মাত্রা এবং দ্বিতীয় অর্ধের প্রথম ভাগে দুই মাত্রা ও দ্বিতীয় ভাগে তিন মাত্রা কম আছে; তা ছাড়া 'ণিঅলং' শব্দটিকে গণনা করা হয় নি বলে দ্বিতীয় অর্ধে আরও চার মাত্রা কম পড়েছে। টীকাকারদের মতে 'ফুল্লিআ ণীবা' কথার অর্থ 'পুষ্পিতা নীপাঃ'। উপরের তরজমায় তার বদলে আছে 'অশনি গর্জন করে'। বলা বাহুল্য অনুবাদে দীর্ঘ স্বরগুলি সর্বত্রই বাংলা রীতিতে লঘু বলে গণ্য হয়েছে।

বাঙালি পাঠকের কান[1] একে রীতিমতো ছন্দ বলে মানতে বাধা পাবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এর পদবিভাগ প্রায় গদ্যের মতোই অসমান। যাই হোক, এর মধ্যে একটা ছন্দের কাঠামো আছে। সেটুকুও যদি ভেঙে দেওয়া যায় তা হলে কাব্যকেই কি ভেঙে দেওয়া হল? দেখা যাক।—

অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেছে,
সোনার বরন ঝলক দিয়ে নেচে উঠছে বিদ্যুৎ,
বজ্র উঠছে গর্জন করে।
নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এল না॥

একে বলতে হবে কাব্য, বুদ্ধির সঙ্গে এর বোঝাপড়া নয়, একে অনুভব করতে হয় রসবোধে। সেইজন্যেই যতই সামান্য হোক, এর মধ্যে বাক্যসংস্থানের একটা শিল্পকলা শব্দব্যবহারের একটা 'তেরছ চাহনি' রাখতে হয়েছে। সুবিহিত গৃহিণীপনার মধ্যে লোকে দেখতে পায় লক্ষ্মীশ্রী, বহু উপকরণে বহু অলংকারে তার প্রকাশ নয়। ভাষার কক্ষেও অনতিভূষিত গৃহস্থালি গদ্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ গদ্য বলা চলবে না, যেমন চলবে না আপিসঘরের অসজ্জাকে অন্তঃপুরের সরল শোভনতার সঙ্গে তুলনা করা। আপিসঘরে ছন্দটা প্রত্যক্ষই বর্জিত, অন্যত্র ছন্দটা নিগূঢ় মর্মগত, বাহ্য ভাষায় নয়, অন্তরের ভাবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে গদ্যে কাব্য রচনা করেছেন ওআল্ট্ হুইট্ম্যান। সাধারণ গদ্যের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই, তবু ভাবের দিক্ থেকে তাকে কাব্য না বলে থাকবার জো নেই। এইখানে একটা তরজমা করে দিই।—

লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠছে;
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো থেকে শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।
কোনো দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য লাগল কেমন করে এ গাছ ব্যক্ত করছে খুশিতে-ভরা
আপন পাতাগুলিকে
যখন না আছে ওর বন্ধু, না আছে দোসর।

১ দ্রষ্টব্য: 'বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দ' দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ও আনুষঙ্গিক পাদটীকা।

আমি বেশ জানি আমি তো পারতুম না।
গুটিকতক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলেম শ্যাওলা।
নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে;
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করাবার জন্যে যে তা নয়।
(সম্প্রতি ঐ বন্ধুদের ছাড়া আর কোনো কথা আমার মনে ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিহ্নের মতো,
পুরুষের ভালোবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তাজা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝল্‌মল্‌ করছে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুশিতে-ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করছে
চিরজীবন ধরে,
তবু আমার মনে হয় আমি তো পারতুম না ॥[১]

এক দিকে দাঁড়িয়ে আছে কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ ওক গাছ, একলা আপন আত্ম-সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতায় আনন্দময়, আর-এক দিকে একজন মানুষ, সেও কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ, কিন্তু তার আনন্দ অপেক্ষা করছে প্রিয়সঙ্গের জন্যে— এটি কেবলমাত্র সংবাদরূপে গদ্যে বলবার বিষয় নয়। এর মধ্যে কবির আপন মনোভাবের একটি ইশারা আছে। একলা গাছের সঙ্গে তুলনায় একলা বিরহী-হৃদয়ের উৎকণ্ঠা আভাসে জানানো হল। এই প্রচ্ছন্ন আবেগের ব্যঞ্জনা, এই তো কাব্য; এর মধ্যে ভাববিন্যাসের শিল্প আছে, তাকেই বলব ভাবের ছন্দ।

চীন-কবিতার তরজমা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেখাই।—

স্বপ্ন দেখলুম যেন চড়েছি কোনো উঁচু ডাঙায়;
সেখানে চোখে পড়ল গভীর এক ইঁদারা।
চলতে চলতে কণ্ঠ আমার শুকিয়েছে,
ইচ্ছে হল জল খাই।
ব্যগ্র দৃষ্টি নামতে চায় ঠাণ্ডা সেই কুয়োর তলার দিকে।

---

১ Leaves of Grass কাব্যের *'I saw in Louisiana a live-oak growing'* -শীর্ষক কবিতা।

ঘুরলেম চার দিকে, দেখলেম ভিতরে তাকিয়ে,
জলে পড়ল আমার ছায়া।
দেখি এক মাটির ঘড়া কালো সেই গহ্বরে ;
দাড় নাই যে তাকে টেনে তুলি।
ঘড়াটা পাছে তলিয়ে যায়
এই ভেবে প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হল ?
পাগলের মতো ছুটলেম সহায় খুঁজতে।
গ্রামে গ্রামে ঘুরি, লোক নেই একজনো,
কুকুরগুলো ছুটে আসে টুঁটি কামড়ে ধরতে।
কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম কুয়োর ধারে।
জল পড়ে তুই চোখে বেয়ে, দৃষ্টি হল অন্ধপ্রায়।
শেষকালে জাগলেম নিজেরই কান্নার শব্দে।
ঘর নিস্তব্ধ, স্তব্ধ সব বাড়ির লোক ;
বাতির শিখা নিবো-নিবো, তার থেকে সবুজ ধোঁয়া উঠছে,
তার আলো পড়ছে আমার চোখের জলে।
ঘণ্টা বাজল, রাতদুপুরের ঘণ্টা,
বিছানায় উঠে বসলুম, ভাবতে লাগলুম অনেক কথা।

মনে পড়ল, যে ডাঙাটা দেখছি সে চাং-আনের কবরস্থান ;
তিন শো বিঘে পোড়ো জমি,
ভারি মাটি তার, উঁচু উঁচু সব ঢিবি ;
নীচে গভীর গর্তে মৃতদেহ শোওয়ানো।
শুনেছি মৃত মানুষ কখনো কখনো দেখা দেয় সমাধির বাইরে।
আজ আমার প্রিয় এসেছিল ইঁদারায় ডুবে-যাওয়া সেই ঘড়া,
তাই দু চোখ বেয়ে জল প'ড়ে আমার কাপড় গেল ভিজে ॥[১]

১ য়ুয়ান চেন -নামক চৈনিক কবির (খ্রী ৭৭৯-৮৩১) একটি কবিতার আর্থার ওয়ালে -কৃত *The Pitcher* -শীর্ষক ইংরেজি তরজমা থেকে অনূদিত। **Ernest Benn**-এর **The Augustan Book of English Poetry** গ্রন্থমালা দ্বিতীয় পর্যায়ের সপ্তম পুস্তক : *Poems from the Chinese* : পৃ. ২৫-২৬ দ্রষ্টব্য।

এতে পদ্যছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলংকরণ নেই, তবুও আছে শিল্প।

উপসংহারে শেষকথা এই যে, কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে। একদা কাব্যের পালা শুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়ে নি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যে-পদ্যে রফানিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এক কালের খাতিরে অন্য কালকে অস্বীকার করা যায় না।[১]

বঙ্গশ্রী, বৈশাখ ১৩৪১ : 'গদ্যছন্দ'।

---

১ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দোহার ২' বিভাগে তৃতীয় উদ্‌ধৃতি ও প্রাসঙ্গিক 'পাঠপরিচয়'।

গদ্যকবিতার ভাষা ও ছন্দ

প্রথম পর্যায়

অন্তরে যে ভাবটা অনির্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারী প্রকাশ করবে গানে নাচে, এটাকে লিরিক বলে স্বীকার করা হয়। এর ভঙ্গিগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে; তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে বলেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবল বেগে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্যে বিশেষ প্রসাধন, আয়োজন, বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, একটি দূরত্ব।

কিন্তু একবার সরিয়ে দাও ঐ রঙ্গমঞ্চ, জরির আঁচলা-দেওয়া বেনারসি শাড়ি তোলা থাক্ পেটিকায়, নাচের বন্ধনে তনুদেহের গতিকে মধুর নিয়মে নাইবা সংযত করলে, তা হলেই কি রস নষ্ট হল? তা হলেও দেহের সহজ ভঙ্গিতে কান্তি আপনি জাগে, বাহুর ভাষায় যে বেদনার ইঙ্গিত ঠিকরে ওঠে সে মুক্ত বলেই যে নিরর্থক এমন কথা যে বলতে পারে তার রসবোধ অসাড় হয়েছে। সে নাচে না বলেই যে তার চলনে মাধুর্যের অভাব ঘটে কিংবা সে গান করে না বলেই যে তার কানে-কানে কথার মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনা থাকে না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। বরঞ্চ এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা; আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি। তার বাহুল্যবর্জিত আত্মনিবেদনে তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কাছের সম্বন্ধ ঘটে। অশোকের গাছে সে আলতা-আঁকা নূপুরশিঞ্জিত পদাঘাত নাই করল; না-হয় কোমরে আঁট আঁচল বাঁধা, বাঁ হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে, অযত্নশিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে; সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না, না-হয় গদ্য লিরিকই হল? এ রস শালপাতায় তৈরি গদ্যের পেয়ালাতেই মানায়, ওটাকে তো ত্যাগ করা চলবে না। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা; গদ্যের

আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।[১]

প্রশ্ন উঠবে গদ্য তা হলে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন্ নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা কর তা হলে জানবে তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির কাপড়ের হিসেব রাখেন, তাঁর কাশি সর্দি জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন, এ সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত, এই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে, পাথর ডিঙিয়ে ঝরনার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণীয়। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে দেওয়া চলে। সেই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সংগীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া। শিশুদের সেটা পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু দৃঢ়দন্ত বয়স্কের রুচিতে এটা উপাদেয়।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না, এটা শোচনীয়। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তা হলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন। দোহাই তোমার, বাংলাদেশের ময়ূরে-চড়া কার্তিকটিকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টা কোরো।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র : ১৯৩৫ মে ১৭;
পূর্বাশা, শ্রাবণ ১৩৪২ ; সাহিত্যের স্বরূপ (১৩৫০ বৈশাখ) : 'কাব্যে গদ্যরীতি ২'।

১ দ্রষ্টব্য : 'গদ্যছন্দ' তৃতীয় বিভাগ চতুর্থ অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা।

দ্বিতীয় পর্যায়

গদ্য বলতে বুঝি, যে ভাষা আলাপ করবার ভাষা; ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে ভাষা তাই পদ্য। আর রসাত্মক বাক্যকেই আলংকারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্যকাব্য, আর গদ্যে বললে হবে গদ্যকাব্য। গদ্যেও অকাব্য ও কুকাব্য হতে পারে, পদ্যেও তথৈবচ। গদ্যে তার সম্ভাবনা বেশি, কেননা ছন্দেরই একটা স্বকীয় রস আছে[১]— সেই ছন্দকে ত্যাগ করে যে কাব্য, সুন্দরী বিধবার মতো তার অলংকার তার আপন বাণী-দেহেই, বাইরে নয়।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, গদ্যকাব্যেও একটা আবাধাঁ ছন্দ আছে। আন্তরিক প্রবর্তনা থেকে কাব্য সেই ছন্দ চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে, তার ভাগগুলি অসম হয়, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে ভারসামঞ্জস্যথেকে সে স্খলিত হয় না। বড়ো ওজনের সংস্কৃত ছন্দে এই আপাতপ্রতীয়মান মুক্তগতি দেখতে পাওয়া যায়।[২] যেমন—

মেঘৈর্মেদুর | -মম্বরং বনভুবঃ | শ্যামাস্তমা | -লদ্রুমৈঃ।[৩]

এই ছন্দ সমান ভাগ মানে না, কিন্তু সমগ্রের ওজন মেনে চলে। মুখের কথায় আমরা যখন খবর দিই তখন সেটাতে নিঃশ্বাসের বেগে ঢেউ খেলায় না। যেমন—

তার চেহারাটা মন্দ নয়।

১ দ্রষ্টব্য: 'গদ্যকাব্যের ছন্দপ্রকৃতি' প্রথম পর্যায় অন্তিমাদি তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

২ তুলনীয়: 'গদ্যসাহিত্যে…করতে থাকে।'— 'গদ্যছন্দ' তৃতীয় বিভাগ উপান্ত্য অনুচ্ছেদ, এবং 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায়…প্রকাশ পায় নি।'— ঐ, পঞ্চম বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ।

৩ দ্রষ্টব্য: 'গদ্যছন্দ' দ্বিতীয় বিভাগ প্রথম দৃষ্টান্ত। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকারদের মতে এ ছন্দের প্রতি পঙ্‌ক্তি একটিমাত্র যতির দ্বারা দুই অসমান ভাগে বিভক্ত, তিন যতির দ্বারা চার ভাগে নয়। প্রথম ভাগে বারো দল, দ্বিতীয় ভাগে সাত। 'বনভুবঃ' শব্দের পরে যতি।

আরও লক্ষিতব্য এই যে, 'ছন্দোহার ১' বিভাগের তৃতীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের যে কলামাত্রিক প্রতিরূপটি সংকলিত হয়েছে তাতেও উক্তপ্রকার চার ভাগ মানা হয় নি।

কিন্তু ভাবের আবেগ লাগবামাত্র আপনি ঝোঁক এসে পড়ে। যেমন—

কী সুন্দর তার চেহারাটি।

একে ভাগ করলে এই দাঁড়ায়—

কী সুন্‌ | -দর তার | চেহারাটি।

"মরে যাই তোমার বালাই নিয়ে।"

"এত গুমর সইবে না গো, সইবে না— এই বলে দিলুম।"

"কথা কয় নি তো কয় নি,
চলে গেছে সামনে দিয়ে,
বুক ফেটে মরব না তাই বলে।"

এ সমস্তই প্রতিদিনের চলতি কথার সহজ ছন্দ, গদ্যকাব্যের গতিবেগে আত্ম-রচিত। মনকে খবর দেবার সময় এর দরকার হয় না, ধাক্কা দেবার সময় আপনি দেখা দেয়, ছান্দসিকের দাগকাটা মাপকাঠির অপেক্ষা রাখে না।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র : ১৯৩৫ মে ২২ ;

ছন্দ (প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৩ আষাঢ়) : 'মোট কথা | গদ্যছন্দ'। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূলপত্র।

তৃতীয় পর্যায়

সম্প্রতি কতকগুলো গদ্যকবিতা জড়ো করে 'শেষসপ্তক' নাম দিয়ে একখানি বই বের করেছি। সমালোচকরা ভেবে পাচ্ছেন না ঠিক কী বলবেন। একটা কিছু সংজ্ঞা দিতে হবে, তাই বলছেন আত্মজৈবনিক। অসম্ভব নয়, কিন্তু তাতে বলা হল না এগুলো কবিতা কিংবা কবিতা নয় কিংবা কোন্ দরের কবিতা। এদের সম্বন্ধে মুখ্য কথা যদি এই হয় যে এতে কবির আত্মজীবনের পরিচয় আছে তা হলে পাঠক অসহিষ্ণু হয়ে বলতে পারে, আমার তাতে কী। মদের গেলাসে যদি রঙকরা জল রাখা যায় তা হলে মদের হিসাবেই ওর বিচার আপনি উঠে পড়ে। কিন্তু পাথরের বাটিতে রঙিন পানীয় দেখলে মনের মধ্যে গোড়াতেই তর্ক ওঠে ওটা শরবত, না ওষুধ। এরকম দ্বিধার মধ্যে পড়ে সমালোচক এই কথাটার 'পরেই জোর দেন যে, বাটিটা জয়পুরের কি মুঙ্গেরের। হায় রে, রসের যাচাই করতে যেখানে পিপাসু এসেছিল সেখানে মিলল পাথরের

বিচার! আমি কাব্যের পসারি, আমি শুধোই— লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই, থেকে থেকে কটাক্ষ নেই, সদর দরজার চেয়ে এর খিড়কির দুয়ারের দিকেই কি ইশারা নেই, গদ্যের বকুনির মুখে রাশ টেনে ধরে তার মধ্যে কি কোথাও দুলকির চাল আনা হয় নি, চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি? সেই সংযমের গুণে থেমে-যাওয়া কিংবা হঠাৎ-বেঁকে-যাওয়া কথার মধ্যে কোথাও কি নীরবের সরবতা পাওয়া যাচ্ছে না? এইসকল প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে এর সমালোচনা। কালিদাস 'রঘুবংশে'র গোড়াতেই বলেছেন, বাক্য এবং অর্থ একত্র সম্পৃক্ত থাকে, এমন স্থলে বাক্য এবং অর্থাতীতকে একত্র সম্পৃক্ত করার দুঃসাধ্য কাজ হচ্ছে কবির, সেটা গদ্যেই হোক আর পদ্যেই হোক তাতে কী এল গেল।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র : ১৯৩৫ জুন ৩ ;
পূর্বাশা, শ্রাবণ ১৩৪২।

গদ্যকাব্যের ছন্দপ্রকৃতি

প্রথম পর্যায়

গদ্যকাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্যের বিষয় নেই। ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। শুধু তাই নয়। যে সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে, কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক্। পদ্যের ভাষাবিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে; স্পষ্ট হলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। গেরুয়াবেশে সন্ন্যাসী জানান দেয় সে গৃহীর থেকে পৃথক্, ভক্তের মন সেই মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে; নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা। কিন্তু বলা বাহুল্য সন্ন্যাসধর্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয়, সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়। সে বলে, আমার বোধশক্তির দ্বারাই সত্যকে চিনব, সেই গেরুয়া কাপড়ের দ্বারা নয় যে কাপড় বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূলকথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় তার আনুষঙ্গিক হয়ে। সহায়তা করে দুই দিক্ থেকে। এক হচ্ছে স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে, আর-এক হচ্ছে পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়।

একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাঙ্‌ক্তেয় বলে গণ্য ছিল। সেই সময়ে আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য। এমন সময়ে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে।[১] অর্থাৎ এর ভঙ্গি পদ্যের মতো, কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

---

১ তুলনীয়: 'পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘন'— 'গদ্যছন্দ' তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের শেষ অনুচ্ছেদ, এবং 'পয়ার যখন পঙ্‌ক্তির বেড়া ডিঙিয়ে…পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে রয়ে গেছে।'— ঐ, পঞ্চম বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ।

সংস্কারের অনিত্যতার আর-একটা প্রমাণ দিই। এক সময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল সে অন্তঃপুরচারিণী। প্রথম যে কুলস্ত্রীরা অন্তঃপুর থেকে অসংকোচে বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণের সংস্কারকে আঘাত করাতে তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও অপ্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে অপমানিত করা, প্রহসনের নায়িকারূপে তাঁদেরকে অট্টহাস্যের বিষয় করা প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সে দিন যে মেয়েরা সাহস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পাঠ নিতেন তাঁদের সম্বন্ধে কাপুরুষ আচরণের কথা জানা আছে। ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংশয়িতভাবে কুলস্ত্রীই আছেন, যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দ বহুদূরে লঙ্ঘন করে গেছে। কাজটা সহজ হয়েছিল, কেননা তখনকার ইংরেজিশেখা পাঠকেরা মিল্‌টন-শেক্‌স্পীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সনাতনীরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চোদ্দো অক্ষরের গণ্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না। অর্থাৎ লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায় পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ির সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য কাব্যই হতে পারে না। কী হতে পারে এবং হতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না, এ কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বেই প্রমাণ করেছে। আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য। কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল? যেখানে লড়াই করে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য। কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা, পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয় নি তার হাজার প্রমাণ আছে, গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে, আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ।[১] সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে, কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়। কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মনভোলানো মালমসলা বাদ দিয়েও, কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায়, আসল কাব্য জিনিসটা একান্ত-ভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক সার্থকতায়।

গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা-নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ্ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে,—যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে, কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরি-মার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়, এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না। বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয়সাধনে গদ্য কাজে লাগবে ; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।

কবিতা, পৌষ ১৩৪৩ : 'গদ্যকাব্য' ;
সাহিত্যের স্বরূপ (১৩৫০ বৈশাখ) : 'কাব্য ও ছন্দ' ।

১ দ্রষ্টব্য : 'গদ্যকবিতার ভাষা ও ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম অনুচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পর্যায়

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির কাব্য দেখা দিয়েছে। এটাকে অনধিকার-প্রবেশ বলে রুখে দাঁড়াবার কোনো আইন নেই। যেমনি প্রাণের রাজ্যে তেমনি সাহিত্যকলাসৃষ্টিতে টিকে থাকার দ্বারাই তার অধিকার সপ্রমাণ হয়— পুরাতন ও নূতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নয়, অভ্যাস দিয়ে ঘেরা স্বাদবোধের দ্বারাও নয়। অমিতাক্ষর[১] ছন্দ যেমন তার যতিভাগের অমিতি এবং মিলের অভাব সত্ত্বেও কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে চলে গেছে গদ্যকাব্যও যে তেমন চলবে না, কারো মুখের কথায় তার স্থির সিদ্ধান্ত হবে না। চিরাচরিত মিতাক্ষর রীতির বহুদূর বাইরে গেছে অমিতাক্ষর, আরো বাইরে পদক্ষেপে যে তার চিরনিষেধ, অন্তঃপুরচারিণী কবিতা অন্দর থেকে সদরে এলেই যে সে হবে স্বধর্মচ্যুত, সাহিত্যের ঐতিহাসিক নজির দেখলে বোঝা যায় এ কথা আজ যাঁরা বলছেন হয়তো কাল তাঁরা বলবেন না। বস্তুত নৈবচ বলবার শেষ অধিকার আজ তাঁদের নেই। হয়তো আছে কালকের লোকের।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রমাণে বলতে পারি যে, ছন্দে-বাঁধা কবিতা যে আগ্রহে লিখেছি, আবাঁধা কবিতাও লিখেছি সেই আগ্রহেই, এবং ব্যক্তিগত রুচির দিক্ থেকে বলতে পারি, ভালো গদ্যকাব্য আমার তেমনি ভালো লাগে যেমন ভালো লাগে ভালো পদ্যকাব্য। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই ভালো লাগার রসভেদ আছে, যেমন আম ভালো লাগা আর জাম ভালো লাগা।

বাংলাকাব্য-পরিচয় [১৩৪৫] : ভূমিকা (অংশ)।

১ 'অমিত্রাক্ষর' অর্থে প্রযুক্ত। 'অমিত্রাক্ষর' শব্দটি পারিভাষিক ও রূঢ়ার্থক। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বস্তুত 'অমিতাক্ষর' নয়।

গদ্যছন্দের স্বরূপ

প্রথম পর্যায়

শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণ[১] (২৯ অগস্ট ১৯৩৯)

তর্কের বিষয় এই যে, কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার 'পরে একান্ত নির্ভর করে কি না। কেউ মনে করেন করে, আমি মনে করি করে না। অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত করে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন করে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য বলে মেনে নিতে একটুও বাধে নি। উপাখ্যানমাত্র— কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন; কারণ এ তো অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয় নি। আমি বলি হয় নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত তবে হালকা হয়ে যেত।[২]

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাম-না-জানা কয়েকজন লেখক ইংরেজিতে গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। এ কথা মানতেই হবে যে, সলোমনের গান ডেভিডের গাথা সত্যিকার কাব্য। এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ আছে, তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হত তবে সর্বনাশই হত।[৩]

১ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় -কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা -কর্তৃক সংশোধিত।

২ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দোহার ২' বিভাগে দ্বিতীয় উদ্‌ধৃতি ও শেষ পাদটীকা, এবং বর্তমান সম্পাদকের 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ': রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্বাশা, ১৩৪৮ আশ্বিন।— তাঁর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৫২ আষাঢ়) সংকলিত, পৃ ২১৩।

৩ দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ, পৃ ২১৩।

যজুর্বেদে যে উদাত্ত ছন্দের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তাকে আমরা গদ্য বলি না, বলি মন্ত্র। আমরা সবাই জানি যে, মন্ত্রের লক্ষ্য হল শব্দের অর্থকে ধ্বনির ভিতর দিয়ে মনের গভীরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে সে যে কেবল অর্থবান্ তা নয়, ধ্বনিমান্‌ও বটে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গদ্যমন্ত্রের সার্থকতা অনেকে মনের ভিতর অনুভব করেছেন, কারণ তার ধ্বনি থামলেও অনুরণন থামে না।[১]

একদা কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমন-কি, ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ করে এমনসব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে করে আমি কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোনো চিহ্নই ছিল না, তবু যখন তাঁরা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন, তখন সে কথা তো স্বীকার না করে পারা গেল না। মনে হয়েছিল, ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়ায় ক্ষতি হয় নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ করলে হয়তো তা ধিকৃকৃত হত, অশ্রদ্ধেয় হত।[২]

মনে পড়ে একবার শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম, "ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।" সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল, তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমি স্বয়ং এই কাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলুম লিপিকায়, অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাই নি। লিপিকা লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখি নি। বোধ করি সাহস হয় নি বলেই।[৩]

১ তুলনীয়: 'ভারতবর্ষে বেদমন্ত্রে ছন্দ…ছন্দের এই গুণ।'— 'গদ্যছন্দ' দ্বিতীয় বিভাগ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ; এবং 'যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রের…থেকে যায়।'— ঐ, তৃতীয় বিভাগ উপান্ত্য অনুচ্ছেদ।

২ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় অন্তিমাদি তৃতীয় অনুচ্ছেদ শেষ মন্তব্য, এবং 'গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম অনুচ্ছেদ প্রথম মন্তব্য।

৩ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় অন্তিমাদি তৃতীয় অনুচ্ছেদ প্রথম মন্তব্য, এবং 'গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ' দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম অনুচ্ছেদ শেষ মন্তব্য।

কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। সেজন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন-কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য, অতিলালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়। নটীর নাচে শিক্ষিতপটু অলংকৃত পদক্ষেপ। অপর পক্ষে ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গিতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হল সেইরকম— অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।[১]

গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করি নে।

প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬ : 'গদ্যকাব্য' ;

সাহিত্যের স্বরূপ (১৩৫০ বৈশাখ) : 'গদ্যকাব্য' (অংশ)।

দ্বিতীয় পর্যায়

আলোচনা[২] (২৫ ডিসেম্বর ১৯৪০)

সাহিত্যে কবিত্বরসপূর্ণ সৃষ্টি বিষয়ে সত্যিকার কবি এবং সাহিত্যিকদের বক্তব্য বিষয়ে বলবার অভিনবত্বে সব দিক্ থেকেই শেষ দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়েছে,

১ দ্রষ্টব্য : 'গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ' তৃতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ অন্তিমাদি তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

২ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা। শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী -কর্তৃক অনুলিখিত। দ্রষ্টব্য : বর্তমান সম্পাদকের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৫২ আষাঢ়) 'গদ্যকবিতার ছন্দ' প্রসঙ্গ, পৃ ২১২-১৪।

এ কথা ভাবা অনুচিত। অনেক দিন ধরেই কতকটা চিরাচরিত ধারায় ছন্দের কতগুলো নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে কবিরা তাঁদের এক-একটা ভাব বা বক্তব্যকে প্রকাশ করে এসেছেন। এরকম রীতির নিয়মটি হচ্ছে— ভাবকে এক-একটি ছন্দের কাঠামোর আনুগত্য মেনে চলতে হয়। কিন্তু যাকে গদ্যকবিতা বলা হয় তার নিয়মরীতি স্বতন্ত্র। তার বিশেষত্ব হচ্ছে— ভাবের আনুগত্য স্বীকার করতে হয় ছন্দকে, ভাবের মধ্যে ছন্দের গতিবিধি, ভাব ভঙ্গি দেয় ছন্দকে। যদি নতুন বলে এর প্রতি বিমুখ হও তা হলে এর মধ্যে যে ছন্দ আছে তার পরিচয় পাবে না। ছন্দের বোধ না থাকলেও চলতি ছন্দের বিচার করা চলে, কেননা চলতি ছন্দের পরিচয় তার কাঠামো দিয়ে। কাঠামোটায় শুধু যে ধ্বনি আছে তা নয়, তার রূপও আছে। কাজেই সেই রূপ দেখে বিচার করে সহজেই বলে দেওয়া চলে কোনো কবিতায় ছন্দ আছে কিম্বা নেই। কিন্তু যে কবিত্বময় সাহিত্যসৃষ্টিতে ভাবের স্ফুরণের সঙ্গে, বিষয়কে বলবার ভঙ্গির সঙ্গে বিচিত্র হয়ে মিশে থাকে ছন্দ, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে নিঃসংস্কারচিত্ত হয়ে তার ছন্দের গতিকে লক্ষ করা প্রয়োজন। আসলে গোল বেধেছে এই শ্রেণীর রসসৃষ্টির সংজ্ঞা নিয়ে। অর্থাৎ এইজাতীয় সাহিত্যকে কী নাম দেবে? বরাবর কবিতা বলতে যা বুঝে আসা হয়েছে, এ জিনিস যে তা নয় তা অবশ্য সত্য। কিন্তু একে কবিতা ছাড়া আর কি বলা যায় তাও তো বলা কঠিন। এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে, চিরাচরিত নিয়মে ছন্দের কাঠামোকে মেনে নিয়েও অনেকে এমন রচনা করেন যার নাম আইনত কবিতা হলেও তা কবিতা হয় না, রসের অভাবে, ভাবের দৈন্যে এবং ছন্দ সম্বন্ধে কবির অজ্ঞতার জন্যে। এ ক্ষেত্রেও অনেক কবির কবিতায় সেই ত্রুটি ঘটে এবং যেখানে ত্রুটি ঘটে সেখানে সেটা ব্যর্থ হয়। সত্যিকার কাব্যবিচারের দিক্ থেকে দেখতে গেলে এ কথা মানতেই হয় যে, যাকে কবিতা বলে পরিবেশন করছ সেটা ভাব ও রস -যোগে সত্যি কবিত্বময় কি না; তা যদি হয় তা হলে তা পাঠককে আনন্দ দেবেই। সংস্কৃত সাহিত্যে বিস্তর কবিতায় ছন্দ আছে, কিন্তু সেগুলো মিল-করা কবিতা নয়, ছন্দের বিশেষত্বের জন্যে সেগুলোর ধ্বনি কানে বাজে।[১]

---

১ দ্রষ্টব্য : 'গদ্যছন্দ' তৃতীয় বিভাগ উপান্ত্য অনুচ্ছেদ, এবং পঞ্চম বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদে 'বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ।

কথা উঠেছে যা পড়ে মুখস্থ করা যায় না, তা আবার কবিতা হয় কেমন করে। এক দিক্ দিয়ে কথাটা ঠিক। আমরা যাকে গদ্যকবিতা বলছি তা মুখস্থ করা যায় না।[১] সেইজন্যেই বলছি, এ সাহিত্যের বিচার এর ভাব, কবিত্ব এবং রসবস্তুর দিক্ থেকে হচ্ছে না। এর বিচার নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সে তর্কটা প্রধানত এর নামকরণ নিয়ে। এ নামের জন্যে কোনো এক পক্ষের জিদের কথা না-হয় বাদ দেওয়া গেল। কবিতা নাম দিয়ো না, অন্য কোনো নাম দাও, তাতেই বা ক্ষতি কি? আসল বলবার কথা হচ্ছে, সাধারণত কবিতা পড়ে আমরা যে রস উপভোগ করি সেটা চলতি গদ্যে পরিবেশন করা সম্ভব নয় এবং এও ঠিক যে, ছন্দিত গদ্যের[২], যাকে গদ্যকবিতা বলা হচ্ছে তার বক্তব্যকে তার রসকেও চলতি গদ্যে কিছুতেই বলা চলে না। সত্যি কথা বলতে কি, এই শ্রেণীর রচনায় যে ছন্দের পরিচয় পাই সেটা স্বাভাবিক। কেননা তা ভাবের সম্পূর্ণ অনুবর্তী, এক সঙ্গে চলে নিঃসংকোচে, এদের মধ্যে ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্বন্ধ নেই, কেউ কারো ভয়ে ত্রস্ত নয়। যা হোক, এই শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টির ছন্দ-বিশেষত্বের সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলার চেয়ে পড়ে শোনাতে পারলে অনেকের কানে এর ছন্দ ধরা পড়তে পারে।[৩]

এ রকমের রসসাহিত্যের বাহন বাইরের পেটেণ্ট ছন্দ হতে পারে না। দেবতাদের যেমন তাঁদের নিজস্ব বাহন থাকে, এ সাহিত্যের বাহন তেমনি ভাবুকের কিম্বা কবির নিজের ভাবছন্দ। ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে অন্য কোনো আস্তাবলের জীবের তুলনা হয় না, ইন্দ্র স্বয়ং যাকে পছন্দ করে নিয়েছেন সেই তাঁর বাহন। গদ্যকবিতার ছন্দ-নির্বাচনও কতকটা তেমনি।

---

১ স্মরণীয়: 'যে সুনিবিড় সুনিয়মিত ছন্দ…এখন আর নেই।'—'গদ্যছন্দ' পঞ্চম বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ এবং আনুষঙ্গিক পাদটীকা।

২ অর্থাৎ rhythmic prose। অন্যত্র বলা হয়েছে 'তৈজস গদ্য'— 'গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ' তৃতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বিভাগ প্রথম অনুচ্ছেদ শেষ মন্তব্য।

৩ গদ্যকাব্যের আবৃত্তি-প্রসঙ্গে এই কবিতাংশটুকু স্মরণীয়—

বললে, "তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।"
—'আকাশ-প্রদীপ', ময়ূরের দৃষ্টি [১৯৩৯ এপ্রিল]

দ্রষ্টব্য: 'গদ্যছন্দ' তৃতীয় বিভাগ তৃতীয় অনুচ্ছেদ ও আনুষঙ্গিক পাদটীকা।

যারা বাঁধা নিয়মে ঘরবাড়িতে বাস করে তাদের সঙ্গে যদি হা-ঘরের দলের তুলনা করা যায়, তা হলে সে তুলনায় বিচারে ভুল করা হবে। হা-ঘরের দল জায়গায় জায়গায় বাসা বাঁধে তাদের প্রয়োজনের অনুরূপে, তাই তাদের ঘরের সঙ্গে মামুলি গৃহস্থদের ঘরের তুলনা করা চলে না। তাদের ঘরের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাদের মধ্যে মিশতে হবে, সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে তাদের ঘর, বুঝতে হবে তাদের ভাব। তবেই জানা যাবে তাদের সত্যিকারের পরিচয়। এরা তো আর পৈতৃক ভিটেতে উত্তরাধিকারসূত্রে বাস করে না, তাই এদের সঙ্গে সকলের পরিচয় চট করে ঘটে না। এরা এদের বিশেষ স্বভাবের জন্যে সাধারণের পরিচয়ক্ষেত্রে তেমন অন্তরঙ্গ নয়। আমরা যাকে গদ্যকাব্য বলি তারও অবস্থা কতকটা এই রকমের। এরা অফিসিয়াল পাসপোর্ট নিয়ে সাহিত্যরাজ্যে আসে নি বলে এদের গতি অবাধ নয়, মানুষ তাদের চিত্তরাজ্যে এদের প্রবেশের অধিকার সহজে দিতে প্রস্তুত নয়। কেননা, এর ছন্দে প্রচলিত কোনো ছন্দের বা তার কোনো কাঠামোর ছাপ নেই। এরা যদি প্রচলিত ছন্দের পাসপোর্ট নিয়ে সাহিত্যে প্রবেশ করত, তা হলে ভাব কিম্বা রসের দিক্ থেকে অপাঙ্‌ক্তেয় হলেও এরা সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশের অবাধ অধিকার পেত। কিন্তু এদের বিশেষত্ব হচ্ছে এরা পূর্ব হতে তৈরি-করা পাসপোর্ট নিয়ে চলে না, এরা চলে নিজের ভাববিশেষের নিজস্ব ছন্দ নিয়ে। অর্থাৎ এরা পরের দ্বারা পরিচিত হতে চায় না। এদের প্রকাশ হচ্ছে নিজের তৈরি ছন্দে, নিজের সৃষ্টি-করা আনন্দে। এই সাহিত্যের ছন্দ নিজস্ব এবং এই ছন্দ ভাব-অনুপন্থী বলেই গদ্যকবিতার ভাবে ও রচনার যোগ্যতায় পটুত্বের অভাব ঘটলে সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। এইজন্যে যাঁরা গদ্যকাব্য সৃষ্টি করবেন তাঁদের যথেষ্ট সাবধান হতে হবে, কারণ তাঁদের চলতে হবে নিজের রাস্তায় নিজের জোরে নিজের পরিচয়ে।

গদ্যছন্দের গোড়ার কথা হচ্ছে, ছন্দকে ভাবের বাহন করতে হবে। সেইজন্যেই গদ্যকবিতা রচনাও সহজ নয়। বাঁধা নিয়মের ছন্দের অনুগামী হয়েই যে প্রচলিত কবিতার সব ভাব চলে তা সর্ব ক্ষেত্রে ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভাব বিশেষ ছন্দের উপর ভর করে, কেননা সেই ছন্দ সেই ভাবের অনেকটা অনুপন্থী, কিন্তু অনেকটা হলেও ঠিক অনুপন্থী হয় না। ঐরকম কবিতায় ভাব এবং ছন্দের মধ্যে একটা আপসরফার সম্বন্ধ ঘটে।

কিন্তু গদ্যকবিতায় সে রকমটি হবার উপায় নেই। এই কবিতায় ছন্দকে ভাবের হুকুম মানতেই হবে, তা না হলে গদ্যকবিতায় কবিতা বাদ পড়ে শুধু গদ্যই থেকে যাবে।

কাব্যের ধর্ম হচ্ছে রসসৃষ্টি করা। যদি এই শ্রেণীর অপ্রচলিত ছন্দের রচনায় কাব্যরস থাকে তা হলে তাকে কবিতা বা কাব্য বলে গণ্য করায় ক্ষতি কি? সাহিত্যে এমন অনেক রচনার পরিচয় পাওয়া যায় যা পাঠকের চিত্তে কাব্যরসের আনন্দ দেয়, অথচ সেই ভাব ও রসের বাহন প্রচলিত ছন্দ নয়। সেইসব রচনার মধ্যে যে ছন্দ আছে তা প্রচলিত ছন্দের কোঠায় পড়ে না। তাই বলে যদি তার রসাস্বাদনে বিমুখ হও এবং তার ছন্দের বিশেষত্বের পরিচয় জানতে না চাও, তা হলে উপাদেয় বস্তুর আস্বাদ থেকে বঞ্চিতই হতে হবে।

দেশ, ১২ মাঘ ১৩৪৭ : 'রবীন্দ্র-দৈনিকী' (গদ্যকবিতার ছন্দ)

অনুষঙ্গ ৪

ইংরেজি গীতাঞ্জলির গদ্যরূপ[১]

I have greatly enjoyed reading two of my *Gitanjali* poems done into verse by your friend and thank you for sending them to me. It was the want of mastery in your language which originally prevented me from trying English metres in my translation.[২] But now I have grown reconciled to my limitations through which I have come to know the wonderful power of English prose. The clearness, strength and the suggestive music of well-balanced English sentences make it a delightful task for me to mould my Bengali poems into English prose form.[৩] I think one should frankly give up the attempt at reproducing in a translation the lyrical suggestions of the original verse and substitute in their place some new quality inherent in the new vehicle of expression.[৪] In English prose there is a magic which seems to transmute my Bengali verses into something which is original again in a different manner. Therefore, it not only satisfies but gives me delight to assist

---

১ কালক্রমের হিসাবে দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত।

২ রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি (অমিল) ছন্দে রচিত অন্ততঃ পাঁচটি ছোটো ছোটো কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। 'ছন্দ-ধাঁধা' প্রথম পর্যায়ের 'কবিকাহিনী'-শীর্ষক কবিতাটি মডার্ন রিভিউ (১৯২১ সেপ্টেম্বর) ও বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় (১৯২৫ জানুআরি) প্রকাশিত হয় যথাক্রমে "The Song" ও "The Song Bird" নামে। এটি এবং আর চারটি অপ্রকাশিত কবিতা পরে বিনা নামে সংকলিত হয় এড্ওয়ার্ড টম্সন -প্রণীত *Rabindranath Tagore* গ্রন্থে : প্রথম সংস্করণ (১৯২৬), পৃ ২৮২-৮৩ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৪৮), পৃ ২৬৯-৭০।

৩ স্মরণীয় : 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ-প্রসঙ্গ— 'গদ্যছন্দের স্বরূপ' প্রথম পর্যায়, চতুর্থ অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা।

৪ তুলনীয় : 'সংস্কৃত কাব্য অনুবাদ··· রক্ষা করা সহজ নয়।' —বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দ।

my poems in their English rebirth, though I am far from being confident in the success of my task.

অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনকে লেখা পত্র : ১৯১৮ এপ্রিল ১৪ ;
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি।

গদ্যকবিতার আদর্শ

গদ্যকে গদ্য বলে স্বীকার করেও তাকে কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দিলে আচার-বিরুদ্ধ হলেও সুবিচারবিরুদ্ধ না হতেও পারে, যদি তাতে কবিত্ব থাকে। ইদানীং দেখছি গদ্য আর রাশ মানছে না, অনেক সময় দেখি তার পিঠের উপর সেই সওয়ারটিই নেই যার জন্যে তার খাতির।[১] ছন্দের বাঁধা সীমা যেখানে লুপ্ত, সেখানে সংগত সীমা যে কোথায় সে তো আইনের দোহাই দিয়ে বোঝাবার জো নেই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই বাঁধন-ছাড়ার বিধান আপনি গড়ে উঠবে। এর মধ্যে আমার অভিরুচিকে আমি প্রাধান্য দিতে চাই নে। নানারকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠছে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আদর্শ ক্রমে দাঁড়িয়ে যাবে। আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।[২]

তুমি যে রচনাটি পাঠিয়েছ তাকে কবিতা বলে মেনে নিতে দ্বিধা করি নে, যদিও তুমি অসংকোচে তাকে গদ্যের পুরুষবেশ পরিয়েছ। একটুও বেমানান হয় নি। গদ্যসওয়ারি কবিতার শাড়িশেমিজ নেইবা রইল।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লেখা পত্র : ১৩৪৩ আশ্বিন ২৮ ;
নিরুক্ত ১৩৫১ আশ্বিন। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ফোটো-প্রতিলিপি।

১ দ্রষ্টব্য : 'গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ' তৃতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ উপান্ত্য অনুচ্ছেদ, 'গদ্যকবিতার ভাষা ও ছন্দ' প্রথম পর্যায় অন্তিম অনুচ্ছেদ, এবং 'গদ্যকাব্যের ছন্দপ্রকৃতি' প্রথম পর্যায় উপান্ত্য অনুচ্ছেদ।

২ দ্রষ্টব্য : 'গদ্যছন্দ' পঞ্চম বিভাগ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

ছন্দোহার ২

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত

১

সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষকেই মনে হত সকলের সেরা।
ভাষার মুখরতায় তার নৈপুণ্য। সেই ভাষা
চিহ্ন ও সংকেতের এমন যোগাযোগ, যাতে বাঁচিয়ে রাখে
তার ভাবনা তার বাক্য।
তারি পরে আপন বুদ্ধিকে সে লাগিয়ে রেখেছে,
আপন প্রাণবায়ু খরচ করছে তাই নিয়ে।
কেউ বা গুঞ্জরিত করছে দুঃখের নিবিড়তা,
কেউ বা বিশ্বসংসারে প্রচার করছে হৃদয়ের মহত্ত্ব।
তার আয়ুর মেয়াদ অন্য প্রাণীর মতোই পরিমিত,
তবু তার বাণী হাজার হাজার বছর প্রতিধ্বনিত হয়।
কিন্তু হে ঝিল্লি, এর কিছুই তোমার নেই জানা।
তোমার সুর তুমি রচনা কর প্রতিক্ষণে নিজের জন্যেই।
বসে বসে ভাবছিলাম এইসব কথা,
তুলনা করছিলেম একের সঙ্গে আর, ক্ষতির সঙ্গে লাভ,
এমন সময় হঠাৎ ঘনিয়ে এল কালো মেঘ,
মাথার উপরে ঝলসে উঠল [বিদ্যুৎ], গর্জে উঠল ঝড়,
মেঘ-ডাকা আকাশ থেকে ঝরতে লাগল
মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটা।
চুপ করে গেল ঝিল্লির ধ্বনি ॥[১]

—গদ্যছন্দ

১ একটি চৈনিক কবিতার অনুবাদ।

২

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললে[১],

"ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার?"

তিনি বললেন, "জানি নে তাত, কী গোত্র তুমি।

যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি,

তাই জানি নে তোমার গোত্র।

জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,

তাই বোলো, তুমি সত্যকাম জাবাল।"

সত্যকাম বললে হারিদ্রুমত গৌতমকে,

"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।"

তিনি বললেন, "সৌম্য, কী গোত্র তুমি?"

সে বললে, "আমি তা জানি নে।

মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমার গোত্র কী।

তিনি বলেছেন, যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম

তোমাকে পেয়েছি।

আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,

বোলো, আমি সত্যকাম জাবাল।"

তিনি তখন বললেন, "এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।

সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি।

সমিধ্ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।"[২]

—গদ্যছন্দ

১ এই আখ্যান-কবিতাটির প্রাথমিক খসড়ায় (১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি) দুই স্থলেই 'সত্যকাম বললেন' লিখে পরে 'ন' কেটে দেওয়া হয়েছে। তার পরে আছে 'সে বললে'। এটির পরিমার্জিত পাঠে (১৬-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি) প্রথম স্থলে আছে 'বললেন', অন্যত্র আছে 'বললে'। বর্তমান পাঠে কবির অভিপ্রায় অনুসারে প্রথম ক্ষেত্রেও 'বললে' করে দেওয়া হল।

২ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ড। এই রচনাটির পদ্যরূপ আছে 'চিত্রা' কাব্যের 'ব্রাহ্মণ'-নামক কবিতাটিতে।

৩

আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে।
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
নবীন পথিক, তোমারি কথা মনে করে।
যেন, সময় হলে একদিন বলতে পারো
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে ॥[১]

—গদ্যছন্দ

১ দ্রষ্টব্য : প্রাসঙ্গিক 'পাঠপরিচয়' এবং 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধের শেষ মন্তব্য।

সম্পূরণ ২

প্রথম পর্ব

ছন্দের সার্থকতা

এবারে এই বিলের পথ দিয়ে কালীগ্রামে আসতে আসতে আমার মাথায় একটি ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠেছে। কথাটা নতুন নয়, অনেক দিন থেকে জানি, কিন্তু তবু এক-একবার পুরোনো কথাও নতুন করে অনুভব করা যায়। দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না— অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং শোভা দেয়; তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটে ওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র লোকের মতো মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক-একটি মূর্তিমান্ অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেইরকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই; সে একটা বৃহৎ বিশেষত্বহীন বিলের মতো। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে, কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিক্‌বিদিক্ গ্রাস করে পড়ে আছে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার আবশ্যক হয় তবে তাকে ছন্দের সকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয়; নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে এক দিকে ধাবিত হতে পারে না। বিলের জলকে পল্লিগ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল— তার কোনো ভাষা নেই, আত্মপ্রকাশ নেই। তটবদ্ধ নদীর মধ্যে সর্বদা একটা কলধ্বনি শোনা যায়; ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিলে কথাগুলোও সেইরকম পরস্পরের প্রতি আঘাত সংঘাত করে একটা সংগীতের সৃষ্টি করতে থাকে। সেইজন্যে ছন্দের ভাষা বোবা ভাষা নয়, তার মুখে সর্বদাই কলগান। বাঁধনের মধ্যে থাকাতেই গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য এবং আকারের সৌন্দর্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে, ওটা একটা কৃত্রিম-অভ্যাস-জাত সুখ দেবার জন্যে নয়— ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সুখ আছে। অনেক মূর্খ মনে করে কবিতায় ছন্দোবন্ধ কেবল একটা

বাহাদুরি করা, ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে সুখ দেয়— ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সে ভারী ভুল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে, বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্যই সেই নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে।[১] একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে বলেই সৌন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি। আর, সুষমার বন্ধন ছাড়িয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায়, তার আর আঘাত করবার শক্তি থাকে না। বিল ছাড়িয়ে যেমনি নদীতে এবং নদী ছাড়িয়ে যেমনি বিলে গিয়ে পড়ছিলুম অমনি আমার মনে এই তথ্যটি দেদীপ্যমান হয়ে জেগে উঠছিল।

পতিসর ১৮৯৩। অগস্ট ১৬

ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১০৯

অনুষঙ্গ ১

মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ

কি তাঁহার অভিমন্যুবধ, আর কি তাঁহার রাবণবধ— এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।··· আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকার ও শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়,ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।

ভারতী ১২৮৮ মাঘ : 'সংক্ষিপ্ত সমালোচন : রাবণ বধ ও অভিমন্যুবধ দৃশ্যকাব্য' (অংশ)

'ছবি ও গান' কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ

প্রথম পর্যায়

ছন্দের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই পুস্তকের কোনো কোনো গানে ছন্দ নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে-সকল পাঠকের

১ দ্রষ্টব্য : 'সংগীত ও ছন্দ', দ্বিতীয় বিভাগ, প্রথম অনুচ্ছেদ।

কান আছে, তাঁহারা ছন্দ খুঁজিয়া লইবেন, দেখিতে পাইবেন বাঁধাবাঁধি ছন্দ অপেক্ষা তাহা শুনিতে মধুর। হসন্ত বর্ণকে অকারান্ত করিয়া পড়িলে কোনো কোনো স্থলে ছন্দের ব্যাঘাত হইবে।

ছবি ও গান (প্রথম সং, ১২৯০ ফাল্গুন) : বিজ্ঞাপন

দ্বিতীয় পর্যায়[১]

ছবি ও গানে তুমি আমার ভাঙা ছন্দ দেখে হেসেচ— ভেবেচ ছেলেরা হাঁটতে গিয়ে যেমন পড়ে, ওর ছন্দঃপতনও তেমনি। ঠিক তা নয়— আমি আজন্মকাল বিদ্রোহী— বালকবয়সেও স্পর্ধার সঙ্গে বাঁধা ছন্দের শাসন অস্বীকার করেই কবি-লীলা স্থরু করেচি। বাঁধনে ধরা দিতে আপত্তি করি নে যদি ধরা না দেবারও স্বাধীনতা থাকে। ঘরে বাস করতে হয় বলেই যদি বাগানে বেরোলেই লোকে চার দিক্ থেকে তেড়ে আসে তা হলে সেটা তো হোলো জেলখানা। বস্তুত কাব্যে দেয়াল-ছাঁদা ঘরও কবির, নির্দেয়াল বাগানও তার। আমার কবিতায় কোথাও কোথাও ছন্দের দেয়াল দেওয়া নেই বলে মনে কোরো না ইটের পাঁজা পোড়ে নি, মিস্ত্রির মজুরীর অভাব।

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা পত্র : ১৯৩১ নভেম্বর ১৫ ;
চিঠিপত্র, নবম খণ্ড (১৩৭১ বৈশাখ ২৫), পত্র ৫৯

অনুষঙ্গ ২

সাধুছন্দে হসন্ত শব্দের মাত্রানিরূপণ

তুমি যদি 'কই' শব্দের শেষ 'ই'-টির মাত্রা বাজেয়াপ্ত করতে চাও তবে অন্যায় হবে না? আমার দৃষ্টান্তে দৈবক্রমে 'কই' কথাটা পদের শেষে পড়ে গেছে। তাই ফাঁক পেয়ে সেই ফাঁকের উপর দিয়ে মাত্রাটা চালিয়েছ। কিন্তু যদি "কই শয্যা, কই বস্ত্র" হত তা হলে কী রকম করে এমন অবৈধাচরণ করতে পারতে? বস্তুত ইকারের পরে ফাঁক নেই— ক-এর অ-টাকে দীর্ঘ ক'রে ই-এর হ্রস্বতা পূরণ করা হয়। সে তো সকল হসন্ত বর্ণের সম্বন্ধেই খাটে— "কোথা জল, কোথা

১ কালক্রমের হিসাবে দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

যুক্তস্বরবর্ণ অথবা স্বরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বাংলা ছন্দে মাত্রা গণনায় বিকল্পে এক বা দুই মাত্রার সম্মান পেয়ে থাকে। "আইল", "হইল", "আইলা" "তুইও" সম্বন্ধে এই নিয়ম। হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের যোগেও এই বিকল্পের উদ্ভব হয়। যথা "ডেকেছিলাম তুমি।" তাকে আমরা সাধুভাষার বলি যে হসন্ত শব্দের দাবী মানতে চায় না — হসন্তের মাত্রা চলতি ভাষায়। সাধুভাষার ও লোকভাষার ভেদে একই ভাষায় দু রকমের প্রথা চলছে।

"বিহ্বল কামনার" স্থলে "বিহবল প্রণয়" ব্যবহার করেছি সে আমার ক্লান্তিযুক্ত মস্তিষ্কের প্রমাদবশত।

মাত্রাগণনার ঠিক নিয়ম বাংলায়
য় বিচারে চলে না, তার স্থিতি-
পকতা বিচার করতে হয়।

ছন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক করতে আর
আমার রুচি নেই। ছন্দের নিয়মটা
আবিষ্কার যোগ্য বিষয় বটে — কিন্তু ছন্দ
ব্যবহার করবার কালে আরো বেশি
কিছু আবশ্যক হয় সেটা কাউকে
শিখিয়ে দেওয়া যায় না — এর বেলাও
খাটে "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"
বিবেচনার বস্তু রাখছি। ইতি
২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছন্দের মাত্রাগণনায় স্থিতিস্থাপকতা বিচার

স্থল"— এখানে মাত্রার ওজন যদি দেখ তবে দেখবে 'জ' যত বড় 'ল্' তত বড় নয়— সেইজন্যে জ-টাকে দেড়মাত্রা করতে হয়েছে।[১] তোমার বিধি অনুসারে 'জল্'-কে এক মাত্রা করে ফাঁকের উপরে আর-এক মাত্রা ফেলতে হয়। কিন্তু সেটা সাধু ছন্দের নিয়মবিরুদ্ধ। "সেইত বহিছে বায়ু", এখানে তুমি 'সেই'-এর 'ই'-টিকে কি বিমাত্র বলে গণ্য করবে?

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা পত্র : ১৩২১ আষাঢ়?

'ছন্দ' (রচনাবলী ২১, বি ভা. সং ১৩৫৩), গ্রন্থপরিচয়

অনুষঙ্গ ৩

ছন্দের মাত্রাগণনায় স্থিতিস্থাপকতা-বিচার

যুগ্মস্বরবর্ণ[২] অথবা স্বরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বাংলা ছন্দে মাত্রাগণনায় বিকল্পে এক বা দুই মাত্রার পরিমাণ পেয়ে থাকে। 'আইহন', 'হইল', 'আইলা', 'তুইও' শব্দে এই নিয়ম। হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের যোগেও এই বিকল্পের উদ্ভব হয়। যথা 'ভেবেছিলাম্ তুমি'। যাকে আমরা সাধুভাষা বলি সে হসন্ত শব্দের দাবী মানতে চায় না— হসন্তের আদর চলতি ভাষায়। শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের ভেদে একই ভাষায় দু-রকমের প্রথা চলচে।[৩]... মাত্রাগণনার বাঁধা নিয়ম বাংলা ছন্দ-বিচারে চলে না, তার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করতে হয়।[৪]

১ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগের শেষ অনুচ্ছেদ, 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ-১' তৃতীয় প্রসঙ্গে 'মহাভারতের কথা' ইত্যাদির বিশ্লেষণ, এবং 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদ, 'ছন্দের মাত্রা গণনায় স্থিতিস্থাপকতা-বিচার' প্রথম অনুচ্ছেদ, এবং প্রাসঙ্গিক পাদটীকা।

২ অই্, আই্, উই্ প্রভৃতি যুগ্মস্বরবর্ণকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় 'রুদ্ধস্বর' (closed vowel)।

৩ তুলনীয় : "বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে।... এইজন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।"—'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত-২', দ্বিতীয় বিভাগ, প্রথম অনুচ্ছেদ। এই বিকল্পনীতি প্রয়োগ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 'মহাভারতের কথা' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি।—'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ-১', তৃতীয় প্রসঙ্গ, শেষ অনুচ্ছেদ।

৪ 'স্থিতিস্থাপকতা'-র ব্যাখ্যা এবং মাত্রাগণনা-পদ্ধতি সম্পর্কেও দ্রষ্টব্য উল্লিখিত 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত-২' ও 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ-১', এই দুই রচনার উক্ত দুটি অনুচ্ছেদ।

ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক করতে আর আমার রুচি নেই। ছন্দের নিয়মটা জানবার যোগ্য বিষয় বটে। কিন্তু ছন্দ ব্যবহার করবার কালে আরো বেশি কিছু আবশ্যক হয়, সেটা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। এর বেলাও খাটে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।

প্রবোধচন্দ্র সেনকে লেখা পত্র : ১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ২ ;
প্রবোধচন্দ্র সেন -প্রণীত 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' (১৩৮১ বৈশাখ) গ্রন্থে (পৃ ৪৫৪)
সম্পূর্ণ পত্র প্রতিলিপিসহ মুদ্রিত।

গ্রন্থপরিচয়

মুখবন্ধ

'ছন্দ' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের আষাঢ় মাসে। অতঃপর বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর একবিংশ খণ্ডে গ্রহণকালে (১৩৫৩ শ্রাবণ) এই গ্রন্থটিকে নূতন ও পূর্ণতর রূপ দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এই রচনাবলী -সংস্করণটি অনেকাংশেই পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় সংস্করণের আদর্শ ও বিন্যাসরীতির অনুসরণে পুনর্গঠিত। তা ছাড়া, দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য সংগৃহীত বহু নূতন উপাদানও তাতে সন্নিবেশের সুযোগ পাওয়া যায়।

উক্ত পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৬৯ কার্তিক) রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিষয়ক প্রধান রচনাগুলিকে যথাসম্ভব কালক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়। ভাবানুষঙ্গ রক্ষার প্রয়োজনে কোনো কোনো স্থলে কালক্রমের কিছু ব্যত্যয় করতে হয়েছিল। গৌণ রচনাগুলিকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়ে সেগুলিকেও সাজানো হয়েছিল পৌর্বাপর্য রক্ষার নীতি অনুসারেই। দ্বিতীয়তঃ, সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশকালে বিভিন্ন প্রবন্ধের যে বিন্যাসরূপ ছিল, এই সংস্করণে তার ব্যতিক্রম করা হয় নি। অবশ্য প্রথম গ্রন্থভুক্ত করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিষয়গত যেসব পরিমার্জনা করেছিলেন তা অব্যাহত রাখা হয়। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কোনো কোনো প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ প্রথম সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে সেই অংশগুলিকে পুনর্গ্রহণ করে [ ] এই বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে স্থাপন করা হয়। আর অন্যান্য সমস্ত পার্থক্যের বিষয় সূচিত হয় পাঠপরিচয় বিভাগের যথানির্দিষ্ট স্থানে। তৃতীয়তঃ, যেসব রচনার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে প্রকাশিত রচনা ও পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে সংশয়স্থলে যথার্থ পাঠনিরূপণের চেষ্টা করা হয়। চতুর্থতঃ, প্রথম সংস্করণে ধরা হয় নি, এমন বহু পূর্বতন প্রবন্ধ এবং তার পরে প্রকাশিত বহু রচনা ও ভাষণ দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান পায়। তা ছাড়া, অপ্রকাশিত চিঠিপত্র প্রভৃতি অনেক নূতন উপাদান রবীন্দ্রভবনে বা অন্যত্র রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করে গ্রন্থভুক্ত করা হয়।

কোনো কোনো প্রবন্ধ মূলতঃ রচিত এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল সাধু ভাষায়। কিন্তু প্রথম গ্রন্থভুক্তির সময়ে সেগুলি চলতি ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে পুরোপুরিভাবে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত

মূলপাঠই অনুসৃত হয় এবং ফলে তৎকালীন মূল ভাষারীতিও রক্ষিত হয়। বিশ্বভারতী রচনাবলী -সংস্করণেও এই নীতি স্বীকৃত হয়েছিল। এ সম্পর্কে প্রবন্ধগুলির স্বতন্ত্র পাঠপরিচয় দ্রষ্টব্য। কোনো কোনো প্রবন্ধ বা প্রবন্ধাংশ প্রসঙ্গের সাদৃশ্যহেতু পূর্বপ্রকাশিত অন্য প্রবন্ধের সঙ্গে তার নূতন অথচ স্বতন্ত্র অঙ্গ-রূপে একত্র গ্রথিত হয় এবং গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে তার পরিচয় দেওয়া হয়।

কোনো কোনো রচনা লিখিত ভাষণরূপে জনসমক্ষে পঠিত হয়েছিল। কিন্তু স্বরূপতঃ সেগুলি প্রবন্ধই এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশকালে তথা প্রথম গ্রন্থভুক্তির সময়ে এগুলি প্রবন্ধরূপেই স্বীকৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণেও স্বভাবতঃই এগুলির প্রবন্ধমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। কতকগুলি প্রকাশিত পত্রকেও অনুরূপ মর্যাদা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার পরিচয়লাভের পক্ষে এসব ভাষণপ্রবন্ধ বা পত্রপ্রবন্ধের গুরুত্ব কম নয়।

শুধু নূতন উপাদান-সংকলন এবং মূলগ্রন্থের এসব উন্নতিবিধানেই নয়, বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় ও প্রচুর পাদটীকাযোগে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার স্বরূপ-নির্ণয়ের তথা তার বিবর্তনধারা অনুসরণের প্রয়াসও দ্বিতীয় সংস্করণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কিছুকাল পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডে (১৩৭১ শ্রাবণ) 'ছন্দ' গ্রন্থখানি সংকলিত হয় পুনঃসংস্কৃত রূপে। এই সংস্করণে উক্ত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ ও পদ্ধতিই অনুসৃত হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার বিবর্তন ও ভাবসংগতির প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রেখে প্রবন্ধগুলির বিন্যাসব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তনও করা হয়। তদনুসারে গ্রন্থখানি তিনটি কালপর্বে বিভক্ত হয় এবং তৃতীয় পর্বটিকে 'পদ্যছন্দ' ও 'গদ্যছন্দ' নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। আর, সব ক্ষেত্রেই প্রবন্ধগুলিকে বিন্যস্ত করা হয় যথাসম্ভব কালক্রম অনুসারে। অবশ্য অল্প কয়েক স্থলে কালক্রমের কিছু ব্যত্যয়ও করতে হয় ভাবসংগতির প্রয়োজনে। দ্বিতীয় সংস্করণে যে রচনাগুলি ছিল 'পরিশেষ' ও 'সম্পূরণ' বিভাগের অন্তর্গত, এই সংস্করণে সেগুলি কাল ও বিষয়ানুক্রমে মূলগ্রন্থেই যথাস্থানে স্থাপিত হয়। তবে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও পরিপূরক বিষয়কে 'অনুষঙ্গ' -নামক তিন অংশে বিভক্ত করে একটিকে স্থাপন করা হয়

দ্বিতীয় পর্বের শেষে, আর বাকি দুটিকে স্থাপন করা হয় তৃতীয় পর্বের পদ্য ও গদ্য বিভাগ-দুটির শেষে। যেসব পত্রের মধ্যে ভাবপুষ্টির ক্রম লক্ষিত হয় এবং যেগুলি বস্তুতঃ প্রবন্ধমর্যাদার অধিকারী, সেগুলিকে প্রবন্ধাবলীর মধ্যেই যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে অন্যগুলিকে স্থান দেওয়া হয় অনুষঙ্গ অংশে। তা ছাড়া, রচনাগুলির পরিচয়সূচক অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যগুলি প্রত্যেক রচনার শিরোভাগে এবং অথবা অধোভাগে প্রদত্ত হয়। আর গ্রন্থভুক্ত পাদটীকাগুলিও অনেকাংশে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। কিন্তু এই সংস্করণে গ্রন্থপরিচয় ও নির্দেশিকা অংশ-দুটি রাখা হয় নি।

'ছন্দ' গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের আদর্শই স্বীকৃত হল। তবে এই সংস্করণেও কোনো কোনো বিষয়ে গ্রন্থের উন্নতি ও উপযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষিত হবে।

প্রথমতঃ, মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ, 'ছবি ও গান' কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ-১, ছন্দের সার্থকতা, ছন্দের নিয়ম ও রসতত্ত্ব, বাংলা বানান ও ছন্দ, প্রবহমান ও মুক্তক ছন্দে মাত্রারক্ষা, 'ছবি ও গান' কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ-২, ছন্দের মাত্রাগণনায় স্থিতিস্থাপকতা-বিচার এবং গদ্যছন্দের স্বরূপ-২ —এই নয়টি নূতন রচনা এই সংস্করণে প্রথম সংকলিত হল।

দ্বিতীয়তঃ, উক্ত নয়টি নূতন রচনার মধ্যে 'মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ' এবং 'ছবি ও গান কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়, এই তিনটি পরিপূরক রচনাকে কালক্রম ও ভাবসংগতির বিচারে স্থাপন করা হল প্রথম পর্বের পরে 'অনুষঙ্গ-১' নামে একটি নূতন বিভাগে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলী সংস্করণের তিনটি অনুষঙ্গকে বর্তমান সংস্করণে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অনুষঙ্গ বলে গণ্য করা গেল।

তৃতীয়তঃ, কালক্রম রক্ষার প্রয়োজনে 'যতি ও ছন্দ' এবং 'সাধু ছন্দে হসন্তপ্রয়োগ'— দিলীপকুমার রায়কে লেখা এই দুটি পত্ররচনাকে তৃতীয় অনুষঙ্গ থেকে দ্বিতীয় অনুষঙ্গে স্থানান্তরিত করা হল।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, ছন্দের নিয়ম ও রসতত্ত্ব (প্রথম পর্ব), বাংলা বানান ও ছন্দ (দ্বিতীয় পর্ব), ছন্দের সার্থকতা (প্রথম পর্ব), মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ (অনুষঙ্গ-১), 'ছবি ও গান' কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় (অনুষঙ্গ-১), সাধু ছন্দে হসন্ত শব্দের মাত্রা-নিরূপণ

(অনুষঙ্গ-২) এবং ছন্দের মাত্রাগণনায় স্থিতিস্থাপকতা-বিচার (অনুষঙ্গ-৩) —এই আটটি রচনার প্রতি যথাসময়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়াতে সেগুলিকে বিষয় ও কালক্রমের বিচারে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা যায় নি। এগুলির মধ্যে প্রথম দুটি স্থান পেয়েছে তৃতীয় পর্বের 'পদ্যছন্দ' বিভাগের শেষাংশে 'সম্পূরণ-১' রূপে, আর বাকি ছয়টি স্থাপিত হয়েছে উক্ত পর্বের 'গদ্যছন্দ' বিভাগের শেষাংশে 'সম্পূরণ-২' রূপে। এগুলির যথাযোগ্য স্থান কোথায় তা প্রত্যেকটি রচনার নামের পাশেই নির্দেশ করা হল। গ্রন্থের ভাবী সংস্করণে এই রচনাগুলির বাঞ্ছিত পুনর্বিন্যাসের প্রতি লক্ষ রেখে এগুলিকে 'বিষয়ক্রম' ও 'পাঠপরিচয়' বিভাগে যথাস্থানেই স্থাপন করা গেল।

চতুর্থতঃ, বিষয়প্রসঙ্গ তথা বোধসৌকর্যের প্রতি লক্ষ রেখে পত্র ও ভাষণ প্রভৃতি বিভিন্ন অনামা রচনাকে যথাযোগ্য শিরোনাম দিয়ে নির্দিষ্ট করা গেল।

পঞ্চমতঃ, অপেক্ষাকৃত বড়ো রচনাগুলিকে প্রসঙ্গভেদে সংখ্যানুক্রমে একাধিক বিভাগে বিভক্ত করা হল। তাতে নানা উপলক্ষে প্রসঙ্গোল্লেখের সহায়তা হয়েছে। আশা করা যায়, তাতে পাঠকের পক্ষেও বিষয়ানুধাবনের সহায়তা হবে।

ষষ্ঠতঃ, এবারও গ্রন্থের পাদটীকাগুলিকে পুনর্মার্জিত ও বিশদতর করা গেল। তাতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার স্বরূপ উপলব্ধি সহজতর হবে, এই আমার বিশ্বাস। তা ছাড়া, পাদটীকাগুলিতে পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ না করে বিভিন্ন রচনার বিভাগ, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি উল্লেখ করেই প্রসঙ্গ নির্দেশ করা গেল। তাতে শুধু যে পাঠকের অযথা শ্রম বাঁচবে তা নয়, তাতে ভবিষ্যৎ সংস্করণকর্তার পথও নিষ্কণ্টক হয়ে থাকল।

সর্বশেষে গ্রন্থের বিষয়ক্রম অনুসারে 'গ্রন্থপরিচয়' অংশটিকেও সম্পূর্ণরূপে পুনর্বিন্যস্ত, পরিমার্জিত ও প্রয়োজনমতো পরিবর্ধিত করা গেল। আর, পাঠকের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে 'নির্দেশিকা' অংশটিকেও নূতন ও পরিবর্ধিত রূপ দেওয়া হল।

পর্ববিভাগ

রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার তিন পর্ব। এ স্থলে ওই তিন পর্বের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

১২৮৮ থেকে ১৩১৯ সাল পর্যন্ত যে সময়, তাকে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার প্রথম পর্ব। 'মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ' (১২৮৮ মাঘ) প্রভৃতি মোট চোদ্দটি রচনা এই পর্বের অন্তর্গত। এই পর্বের প্রায় সবগুলি রচনাই সাময়িক পত্র থেকে সংকলিত। এগুলির একটিও প্রথম সংস্করণে ছিল না। বস্তুতঃ এই পর্বটি মূলগ্রন্থের 'অবতারণা' হিসাবেই পরিকল্পিত, কেননা এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হয়। এ পর্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কার্যতঃ একা। এই আলোচনায় আর কাউকে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে দেখা যায় না।

১৩২০ থেকে ১৩৩৮ পর্যন্ত প্রায় দুই দশক কালকে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার দ্বিতীয় পর্ব। বড়ো-ছোটো মিলিয়ে মোট উনিশটি রচনা এই পর্বের অন্তর্গত। তার মধ্যে 'বাংলা ছন্দ' দুই পর্যায়, 'সংগীত ও ছন্দ' এবং 'ছন্দের অর্থ' দুই পর্যায়, এই পাঁচটি প্রকাশিত রচনা মুখ্য। তা ছাড়া, দ্বিতীয় অনুষঙ্গ-ভুক্ত 'প্রস্বর, পর্ব ও মাত্রা'-শীর্ষক অপ্রকাশিত ইংরেজি পত্রপ্রবন্ধটিও মুখ্য রচনা বলেই স্বীকার্য। বাকি তেরোটি গৌণ। কালপরিসরের দিক্ থেকে ক্ষুদ্রতর হলেও এবং মুখ্য রচনার সংখ্যা বেশি না হলেও প্রথম পর্বের তুলনায় এই পর্বের গুরুত্ব বেশি।

প্রথম পর্বের প্রায় সবগুলি রচনাই অন্য প্রসঙ্গের আনুষঙ্গিক অবতারণা-মাত্র। একমাত্র 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' বাদে অন্য কোনো রচনার কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। তা ছাড়া, প্রথম পর্বের কোনো রচনাতেই বাংলা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ বা সুশৃঙ্খল পরিচয় দেবার প্রয়াসও দেখা যায় না। বাংলা ছন্দের সুসংহত ও সুশৃঙ্খল পরিচয় দেবার প্রথম প্রয়াস দেখা দেয় দ্বিতীয় পর্বে।

রবীন্দ্রনাথের মনে উক্তপ্রকার আলোচনার প্রথম প্রেরণা সঞ্চারিত হয় কেমব্রিজের অধ্যাপক এণ্ডারসনের ছন্দ-জিজ্ঞাসার ফলে। এই পর্বের ছন্দ-আলোচনার সঙ্গে নানা সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে আরও কয়েকজন খ্যাতনামা

ব্যক্তি যুক্ত হন— এ দেশে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ফ্রান্সের মনস্বী সিলভ্যাঁ লেভি এবং ইংলন্‌ডের কবি রবার্ট ব্রিজেস্ ও কুইলার কাউচ্।

১৩৩৮ সালের শেষভাগ থেকে তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত হয় প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ-জিজ্ঞাসার প্রেরণায়। এই পর্বের আলোচনার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হন কবি দিলীপকুমার রায়, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, কবি মোহিতলাল মজুমদার ও বিচিত্রা-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই। এই সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রবন্ধাবলীর পরিচয়দান প্রসঙ্গে এঁদের কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

এই তৃতীয় পর্বের স্থায়িত্বকাল মাত্র নয় বৎসর, ১৩৩৮ থেকে ১৩৪৭ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত। পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দ -ভেদে এই সময়ের রচনাগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বড়ো-ছোটো মিলিয়ে দুই শ্রেণীর রচনা-সংখ্যা যথাক্রমে আঠারো ও চোদ্দো, মোট বত্রিশ। বলা উচিত যে, বিষয়গত সংগতি রক্ষার প্রয়োজনে দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত 'ইংরেজি গীতাঞ্জলির গদ্যরূপ' -নামক ইংরেজি পত্রটিকেও তৃতীয় পর্বের গদ্যছন্দ-বিভাগে স্থান দিতে হয়েছে। আর, 'আমার ছন্দের গতি'-নামক রচনাটিতে পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ ছন্দের আলোচনাই স্থান পেয়েছে।

কালপরিসরের বিচারে এই পর্বটিই ক্ষুদ্রতম। অথচ এই পর্বের রচনা-সংখ্যাই সর্বাধিক এবং এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তা দ্বিতীয় পর্বের চেয়েও সংহততর ও পূর্ণতর রূপ ধারণ করে।

কালক্রম

উক্ত তিন পর্বের প্রবন্ধ, চিঠিপত্র এবং ভাষণগুলিকে গদ্যপদ্য ও ভাবানুষঙ্গ-নির্বিশেষে শুধু রচনার বা প্রথম প্রকাশের, কালক্রম অনুসারে নিম্নে তালিকা-আকারে সাজিয়ে দেওয়া গেল। রচনার বা প্রকাশের তারিখ তালিকার ডান পাশে পর্যায়ক্রমে স্থাপিত হল। যেসব স্থলে মূলে ইংরেজি তারিখ আছে সেসব স্থলে ইংরেজির সঙ্গে বাংলা তারিখও দেওয়া গেল। এই আনুক্রমণিকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে রচনাগুলি অনুসরণ করলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার বিবর্তন ও

সামগ্রিক রূপ উপলব্ধি সহজতর হবে সন্দেহ নেই। বিষয়ানুসরণের সৌকর্যার্থে প্রত্যেক রচনার নামের ডান পাশে বর্তমান সংস্করণের পৃষ্ঠাঙ্কও উল্লিখিত হল। সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশের তারিখ এবং তৎকালীন নাম যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা গেল। আর গ্রন্থনাম নির্দিষ্ট হল উদ্‌ধৃতিচিহ্ন-যোগে।

যে তেরোটি রচনা প্রথম সংস্করণেই স্থান পেয়েছিল সেগুলিকে তারকা-চিহ্নযোগে নির্দিষ্ট করা গেল। আর, যে নয়টি রচনা (১, ৩, ৬, ১৩, ১৮, ২৬, ৩৩, ৫০ এবং ৬৫ -সংখ্যক) এই সংস্করণেই প্রথম সংকলিত, সেগুলি নির্দিষ্ট হল ছুরিকাচিহ্নযোগে। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম গৃহীত রচনাগুলি অচিহ্নিত।

প্রথম সংস্করণের (১৩৪৩ আষাঢ়) রচনাসংখ্যা তেরো, দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৬৯ কার্তিক) প্রথম সংকলিত রচনার সংখ্যা তেতাল্লিশ, এবং বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে প্রথম স্বীকৃত রচনার সংখ্যা নয়। মোট পঁয়ষট্টি।

প্রথম পর্ব : ১২৮৮-১৩১১

†১ মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ :
সমালোচনা, 'রাবণবধ ও অভিমন্যুবধ' ২৪১
ভারতী — ১২৮৮ মাঘ

২ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ : সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, 'সিন্ধুদূত' ৩
ভারতী — ১২৯০ শ্রাবণ

†৩ 'ছবি ও গান' কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ-১ : বিজ্ঞাপন ২৪৭
'ছবি ও গান' (প্রথম সং) — ১২৯০ ফাল্গুন

৪ বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর : ভূমিকা ৬
'মানসী' (প্রথম সং) — ১২৯৭ পৌষ

৫ বাংলা শব্দ ও ছন্দ ৭
সাধনা — ১২৯৯ শ্রাবণ

†৬ ছন্দের সার্থকতা (পত্র) ২৪৬
'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র ১০৯ — ১৮৯৩ অগস্ট ১৩ | ১৩০০ শ্রাবণ ২৯

৭ বিহারীলালের ছন্দ : বিহারীলাল (অংশ) ১০
সাধনা — ১৩০১ আষাঢ়

দ্বিতীয় পর্ব : ১৩২০-১৩৩৮

তৃতীয় পর্ব : ১৩৩৮-১৩৪১

*৩৪ ছন্দের হসন্ত-হলন্ত-১ : বাংলা ছন্দ (অংশ) ৯৩
বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ

*৩৫ ছন্দের হসন্ত-হলন্ত ২য় পর্যায় ১০০
পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ

৩৬ ছন্দবিচার-১ (আলোচনা, অংশ) ১২২
বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ

৩৭ ছন্দ বিচার-২ : কবির পুনশ্চ বক্তব্য ১২৭
বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ

৩৮ বাংলা প্রাকৃত ছন্দ-১ : ছন্দবিতর্ক ১৭৮
পরিচয় ১৩৩৯ শ্রাবণ

৩৯ গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ-১ : গদ্য ও পদ্যের চাল (পত্র) ২০১
'ছন্দ' (১৩৬৯ কার্তিক) ১৯৩২ জুলাই ২২ । ১৩৩৯ শ্রাবণ ৬

৪০ গদ্য কবিতার রূপ ও বিকাশ-২ : গদ্যরীতির প্রবর্তন ২০১
'পুনশ্চ' কাব্য (প্রথম সং), ভূমিকা ১৩৩৯ আশ্বিন

৪১ গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ-৩ : 'পুনশ্চ' কাব্যের গদ্যরীতি-এক ২০২
'ছন্দ' (১৩৬৯ কার্তিক) ১৩৩৯ আশ্বিন ২৬

৪২ ছন্দের হসন্ত-হলন্ত-৩ : নবছন্দ (প্রথমাংশ) ১১৮
পরিচয় ১৩৩৯ কার্তিক

*৪৩ ছন্দের মাত্রা-১ : নবছন্দ (শেষাংশ) ১২৮
পরিচয় ১৩৩৯ কার্তিক

৪৪ গদ্য কবিতার রূপ ও বিকাশ-৩ : 'পুনশ্চ' কাব্যের গদ্যরীতি-দুই (পত্র) ২০৩
'ছন্দ' (১৩৬৯ কার্তিক) ১৩৩৯ কার্তিক ৭

*৪৫ গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ-৩ : 'পুনশ্চ'কাব্যের গদ্যরীতি-তিন (পত্র) ২০৩
পরিচয় (১৩৪০ বৈশাখ) ১৩৩৯ কার্তিক ১২

৪৬ ছান্দসিক ও ছন্দরসিক (পত্র) ১৮৯
'ছন্দ' (১৩৬৯ কার্তিক) ১৩৩৯ মাঘ ১৩

*৪৭ ছন্দের প্রকৃতি : ছন্দ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত) ১৫১
উদয়ন (১৩৪১ বৈশাখ) ১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ১৬ । ১৩৪০ ভাদ্র ৩১

*৪৮ গদ্যছন্দ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত) ২০৭
বঙ্গশ্রী (১৩৪১ বৈশাখ) ১৯৩৩ শেষাংশ। ১৩৪০ কার্তিক-পৌষ

*৪৯ ছন্দের মাত্রা ২য় পর্যায় ১৩৫
উদয়ন ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ

†৫০ ছন্দের মাত্রাগণনায় স্থিতিস্থাপকতা-বিচার (পত্র) ২৪৯
'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ[১] (১৩৮১ বৈশাখ)
১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ২। ১৩৪১ ভাদ্র ১৬

*৫১ গদ্যকবিতার ভাষা ও ছন্দ-১ (পত্র) ২২৫
পূর্বাশা (১৩৪২ শ্রাবণ) ১৯৩৫ মে ১৭। ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ ৩

*৫২ গদ্যকবিতার ভাষা ও ছন্দ-২ : 'মোট কথা। গদ্যছন্দ' (পত্র) ২২৭
'ছন্দ' (১ম সং, ১৩৪৩ আষাঢ়) ১৯৩৫ মে ২২। ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ ৮

*৫৩ গদ্যকবিতার ভাষা ও ছন্দ-৩ (পত্র) ২২৮
পূর্বাশা (১৩৪২ শ্রাবণ) ১৯৩৫ জুন ৩। ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ ২০

৫৪ আমার ছন্দের গতি : আমার কাব্যের গতি (ভাষণ, অংশ) ১৭৫
প্রবাসী ১৩৪৩ আষাঢ়

৫৫ ছন্দ ও উচ্চারণরীতি-১ (পত্র) ১৯০
চলার পথে (১৩৪৫ ফাল্গুন) ১৯৩৬ জুলাই ৬। ১৩৪৩ আষাঢ় ২২

৫৬ ছন্দ ও উচ্চারণরীতি-২ (পত্র) ১৯২
'ছন্দ' (১৩৬৯ কার্তিক) ১৯৩৬ জুলাই ৮। ১৩৪৩ আষাঢ় ২৪

৫৭ বাংলা প্রাকৃত ছন্দের মাত্রাবিচার (পত্র) ১৯৩
'ছন্দ' (১৩৬৯ কার্তিক) ১৯৩৬ জুলাই ২৫। ১৩৪৩ শ্রাবণ ৯

৫৮ গদ্যকবিতার আদর্শ (পত্র) ২৪২
নিরুক্ত (১৩৫১ আশ্বিন) ১৩৪৩ আশ্বিন ২৮

৫৯ গদ্যকাব্যের ছন্দপ্রকৃতি-১ : গদ্যকাব্য ২৩০
কবিতা ১৩৪৩ পৌষ

৬০ বাংলা প্রাকৃত ছন্দ-২ : ভূমিকা (অংশ) ১৮১
'ছড়ার ছবি' (প্রথম সং) ১৩৪৪ আশ্বিন

১ প্রবোধচন্দ্র সেন -প্রণীত, পৃ ৪৫৪।

যে বিশেষ ক্রমে এই রচনাগুলি মূলগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, এর পরে সেই বিশেষ ক্রম অনুসারেই একে একে এগুলির পাঠপরিচয় দেওয়া গেল, নির্বিশেষ কালক্রম অনুসারে নয়। তবে 'সম্পূরণ' অংশ-দুটির আটটি রচনার পাঠপরিচয় মূলগ্রন্থের বিশেষ ক্রম অনুসারে বিভিন্ন পর্বের অন্যান্য রচনার মধ্যে যথাভীষ্ট স্থানে স্থাপিত হল।

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম পর্বের রচনাগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় নি। ওই সংস্করণে এগুলি স্থাপিত হয়েছিল মূলগ্রন্থের নেপথ্যবিভাগে, বিচ্ছিন্ন ভাবে ও নানা পর্যায়ে। এগুলির পাঠপরিচয়ও দেওয়া হয়েছিল সংক্ষিপ্ত ও অযথেষ্ট রূপে। অথচ এই পর্বটাই হল রবীন্দ্রনাথের ছন্দসাধনা ও ছন্দচিন্তার উন্মেষপর্ব। এই পর্বেই তাঁর উত্তরকালীন পরিণত ছন্দসৃষ্টি ও ছন্দভাবনা দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তা ও ছন্দপ্রচেষ্টার বিবর্তনে এই পর্বের রচনাগুলির গুরুত্ব কম নয়। এজন্যই বর্তমান সংস্করণে এই রচনাগুলিকে গ্রন্থের পুরোভাগে স্থাপন করা হল এবং পাঠপরিচয়-বিভাগে এগুলির স্বরূপ নিরূপণে যথাসাধ্য প্রয়াস করা গেল। বস্তুতঃ এই প্রথম পর্বের রচনাগুলির গুরুত্ব স্বীকার এবং সেগুলির তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন-প্রচেষ্টাকে এক হিসাবে বর্তমান সংস্করণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করা যায়।

পাঠপরিচয়

প্রথম পর্ব : ১২৮৮-১৩১৯

বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ

১২৯০ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৩-১৯২২) 'সিন্ধুদূত' কাব্যের (১৮৮৩) একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' এই সমালোচনারই প্রাসঙ্গিক অংশ। পত্রিকায় সমালোচকের নাম ছিল না। কিন্তু সমালোচক যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার সন্দেহাতীত প্রমাণ আছে। এই সমালোচনায় বাংলা-প্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক ছন্দের বিশ্লেষণ যেভাবে করা হয়েছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কালীন বিশ্লেষণপ্রণালীর হুবহু মিল দেখা যায়; রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও বিশ্লেষণের সঙ্গেই তার মিল দেখা যায় না।[১] মূলগ্রন্থে যথাস্থানে পাদটীকায় এসব সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।[২]

'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনার শেষাংশে 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' কি, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় বাংলা-প্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক ছন্দের বিশ্লেষণে যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তার গুরুত্বই বেশি। এই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখেই রচনাটির নামকরণ করা হয়েছে। এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান, ছেলে-ভুলানো ছড়া প্রভৃতি চলতি বাংলার ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলা-প্রাকৃত ছন্দ', আর তাঁর মতে এই ছন্দই বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ, কেননা এই ছন্দেই বাংলাভাষার স্বভাব অর্থাৎ তার স্বকীয় উচ্চারণপ্রকৃতি প্রকাশ পেয়েছে অকৃত্রিমভাবে। এই মত ব্যক্ত হয়েছে 'ছন্দ' গ্রন্থের নানা প্রবন্ধেই। এ প্রসঙ্গে 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের চতুর্থ বিভাগের প্রথম অনুচ্ছেদের কথা

---

১ দ্রষ্টব্য : প্রবোধচন্দ্র সেন-লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ শ্রাবণ-আশ্বিন, এবং 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' তৃতীয় পর্যায়ের পাঠপরিচয়।

২ দ্রষ্টব্য : 'কৌতুককাব্যের ছন্দ' তৃতীয় অনুচ্ছেদ, 'বিবিধ ; ছন্দপ্রসঙ্গ' প্রথম পর্যায় : তৃতীয় ও ষষ্ঠ প্রসঙ্গ এবং 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ' তৃতীয় পর্যায়ে 'এ পার গঙ্গা ও পার গঙ্গা' ইত্যাদি ছড়া-প্রসঙ্গের পাদটীকা।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অনুচ্ছেদে কথিত 'বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপ'-এর বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে ওই প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে।

'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' প্রবন্ধটি 'ছন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রথম গৃহীত হয়। ওই সংস্করণে এটিকে স্থাপন করা হয়েছিল 'পরিশেষ' বিভাগের প্রথম প্রবন্ধরূপে। বিশ্বভারতী রচনাবলী সংস্করণেও এই নীতিই অনুসৃত হয়। বর্তমান সংস্করণে এটিকে স্থান দেওয়া হল 'অবতারণা' খণ্ডের পুরোভাগে।

এই রচনাটির প্রসঙ্গে কয়েকটি আনুষঙ্গিক তথ্যের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।—

এক। 'সিন্ধুদূত' -রচয়িতা কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্য-গ্রন্থের নাম 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' (১৮৭৫)। এই কাব্যের প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছিল না। এই বেনামী কাব্যখানি তৎকালে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল। কিন্তু বালক রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের প্রতিকূল সমালোচনা করেন "ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী" নামে এক প্রবন্ধে।[১] প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায়। এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনা।[২] এসব কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'রচনাপ্রকাশ' অধ্যায়ে।

'সিন্ধুদূত' কাব্যের 'এ কি এ, আগত সন্ধ্যা' ইত্যাদি কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত 'নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থে (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪৪)।

দুই। এই প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদনের (১৮২৪-৭৩) 'আশার ছলনে ভুলি' ইত্যাদি যে কবিতাটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শক ১৭৮৩ আশ্বিন-সংখ্যায়। তখন এটির নাম ছিল 'আত্মবিলাপ', এখনও এই নামেই পরিচিত। কবির মৃত্যুর

১ "ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী" প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র ১৩৬৯ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ডের (১৯৬৭ মার্চ) 'সম্পূরণ' বিভাগে।

২ দ্রষ্টব্য : প্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত "অগ্রদূত" প্রবন্ধ— বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৯ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃ ৩৯৮-৪১৮।

(১৮৭৩ জুন ২৯) কিছুকাল পরে কবিতাটি পুনঃপ্রকাশিত হয় 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় (১২৮১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৯১)। তখন এটির নাম দেওয়া হয় 'আশার ছলনা'। পাদটীকায় সম্পাদকের মন্তব্য এই।—

"আমরা মৃত মহাত্মা কবিবর মধুসূদন দত্তের ক্লার্ক মহাশয়ের নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত কবিতাগুলি প্রাপ্ত হইয়া মৃত কবির প্রতি ভক্তির চিহ্নস্বরূপ সাধারণকে উপহার দিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণে অতি সমাদরে ইহা গ্রহণ করিবেন।"

এর থেকে মনে হয় কবিতাটি যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল সে কথা সম্পাদকের জানা ছিল না। সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে অনেক পাঠকের মনেও অনুরূপ ধারণা হয়ে থাকা বিচিত্র নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের নামই উল্লেখ করা যেতে পারে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্য ১২৮১ সালের 'আর্যদর্শন' পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকা থেকেই যে 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তার উল্লেখ আছে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'সাহিত্যের সঙ্গী' অধ্যায়ে। সুতরাং মধুসূদনের উক্ত কবিতাটির সঙ্গেও তাঁর তখনই প্রথম পরিচয় হয়েছিল, এমন অনুমান অসংগত নয়। আর, ওই কবিতাটি মধুসূদনের একটি অ-পূর্বপ্রকাশিত রচনা, সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে তাঁর মনে এ-রকম ধারণা হয়েছিল বলেও মনে করবার হেতু আছে। বিহারীলালের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় (১৩০১ আষাঢ়) "বিহারীলাল" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাতে 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের (১৮৭০) 'সর্বদাই হু হু করে মন' ইত্যাদি 'উপহার'-শীর্ষক প্রথম রচনাটি সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে— কিন্তু তাহা বিরল— এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।"

এই প্রবন্ধেই অন্যত্র বলেছেন—

"কবি যখন গাহিলেন 'সর্বদাই হু হু করে মন', তখন বালকের অন্তরেও তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল।"

'বঙ্গসুন্দরী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৪ এবং ১২৭৬ সালের 'অবোধ-বন্ধু' পত্রিকায়। সুতরাং মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' যে বিহারীলালের 'উপহার' কবিতার (বঙ্গসুন্দরী, প্রথম সর্গ) ছয়-সাত বৎসর পূর্ববর্তী, তাতে সন্দেহ নেই। তাই মনে হয়, 'আত্মবিলাপ' ও 'উপহার' কবিতার পৌর্বাপর্যের কথা যদি রবীন্দ্রনাথের জানা থাকত তা হলে সম্ভবতঃ তিনি 'সর্বদাই হু হু করে মন' ইত্যাদি রচনাটিকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মকথামূলক 'বেদনার গীতোচ্ছ্বাস' অর্থাৎ প্রথম গীতিকবিতা বলে ঘোষণা করতেন না। তাই সন্দেহ হয়, মধুসূদনের 'আশার ছলনা' সম্বন্ধে 'আর্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যই রবীন্দ্রনাথের মনে উক্ত ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছিল।

মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির ছন্দপরিচয় দেওয়া হয়েছে পরবর্তী 'বিহারীলালের ছন্দ' প্রবন্ধের পাঠপরিচয়-প্রসঙ্গে।

তিন। রামপ্রসাদের 'মন্ বেচারির্' ইত্যাদি রচনাটির এই পাঠ অন্যত্র পাওয়া যায় নি। অন্যত্র যে পাঠ দেখা যায় তা এই :

মন গরিবের কি দোষ আছে,
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে।

বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর

'মানসী' কাব্য রচনা-কালে (১৮৮৭-৯০) রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি রচনায় রুদ্ধদলকে (প্রবন্ধের পাদটীকায় যাকে বলা হয়েছে 'যুগ্মধ্বনি') দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে এক নূতন ছন্দোরীতির প্রবর্তন করেন। এই রীতির প্রচলিত নাম 'মাত্রাবৃত্ত'। এই রীতি আসলে প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত রীতিরই বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-অনুযায়ী রূপান্তর মাত্র। প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে শুধু রুদ্ধদল নয়, দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলও দ্বিমাত্রক। বাংলা উচ্চারণে আ ঈ প্রভৃতি চিরাগত দীর্ঘস্বরগুলি স্বভাবতঃ দীর্ঘ হয় না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা উচ্চারণের এই স্বাভাবিক রূপকে স্বীকার করে নিয়ে এসব 'দীর্ঘ' স্বরকে একমাত্রক বলেই গণ্য করেছেন। তাই শুধু রুদ্ধদলগুলিকেই দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে তিনি বাংলায় এক নূতন

মাত্রাবৃত্ত রীতি প্রবর্তন করেন। এই রীতিকে বলা যায় 'বাংলা মাত্রাবৃত্ত' বা 'নব্য মাত্রাবৃত্ত'। মাত্রাবৃত্ত রীতির আধুনিকতম পারিভাষিক নাম 'কলাবৃত্ত'।

এই নূতন রীতির জন্য 'মানসী' কাব্য বাংলা ছন্দের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নূতন ছন্দোরীতির প্রসঙ্গে বারবার 'মানসী'র কথা উল্লেখ করেছেন। তার কিছু নিদর্শন আছে 'ছন্দ' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে।[১] মানসীর ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আরও দু-একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

রচনাবলী-সংস্করণে 'মানসী' কাব্যের 'সূচনা'য় (১৩৪৬ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন তা এই।—

"আমার রচনায় এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"

এই মন্তব্য রচনার অল্পকাল পরে ১৩৪৭ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে 'মানসী' কাব্য অধ্যাপনাকালে তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে উক্ত কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাও উদ্ধৃতিযোগ্য।—

"তার আগে বাংলা কবিতায় এসব ছন্দের আমদানি হয় নি।···ক্রমে যুক্ত অক্ষরকে কবিতার মধ্যে আবাহন ক'রে তার ধ্বনির পূর্ণ মূল্য দেওয়া হল। এমনি করে কাব্যে গাম্ভীর্য ও সরসতার প্রতিষ্ঠা ঘটল।···

মানুষের মনের সাধারণ দুঃখসুখের কথা নিয়েই ছন্দে বদ্ধ হয় বাণী। মনে যদি বাজাতে চাও বচনাতীত বিষয়, তা হলে ছন্দের আশ্রয় নিতে হয়। এইজন্য কবিরা তাঁদের বাণীসৃষ্টিকে রক্ষা করেছেন ছন্দের ধ্বনিতে। এই-রকম করেই ছন্দের দ্বারা সৃষ্টি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। কবিও তাঁর বাক্যকে স্থায়ী করে রাখতে চান ছন্দের দ্বারা স্পন্দিত করে।···

১ দ্রষ্টব্য: 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগে 'ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণগমনে' ইত্যাদি প্রসঙ্গ, 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগে 'তার পরে মানসী লেখার সময় এল' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ, 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগ 'মানসী লেখার সময়' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ, এবং 'আমার ছন্দের গতি' চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

'মানসী' রচনার সময় আমি ছিলেম গাজিপুরে। গোলাপের জন্য গাজিপুর বিখ্যাত।... সে সময় কত রকমের ছন্দ গুঞ্জরিত হয়েছিল আমার মাথায়। এইসব ছন্দের লীলাভূমি হচ্ছে সাংসারিক বিষয়। কিন্তু তবু বিষয়টা হচ্ছে গৌণ, বলবার ভঙ্গিটাই হচ্ছে আসল। গোলাপের প্রতি টানটা শেষ পর্যন্ত একটা মনের আনন্দে পরিণত হল, তার অনির্বচনীয়তায় ভরে উঠল মানসীর ছন্দের সাজি।"

—'মানসী'-কাব্যপাঠের ভূমিকা : প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন (কষ্টিপাথর)

'নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল' ইত্যাদি রচনাটির সম্পর্কে 'মানসী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নিম্নে, স্বচ্ছ এবং উর্দ্ধে, এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না।' অর্থাৎ এটি সুপরিচিত অক্ষরগোনা পয়ার নয়, এটি হল নবপ্রবর্তিত মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত পয়ার। কিন্তু পরবর্তী কালে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তিত হয়। তাই মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলী প্রকাশকালে (১৯০৩-০৪) তিনি এই কলাবৃত্ত পয়ারটিকে সাবেক অক্ষর-গোনা পয়ারে রূপান্তরিত করেন এভাবে—

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল—
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল।

—'কাহিনী' (কাব্যগ্রন্থাবলী ৫ম ভাগ), নিষ্ফল উপহার

এই মতপরিবর্তনের কথা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর একাধিক উক্তিতে। যেমন—

"যাকে আমি অসম বা বিষম-মাত্রার ছন্দ বলি, যুক্তধ্বনির বাছবিচার তাদেরই এলাকায়।" —'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' ৩ (১৯৩২), দ্বিতীয় বিভাগ, পৃ ১১৯

অসম-মাত্রার ছন্দ ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দ, আর বিষম-মাত্রার ছন্দ পাঁচ বা সাতমাত্রা-পর্বের ছন্দ। পয়ার চারমাত্রা-পর্বের ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় সমমাত্রার ছন্দ। বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথের মতে সমমাত্রার ছন্দে 'যুক্তধ্বনি'কে (রুদ্ধদলকে) দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করা অনাবশ্যক। ফলে মাত্রাবৃত্ত পয়ার রচনাও নিষ্প্রয়োজন। এ কথাটা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে এই উক্তিতে—

"সেদিন যুক্তবর্ণকে পয়ারেও দিলেম দুই মাত্রার আসন।... অনতিকাল পরেই বোঝা গেল এ আইন চালাবার কোনোই প্রয়োজন নেই।"

—'ছন্দের প্রকৃতি' (১৯৩৩), দ্বিতীয় বিভাগ, পৃ ১৬২-৬৩

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই দুই উক্তির কিছুকাল পূর্বেই রবীন্দ্ররচনায় মাত্রাবৃত্ত পয়ার আবার দেখা দেয়। তাঁর 'সহজ পাঠ' দুই ভাগে দুটি ('ছোটো নদী' ও 'আগমনী') এবং 'পাঠপ্রচয়' তিন ভাগে (২য়-৪র্থ) তিনটি ('উৎসব', 'ফাল্গুন' ও 'তপস্যা') রচনায় এই মাত্রাবৃত্ত পয়ারের অতি সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়।[১] এই সবগুলিরই রচনাকাল ১৯৩০। এই রচনাগুলি থেকে একটি নিদর্শন এখানে দেওয়া গেল।—

পূর্ণিমাচন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্যবসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়।

—'পাঠপ্রচয়' ২ (১৩৩৬ চৈত্র), উৎসব

আরও মজার কথা এই যে, পয়ারজাতীয় ছন্দে "যুক্তধ্বনিকে দুই ভাগে বিশ্লিষ্ট করে তাকে দুই মাত্রায় ব্যবহার করার স্বাধীনতা সে যে দাবি করতে পারে না তাও নয়"— এমন সুস্পষ্ট উক্তি তিনি নিজেই করেছিলেন উক্ত 'পাঠপ্রচয়' প্রকাশের কিছুকাল পরে ও 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধ পাঠের অল্পকাল পূর্বে। দ্রষ্টব্য 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' তৃতীয় পর্যায়, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

বাংলা শব্দ ও ছন্দ

'মানসী' কাব্যের 'ভূমিকা' (১২৯৭ পৌষ) অংশটুকু বাদ দিলে এটিই রবীন্দ্রনাথের স্বনামে প্রকাশিত প্রথম ছন্দপ্রবন্ধ। এটি প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায়। 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এটি স্থান পায় নি। বিশ্বভারতী রচনাবলী-সংস্করণে এটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে 'পরিশিষ্ট' অংশে।

প্রবন্ধটি 'মানসী' কাব্য প্রকাশের পরে রচিত। 'মানসী' রচনার সময়ে (১৮৮৭-৯০) কবির মনে 'ছন্দের নানা খেয়াল' দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং 'কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ' দেয়। কবির এই সময়কার ছন্দচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে এই প্রবন্ধটিতে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তিকালীন বহু ধারণার

১ এই সবগুলি রচনাই পরবর্তী কালে সংকলিত হয় 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থে (১৩৬১ শ্রাবণ)। 'সহজপাঠে' উক্ত দুটি কবিতার কোনো নাম ছিল না। 'চিত্রবিচিত্র' প্রকাশকালেই নাম দেওয়া হয়। এখানে ওই নামই স্বীকৃত হল।

প্রথম আভাস পাওয়া যায় এটিতে। এটাই এর প্রধান গুরুত্ব। এসব পূর্বাভাসের কিছু নিদর্শন যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। এখানে আর-একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের

মন্দপবন, কুঞ্জভবন,
কুসুমগন্ধ-মাধুরী।[১]

এই রচনাংশটিতে যুক্তাক্ষরসূচিত গুরুধ্বনি অর্থাৎ রুদ্ধদল ছন্দকে তরঙ্গিত করে তুলেছে। এই অংশটিরই উক্তপ্রকার গুরুধ্বনিহীন নিস্তরঙ্গ রূপ এই।—

মৃদুল পবন, কুসুমকানন,
ফুলপরিমল-মাধুরী।

এ-রকম রচনাই 'অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড' বলে বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী 'বিহারীলালের ছন্দ' প্রবন্ধে।[২] রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটি প্রথম উপলব্ধি করেন 'মানসী' রচনার সময়ে। তারই ফলে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে নূতন যুগ প্রবর্তিত হয়। 'মানসী' কাব্যের প্রসঙ্গে তিনি বারবার এ কথার উল্লেখ করেছেন।[৩]

মনে রাখতে হবে যুক্তাক্ষরসূচিত গুরুধ্বনি বা রুদ্ধদলের উক্তপ্রকার দ্বিমাত্রক প্রয়োগ শুধু কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দেই চলে, অন্য রীতির ছন্দে নয়।

ছন্দের সার্থকতা

ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে (১৩১৯)। তার পরে এটি অপরিবর্তিত রূপেই পুনঃসংকলিত

১ দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' (১২৯২ বৈশাখ), ১০৫-সংখ্যক রচনা।

২ 'অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ডে'র প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'একদিন দেব তরুণ তপন' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ—'সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দ' প্রবন্ধের পাঠপরিচয় শেষ দুই অনুচ্ছেদ।

৩ দ্রষ্টব্য: 'মানসী'-প্রসঙ্গ—'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর' ও পাদটীকা, 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায় প্রথম বিভাগ উপান্ত্য অনুচ্ছেদ, 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় বিভাগ তৃতীয় অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা, 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগে 'মানসী' লেখবার সময়' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ ও পাদটীকা, 'ছন্দ-বিচার' প্রথম পর্যায় প্রথম দুই অনুচ্ছেদ, এবং 'আমার ছন্দের গতি' চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

হয় 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে (১৩৬১ আশ্বিন)। ছন্দ সম্পর্কে এই পত্রটিতে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, ছন্দের সঙ্গে নদী ও বিলের যে সাদৃশ্য ও বৈষম্যের তুলনা দেওয়া হয়েছে, সে মনোভাব ও তুলনা দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও অনুভূতিকে অধিকার করে ছিল। এই পত্র লেখার (১৮৯৩) প্রায় আটত্রিশ বৎসর পরে 'গদ্যছন্দ' নামে একটি বড়ো প্রবন্ধ লিখতে বসার (১৯৩১) সময়ে প্রায় অনিবার্যরূপেই ওই নদী ও বিলের তুলনার কথাই তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল। এই প্রবন্ধের মুখবন্ধ হিসাবে তিনি যা লেখেন সেটুকু নিয়ে উদ্‌ধৃত হল।—

"ছন্দ বলতে বাঁধন বোঝায়। বাঁধনে বাঁধে, অচল করে। কিন্তু ছন্দোবন্ধের কাজটা তার বিপরীত। ছন্দেই কথার তরঙ্গে ভাবকে সচল করে রাখে। নদীজলের তরলতায় এক দিকে আছে গতিবেগ, আর-এক দিকে আছে তার তট। সেই তটে সীমার বাধা। অবাধা এবং বাধা এই দুটোকে নিয়ে নদীর স্রোত। যাকে বলি জলা তার বাধা নেই, তার জলরাশি যত দূর পারে তত দূর থাকে ছড়িয়ে, ছড়ালেই তার চলা থামে। আমার তপ্‌সী[1] মাঝি তাকে বলত বোবা জল। আঁকাবাঁকা তট জলকে দিয়েছে সীমা, সেই সীমাতেই তার বিচিত্র ভঙ্গীর চলন। অন্য দিকে দেখো সরোবর, তার তটের বাধা চার দিকেই, তাই সে জলকে দেয় না ছড়িয়ে পড়তে, জমিয়ে রাখে আপন সম্বল। নদীর সমস্ত জল চলে, তার জমবার ব্যবস্থা বন্ধ, তার চলবার পথ খোলা। নিজেকে ছড়িয়ে ফেলাও তার নিষিদ্ধ, ছড়িয়ে পড়লে বেগও যায়, রূপও হয় নষ্ট। সৃষ্টিতে রূপই আমাদের চৈতন্যকে দেয় নাড়া, সেই রূপ সীমার মধ্যে বেগ পেয়েছে।

কাব্যের ছন্দে যে বাঁধন তাতে ছড়িয়ে পড়বার শৈথিল্য থেকে কথাগুলোকে সামলিয়ে রাখে। ছড়িয়ে পড়ার মানে মূর্তিটা ভেঙে মাটি হয়ে যাওয়া, একেই বলে অসংযমের অশক্তি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই—

বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।"

এ পর্যন্ত লেখার পরেই মুখবন্ধটা পরিত্যক্ত হয়। বিচিত্র চিত্ররেখা জালে

১ 'তপ্‌সী' শব্দটি সম্ভবতঃ 'তপস্বী' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

মণ্ডিত হয়ে এই পরিত্যক্ত মুখবন্ধটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ১৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির তৃতীয় পৃষ্ঠায় বিরাজমান আছে। দ্রষ্টব্য ২০৯ পৃষ্ঠার পুরোবর্তী 'গদ্যছন্দ'-প্রবন্ধের 'এক পৃষ্ঠা' -নামক লিপিচিত্র।[১]

'ছন্দের সার্থকতা' রচনাটিতে ছন্দোবদ্ধ কবিতার ভাষাকে তুলনা করা হয়েছে তটবদ্ধ নদীর গতিবেগ ও কলধ্বনিময় জলস্রোতের সঙ্গে, আর গদ্যের ভাষাকে তুলনা করা হয়েছে নানা দিকে ছড়িয়ে-পড়া বিশেষত্বহীন বিলের গতি-হীন বোবা জলের সঙ্গে। 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধের পরিত্যক্ত মুখবন্ধটিতেও জলার (বিলের) বোবা জলের কথা আছে। কিন্তু চার দিকে তটের সীমায় আবদ্ধ সরোবরের তুলনায় বিলের বিচিত্র ভঙ্গীর চলনের কথা স্বীকৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ আটপৌরে গদ্যভাষাকে সরোবরের সঙ্গে এবং গদ্যকবিতার ভাষাকে বিলের সঙ্গে তুলনা করবার অভিপ্রায় ছিল কবির মনে। সরোবরের জল ছড়িয়ে পড়তে পারে না, সংকীর্ণ সীমার মধ্যে জমা থাকে। বিলের জল জমা থাকে না, ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তার পরেই বলা হয়েছে ছড়িয়ে পড়লে বেগও যায়, রূপও হয় নষ্ট, তাতে মূর্তিটাই ভেঙে মাটি হয়ে যায়। অথচ শিল্পসৃষ্টিতে রূপই আমাদের চৈতন্যকে নাড়া দেয়। সম্ভবতঃ এই উক্তির পরেই তিনি অনুভব করলেন যে, গদ্যকবিতার ভাষাকে বিলের সঙ্গে তুলনা করা চলে না এবং সেজন্যই এই মুখবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ কবিতার ভাষার সঙ্গে তটবদ্ধ নদীস্রোতের সঙ্গে তুলনা ত্রুটিহীন। 'ছন্দের সার্থকতা' রচনাটিতে এই তুলনা নিখুঁতভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'ছন্দের সার্থকতা' রচনাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব এই যে, পরবর্তী কালে ছন্দের অর্থ, ছন্দের প্রকৃতি প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে ছন্দের রূপবিশ্লেষণের মুখবন্ধ হিসাবে ছন্দতত্ত্বের যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সূত্রপাত হয় এটিতেই।

বিহারীলালের ছন্দ

১৩০১ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটি 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয় ১৯০৭ সালে। 'বিহারীলালের

১ এই পরিত্যক্ত মুখবন্ধের পাঠোদ্ধারে শ্রীকানাই সামন্ত ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহায়তা পেয়েছি।

ছন্দ' এই প্রবন্ধেরই প্রাসঙ্গিক অংশ। ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বা বিশ্বভারতী রচনাবলী-সংস্করণে এটি স্থান পায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তা অনুধাবনের পক্ষে এটির গুরুত্ব কম নয়। পরবর্তী 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ' প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে এই প্রবন্ধের বিষয়গত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের (১২৭৬) 'একদিন দেব তরুণ তপন' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটির প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ' প্রবন্ধের পাঠপরিচয় দ্রষ্টব্য।

'সারদামঙ্গল' কাব্যের (১২৮৬) ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ 'প্রচলিত ত্রিপদী' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিন ছত্রে বিন্যস্ত হলেও এ ছন্দকে ত্রিপদী বলা যায় না, এ ছন্দ আসলে চৌপদী। সাধারণতঃ ত্রিপদীর দুটি রূপ দেখা যায়। আট-আট-দশ মাত্রার ত্রিপদীর প্রচলনই বেশি। আধুনিক কালে আট-আট-ছয় মাত্রার ত্রিপদীও যথেষ্ট দেখা যায়। 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' প্রবন্ধে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' (১৮৬১) থেকে যে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে তাও এই আট-আট-ছয় মাত্রার ত্রিপদী ছন্দে রচিত। যথা—

আশার ছলনে ভুলি
কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে।

এর সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই বোঝা যাবে যে, 'সারদামঙ্গল' কাব্যের ছন্দ ত্রিপদী নয়। পদবিভাগ অনুসারে বিন্যস্ত করলেই এটির চৌপদী রূপটি প্রকট হবে।—

কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কানে,
বেদনা দিও না প্রাণে
ব্যথার সময়।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এটি আসলে আট-আট-আট-ছয় মাত্রার চৌপদী। এই অংশের প্রথম তিন পদে যে মিল দেখা যায় তা আকস্মিক। এই মিল অত্যাবশ্যক নয়। 'আত্মবিলাপ'-এর প্রথম দুই পদেও মিল নেই। 'সারদামঙ্গল'-এর ছন্দে প্রথম দুই পদে মিল আছে, তৃতীয় পদটি অমিল। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ পদকে এক ছত্রে স্থাপন করে আট-ছয় মাত্রার পয়ারের রূপ দেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে পয়ার-পঙ্‌ক্তিও দ্বিপদী— আট ও ছয় মাত্রার দুই পদে বিভক্ত।

সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ

১৩০১ সালের মাঘ-সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় 'সাধনসপ্তকম্' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা পদ্যানুবাদের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ' এই সমালোচনারই প্রাসঙ্গিক অংশ। পত্রিকায় এই সমালোচনার লেখকের নাম ছিল না। কিন্তু লেখক যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই অংশটুকুতে জীবনাদর্শ তথা সংস্কৃত ছন্দ এবং তার অনুবাদ সম্বন্ধে যেসব অভিমত প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা স্থানেই তা ছড়িয়ে আছে। 'ছন্দ' গ্রন্থেও অনুরূপ উক্তির অভাব নেই। যথাস্থানে পাদটীকায় তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে। পরবর্তী 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ' এবং 'বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দ' রচনা-দুটির প্রথমেই সংস্কৃত কাব্যের বাংলা অনুবাদ ও সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিসংগীত রক্ষা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ পেয়েছে, এ প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তা ছাড়া, 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'পিতৃদেব' অধ্যায়ে গীতগোবিন্দ কাব্যের 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এবং কুমারসম্ভব কাব্যের 'মন্দাকিনীনির্ঝর' ইত্যাদি অংশের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও এ প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনে আসে।

'সাধনসপ্তকম্' গ্রন্থের উক্ত সমালোচনা-অংশে প্রযুক্ত 'শব্দ' ও 'ছন্দ' শব্দ-দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বস্তুতঃ এই শব্দ-দুটির প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই রচনাংশ-টুকুকে 'সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ' নামে অভিহিত করা হল। এই অংশটুকু 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধের পরিপূরক বলে গণ্য হবার যোগ্য।

পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ

১৩০২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকার 'গ্রন্থসমালোচনা' বিভাগে কবি নবীনচন্দ্র দাস (১৮৫৩-১৯১৪)-কৃত রঘুবংশ কাব্যের পদ্যানুবাদ দ্বিতীয় ভাগের (নবম-পঞ্চদশ সর্গ) একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। প্রাসঙ্গিকতা-বোধে এই সমালোচনাটি 'ছন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হয় 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ' নামে। পত্রিকায় সমালোচকের নাম ছিল না। কিন্তু

সমালোচক যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাতে সন্দেহ নেই। এই নিবন্ধের ভাষা ও অভিমত সর্বতোভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও অভিমতের অনুরূপ। অধিকন্তু তৎকালীন আর কোনো লেখকের লেখাতে এইজাতীয় অভিমত দেখা যায় না। বস্তুতঃ এসব অভিমত একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়। গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে পাদটীকায় এসব ভাষা ও মত-সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী 'বিহারীলালের ছন্দ' এবং 'সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধ-দুটির ভাষা ও অভিমতের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের 'উপহার'-নামক প্রথম সর্গটি বাদে অন্য সকল সর্গের ছন্দ আর নবীনচন্দ্রের 'দ্বাদশাক্ষর' ছন্দ আসলে একই। দুই ছন্দেরই উপাদান বারো অক্ষরের পদ। পার্থক্য এই যে,— বিহারীলালের প্রতি শ্লোকে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে আছে এগারো অক্ষর অর্থাৎ এক অক্ষর কম, আর আছে প্রথম-তৃতীয় এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ পদে মিল, পক্ষান্তরে নবীনচন্দ্রের প্রতি শ্লোকের চার পদেই আছে বারো অক্ষর আর মিল আছে প্রথম-চতুর্থ ও দ্বিতীয়-তৃতীয় পদে। এই পার্থক্য গৌণ। উভয় ছন্দেরই মূল প্রকৃতি এক। উভয়ত্রই প্রতি পদে বারো অক্ষরমাত্রা এবং প্রতি পর্বে ছয় অক্ষরমাত্রা। এ-রকম ছয়মাত্রা-পর্বের ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ বলেন 'তিনমাত্রামূলক ছন্দ' বা 'অসমমাত্রার ছন্দ'। আর এইজাতীয় ছন্দেই যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদলকে এক মাত্রা বলে গণ্য করলে ছন্দের ধ্বনিসংগীত ব্যাহত হয়। 'মানসী' কাব্য রচনাকালেই রবীন্দ্রনাথ এ কথা প্রথম উপলব্ধি করেন। নানা প্রসঙ্গে তিনি বারবার তাঁর এই অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর' ও 'সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ' প্রবন্ধের পাঠপরিচয় দ্রষ্টব্য। 'মানসী' রচনা-কালের এই অভিজ্ঞতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে 'সোনার তরী' (১২৯৮-১৩০০) ও 'চিত্রা' (১৩০০-১৩০২) রচনার সময়ে। 'বিহারীলালের ছন্দ' ১৩০১ এবং 'পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ' (১৩০২) প্রবন্ধ-দুটি প্রকাশিত হয় 'চিত্রা' রচনার যুগে। স্বভাবতঃই এ সময়ে তিনমাত্রামূলক ছন্দে রুদ্ধদলের উক্তপ্রকার একমাত্রক প্রয়োগ তাঁর মার্জিত শ্রুতিরুচিকে পীড়িত করত। এইজন্যই ওই দুই প্রবন্ধে তিনি তাঁর আপত্তি জানিয়েছেন।

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের ছন্দ আট-আট-আট-ছয় মাত্রার

চৌপদী, আর নবীনচন্দ্রের রঘুবংশ-অনুবাদের পয়ারগুলি হল আট-ছয় মাত্রার দ্বিপদী। অর্থাৎ এ দুটিই একজাতীয় ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় দুটিই সমমাত্রাবর্গীয় ছন্দ। এ ছন্দের এলাকায় 'যুক্তধ্বনির বাছবিচার' নেই, অর্থাৎ সমমাত্রাবর্গীয় ছন্দে রুদ্ধদলকে যথাস্থানে একমাত্রা বলে গণ্য করলে ছন্দের ধ্বনিসৌষ্ঠব নষ্ট হয় না, বরং তাতে ছন্দের শক্তি ও ধ্বনিগৌরব দুই-ই বাড়ে।[১]

বাংলা ছন্দে অনুপ্রাস

১৩০১ সালে দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -কর্তৃক 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত-সংগ্রহ' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়।[২] বইএর প্রথম পাতায় লেখা ছিল 'গুপ্তরত্নোদ্ধার', কিন্তু ভিতরে ছিল 'লুপ্তরত্নোদ্ধার'। এই কবিসংগীত-সংগ্রাহক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই পরবর্তী কালে 'দাদামশাই' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা সাধনা পত্রিকায় এই পুস্তকের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তী কালে এই সমালোচনার মূল বক্তব্যটুকু তাঁর 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে (১৯০৭) সংকলিত হয় 'কবিসংগীত' নামে। 'বাংলা ছন্দে অনুপ্রাস' এই প্রবন্ধেরই প্রাসঙ্গিক অংশ।

এই রচনাটি মুখ্যতঃ ছন্দোবিষয়ক নয়। দুর্বল কবিদের অযত্ন-কৃত রচনায় কিভাবে শুধু অনুপ্রাসের ঘনঘটার দ্বারা সুনিয়মিত ছন্দের অভাব পূরণের প্রয়াস

১ দ্রষ্টব্য : মাইকেল মধুসূদনের প্রসঙ্গ—'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' চতুর্থ অনুচ্ছেদ, 'বিহারীলালের ছন্দ' উপান্ত্য অনুচ্ছেদ, 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায় চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং 'ছন্দের প্রকৃতি' দ্বিতীয় বিভাগের 'সংস্কৃত ভাষার প্রত্যেক শব্দেই' ইত্যাদি অনুচ্ছেদ।

২ কেদারনাথের 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' বইটির ইতিহাস পাওয়া যাবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বীরভূমে দাদামশাই' নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বেতার জগৎ'-এ (১৯৭০ অক্টোবর ২২), পরে সংকলিত হয় লেখকের 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' গ্রন্থে (১৩৭৯ বৈশাখ ১। ১৯৭২ এপ্রিল ২৪)।

দেখা যায়, এই অংশটুকুতে তাই ব্যাখ্যাত হয়েছে। এসব অকারণ অনুপ্রাসের বাহুল্য এক-এক সময় কতখানি বেপরোয়া ও হাস্যকর হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গেই তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পরবর্তী 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায়ে দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭) এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামীর (১৮১০-৮৮) রচনা থেকে দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত হয়েছে। ১৩০১ সালের ফাল্গুন মাসে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আপদ' গল্পের 'ওরে রাজহংস জন্মি দ্বিজ বংশে' ইত্যাদি অংশটুকু স্মরণীয়। তা ছাড়া, 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের (১৩৪৭ ভাদ্র) তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'ওরে রে লক্ষণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ' অংশটুকুও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কৌতুক-কাব্যের ছন্দ

১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'আষাঢ়ে' নামে একটি কৌতুক-কাব্যের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। কাব্যখানিতে কবির নাম ছিল না। কিন্তু কবি যে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তা অচিরকাল পরেই প্রকাশ পায়। পরবর্তী কালে উক্ত সমালোচনা 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে (১৯০৭) সংকলিত হয় 'আষাঢ়ে' নামে। 'কৌতুক-কাব্যের ছন্দ' এই প্রবন্ধেরই প্রাসঙ্গিক অংশ।

এই রচনাটি সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। এখানে আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা গেল। এই সমালোচনায় যে ছন্দশৈথিল্যের কথা বলা হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত এই।—

বেধে গেল যুদ্ধ ; হোল বরিষণ প্রীতি-
পূর্ণ বহু ভাষা ; পড়ল ঘুমের দফায় ইতি।

—কেরানী : ১২

এখানে যতিচ্যুতি ও মাত্রাহানি উভয়বিধ ত্রুটি ঘটেছে। এটি প্রাকৃত অর্থাৎ দলবৃত্ত রীতির ছন্দে রচিত, তাতে নূতনত্ব নেই। কিন্তু এসব ত্রুটির জন্য এর গতি ব্যাহত হয়েছে।

ছন্দ এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের আশ্চর্য দখলের দৃষ্টান্ত এই—

আরও অভ্যাস দুবেলা
বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,
সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা।

—কেরানী : ১৪

এখনো বাঙ্গালী জগৎ সম্মুখে
রাস্তা ঘাটে দিয়া নিয়ত
চলিছে নির্ভয়ে— এ কথা জগতে
প্রচার করিয়া দিও ত।

—বাঙ্গালী-মহিমা

অন্তঃপুরের সনাতন সেই পাঁচিলগুলো ভাঙলো,
আঁস্তাকুড়কে কল্লো বাগান, চালা কল্লো 'বাঙলো'।…
কিম্বা যদি জেনে ফেলে ৫ আর ২য়ে ৭,
তা হলে কি ভাব তারা রেঁধে দেবে ভাত ?…
হাতা বেড়ী রেখে 'রুজ' পাউডার মেখে,
প'রে মোজা বুট, ক'রে সবায় হুট,…
নির্বিবাদে ও নির্ভয়ে সটাং, অবিলম্বে
চলে যাবে হিল্লী দিল্লী কলম্বো ও বম্বে।

—নসীরাম পালের বক্তৃতা : ৯, ১৫

এই রচনাটিতে 'আষাঢ়ে' কাব্যের চারটি কবিতার ছন্দ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তার মধ্যে 'বাঙ্গালী-মহিমা' ও 'ডেপুটি-কাহিনী' সাধু অর্থাৎ মিশ্রকলাবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) রীতির ছন্দে রচিত— প্রথমটির প্রতি পূর্ণ পর্বে ছয় মাত্রা এবং দ্বিতীয়টির চার মাত্রা। 'কর্ণবিমর্দন-কাহিনী' সংস্কৃত রীতির পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত। এই ছন্দের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে থাকে চারটি পূর্ণ পর্ব এবং প্রতি পূর্ণ পর্বে থাকে চার কলামাত্রা। আর কোনো পর্বেই লঘু-গুরু-লঘু ক্রমে ধ্বনি বিন্যাস হয় না। দৃষ্টান্ত—

ও ঘুঁষি পড়িলে গণ্ডে জোরে
একেবারে মাথা ঘোরে।

কানা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে,
ভূমিবিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে ॥

—কর্ণবিমর্দন-কাহিনী

এটির দীর্ঘস্বরগুলি সংস্কৃত রীতিতে দীর্ঘরূপেই উচ্চার্য।

রবীন্দ্রপ্রশংসিত 'ইংরাজস্তোত্র' কবিতাটি 'আষাঢ়ে' কাব্যগ্রন্থের কোনো সংস্করণেই পাই নি। প্রথম সংস্করণে ছিল কি না জানি না।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, আষাঢ়ে কাব্যে 'কলিযজ্ঞ' কবিতাটিও পূর্বোক্ত 'বাঙ্গালী-মহিমা', 'ডেপুটি-কাহিনী' ও 'কর্ণবিমর্দন-কাহিনী'— এই কবিতা-তিনটির সঙ্গে এক পর্যায়-ভুক্ত। বস্তুতঃ এক সময়ে এই 'কলিযজ্ঞ' কবিতাটি অন্য তিনটির মতো বহুপঠিত ও বহুপ্রশংসিত হয়েছিল। এটি সংস্কৃত অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত। অনুষ্টুভ্ ছন্দের পরিচয় পরবর্তী 'সংজ্ঞাপরিচয়' অংশে দ্রষ্টব্য। বাংলা ভাষায় লিখিত এই কবিতাটিকে সংস্কৃত ছন্দ-পদ্ধতি রক্ষা করে আবৃত্তি করলে তার থেকে কবির হাস্যচ্ছটা স্বতঃই ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। নমুনা স্বরূপ তার থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত করা গেল।—

চা-পান-নিরত প্রাতে। ইংরাজ লাটসাহিব।
পড়িয়া এ মহাবার্তা। আতঙ্কে তু বিমূর্ছিত ॥
উঠিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসি' বলিলেন অতঃপর।
এ জাতিকে দমে' রাখা দেখিতেছি অসম্ভব ॥···

লাট সাহিব ইত্যাদি, করি উক্ত বিবেচনা।
পোঁটলা-পুঁটলী বাঁধি স্বদেশে দেন চম্পট ॥

—কলিযজ্ঞ

এর প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তির কয়েকটি বর্ণকে সংস্কৃত অনুষ্টুভ্ ছন্দের নিয়মে লঘুগুরুভেদে চিহ্নিত করে দেওয়া গেল। শুধু এই বর্ণগুলি সংস্কৃত নিয়মে উচ্চার্য, আর অকারান্ত শব্দগুলি অকারান্ত-রূপেই উচ্চারণ করা প্রয়োজন। তা হলেই এর ছন্দোবৈশিষ্ট্য কানে ধরা পড়বে।

জাপানি ছন্দ

১৩১২ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় (পৃ ১০৭) 'জাপানের প্রতি' নামে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশিত হয়।[১] কবিতা-তিনটি জাপানি কবিতার গঠন ও ছন্দের অনুকরণে রচিত। তাই কবিকে ওই কবিতাগুলির ভূমিকা হিসাবে জাপানি কবিতার গঠন ও ছন্দপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও লিখে দিতে হয়েছিল। এই ভূমিকাংশটি 'ছন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৬৯) প্রথম সংকলিত হয় 'জাপানি ছন্দ' নামে, আর তার দৃষ্টান্তস্বরূপ ওই কবিতা-তিনটিও তৎসঙ্গেই প্রকাশিত হয়।[২]

উক্ত ভূমিকা বা কবিতা-তিনটি থেকে জাপানি ছন্দের মূলনীতির পরিচয় পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু তার বহিরঙ্গের একটু আভাস। বস্তুতঃ এই তিনটি কবিতাই অতি সরল কলাবৃত্ত (moric) রীতিতে রচিত। তিনটিরই পূর্ণ পর্বে আছে সাত কলামাত্রা (moric unit)। আর অপূর্ণ পর্বে আছে পাঁচ কলামাত্রা। এই কবিতা-তিনটির ছন্দে মাত্রাবিন্যাসগত পার্থক্য বা বৈচিত্র্য নেই, আছে শুধু পর্ববিন্যাসগত কিছু পার্থক্য ও বৈচিত্র্য। সাধারণ পাঠকের কানে শুধু এই পার্থক্যটুকুই অনুভূত হয়। বস্তুতঃ এই পর্ববিন্যাসবৈচিত্র্যের মধ্যেই জাপানি ছন্দের প্রকৃতি কিছু পরিমাণে আভাসিত হয়েছে।

আসলে জাপানি কবিতার ধ্বনিবিন্যাসে বিশেষ বৈচিত্র্য নেই। 'ভাণ্ডার' পত্রিকার যে সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'জাপানের প্রতি' প্রকাশিত হয়, সে সংখ্যারই 'সঞ্চয়' বিভাগে 'ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ' পত্রিকার একটি ইংরেজি প্রবন্ধের সারমর্ম সংকলিত হয়েছিল 'জাপানি কবিতা' নামে (পৃ ১৫৫)। ওই প্রবন্ধের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "তাহাদের কবিতার ছন্দ একঘেয়ে, বিশেষ বৈচিত্র্য নাই।" এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তাহাতে (জাপানি কবিতায়) মিলেরও কোনো লক্ষণ দেখি না, কেবল অত্যন্ত সরল মাত্রার নিয়ম আছে।"

১ সে সময় রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদক।

২ ওই ভূমিকাসহ উক্ত কবিতা-তিনটি পরবর্তী কালে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্র-শতবার্ষিক সংস্করণ (১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠ) 'জাপানযাত্রী' পুস্তকের 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগে (পৃ ১৪৪-৪৫)।

পরবর্তী কালে 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থে (১৩২৬ শ্রাবণ) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন একটি উক্তিও এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। জাপানিদের জাতীয় চরিত্রের পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা, এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সেই-জন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এ পর্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম।··· সেইজন্যেই তিন লাইনেই ওদের কুলোয়।"

—'জাপানযাত্রী' অধ্যায় ১৩ (রচনাকাল: ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ ২২)

জাপানি কবিতা 'ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়'— এ কথার তাৎপর্য এই যে, সে কবিতা হচ্ছে স্বরূপতঃ চিত্রকবিতা, গীতিকবিতা নয়। তাতে ভাবের চিত্র ফুটে ওঠে শব্দের রেখায়, হৃদয়ানুভূতির গীতঝংকার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না তার ছন্দে। অনুত্তরঙ্গ স্বচ্ছ ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত হয় ভাবের চোখে দেখা চিত্রসৌন্দর্য, হৃদয়াবেগের কম্পন তাকে তরঙ্গিত করে তোলে না।

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য হয়তো পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ জাপানি কবিতা সবই চিত্রধর্মী নয়, অন্যবিধ কবিতারও অভাব নেই জাপানি সাহিত্যে। জাপানি ভাষায় গীতিরচনাও আছে যথেষ্ট, কবিতাকে সুরে বসিয়ে গান করার রীতিও সুপ্রচলিত। অর্থাৎ সে সাহিত্যে হৃদয়াবেগ প্রকাশের ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ নয়। তথাপি স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত মূলতঃ সত্য। জাপানি কবিতার অতি সংযত, সংহত ও নিস্তরঙ্গ ছন্দের বাঁধুনি ও তার অতি ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে হৃদয়াবেগের প্রবল উচ্ছ্বাস সম্ভবপর নয়। জাপানি ছন্দপ্রকৃতির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

প্রত্যেক সাহিত্যেই কবিতার ছন্দপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় ভাষার স্বকীয় বিশিষ্ট উচ্চারণপ্রকৃতির দ্বারা। জাপানি ছন্দও এ নীতির ব্যতিক্রম নয়। জাপানি ভাষায় পাঁচটিমাত্র স্বরবর্ণ এবং সবগুলিই হ্রস্ব। সে ভাষায় দীর্ঘস্বর নেই,

রুদ্ধস্বরও (closed vowel— যেমন অই্ (ঐ), অউ্ (ঔ), অও্, আই্, ইউ্ ইত্যাদি) নেই। তা ছাড়া, জাপানি ভাষায় সব ব্যঞ্জনবর্ণই স্বরান্ত, কোনো শব্দেই অ-স্বরান্ত ব্যঞ্জনধ্বনি নেই। ফলে ও-ভাষায় স্বরান্ত বা হসন্ত কোনোপ্রকার রুদ্ধদল (closed syllable) নেই। মুক্তদলই (open syllable) ও-ভাষার একমাত্র সম্বল। অধিকন্তু জাপানি শব্দে বলপ্রস্বরের (stress accent) প্রয়োগও নেই। সে ভাষায় গীতিপ্রস্বর (pitch বা musical accent) আছে বটে, কিন্তু গীতিপ্রস্বরের দ্বারা অর্থবোধেরই সহায়তা হয়, ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয় না। অর্থাৎ যে-কয়টি উপায়ে কবিতার ভাষায় উচ্চাবচ তরঙ্গভঙ্গি বা ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করা যায়, জাপানি ভাষায় তার কোনোটিই নেই। তা ছাড়া, যতিস্থিতির তারতম্য বা বিভিন্ন আয়তনের পর্বরচনার বৈচিত্র্যও দেখা যায় না জাপানি কবিতায়। শুধু পাঁচ ও সাত কলামাত্রার দু-রকম পর্বের যোগেই সব-রকম জাপানি কবিতা রচিত হয়ে থাকে। প্রস্বরস্থাপনের অর্থাৎ ঝোঁক দেবার ব্যবস্থা নেই বলে তাতে শক্তিসঞ্চার করা যায় না, ব্যঞ্জনসংঘাত নেই বলে ধ্বনিঝংকার সৃষ্টি করা যায় না, আর উচ্চারণের লঘুগুরুভেদজাত উত্থানপতন নেই বলে ধ্বনির গতিবৈচিত্র্যও আনা যায় না। জাপানি ছন্দ যে অন্যান্য ভাষার তুলনায় একঘেয়ে ও দুর্বল, আধুনিক কালে জাপানিরাও তা স্বীকার করেন। এক ধরনের কোমল সৌন্দর্যই ও-ছন্দের বৈশিষ্ট্য। আর, যেহেতু সুরে বসালে কবিতার সবকয়টি স্বরবর্ণ ই দীর্ঘ অর্থাৎ প্রলম্বিত হয়, সেইজন্য জাপানি গানে ওই কোমলতা আরও বেশি প্রকাশ পায়। তবে উচ্চারণগত গীতিপ্রস্বর, কিছু সরল অনুপ্রাস এবং শব্দযোজনাগত কতকগুলি আলংকারিক কলাকৌশলের দ্বারা জাপানিরা কবিতায় একপ্রকার ভাবস্পন্দ সৃষ্টি করে ও তার রস উপলব্ধি করে। কিন্তু সে ভাবস্পন্দ সর্বতোভাবেই ধ্বনিস্পন্দনিরপেক্ষ।

দেখা গেল জাপানি ভাষায় ছন্দোগত ধ্বনিবৈচিত্র্য উৎপাদনের ক্ষমতাই নেই। বস্তুতঃ ছন্দ বলতে যা বোঝায়, সে ভাষার সাহিত্যে তা প্রায় নেই বললেই হয়। আর, ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাবে সে সাহিত্যে ছন্দশাস্ত্রও গড়ে উঠতে পারে নি। যেখানে ছন্দ নেই, সেখানে ছন্দের নামও থাকতে পারে না। যা আছে তা হচ্ছে বিভিন্ন বন্ধের (form-এর) কবিতা বা রচনার নাম। সে নাম-গুলিও ছন্দোবৈচিত্র্যসূচক নয়, রচনার দৈর্ঘ্য বা বন্ধ-সূচক মাত্র। তার সংখ্যাও বেশি নয়। জাপানি সাহিত্যে যে কয়রকম বন্ধের কবিতা পাওয়া

যায় তার মধ্যে পাঁচটি প্রধান। বলা প্রয়োজন যে, ওই বন্ধ নিরূপিত হয় কবিতার পঙ্‌ক্তি বা পদ -সংখ্যা অনুসারে এবং প্রতি পদে থাকে একটিমাত্র পাঁচ বা সাত মাত্রার পর্ব। নিম্নে ওই পাঁচ রকম বন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

হাইকু

হাইকু (*Haiku*) ৫+৭+৫ মাত্রার ত্রিপদী বন্ধ। এই বন্ধের কবিতাকেই রবীন্দ্রনাথ 'অসমান মাত্রার তিন লাইনের কবিতাকণা' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলোচ্যমান রচনায় তিনি তার দৃষ্টান্ত দেন নি। হাইকু কবিতার তিনটি দৃষ্টান্ত [১] আছে তাঁর 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থে (অধ্যায় ১৩)। এখানে সে তিনটি উদ্‌ধৃত করা গেল।—

ক. পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

খ. পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎ কাল।

গ. স্বর্গ এবং মর্ত হচ্ছে ফুল,
দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল—
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।

১ এই দৃষ্টান্ত-তিনটির মধ্যে প্রথম দুটির রচয়িতা সুবিখ্যাত জাপানি কবি মাত্‌সুও বাশো (Matsuo Basho, 1644-1694)। হাইকু কবিতা রচনার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাত। এই দুটি কবিতার মধ্যে প্রথমটির ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য R. H. Blyth -প্রণীত *Haiku*, Vol. I (তোকিও, ১৯৪৯) গ্রন্থে (পৃ ২৭৭-৭৯)। আর দ্বিতীয়টির ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে Kenneth Yasuda -প্রণীত *The Japanese Haiku* (তোকিও, ১৯৫৯) গ্রন্থের ৪১, ৪৬, ৫১, ৫৫, ৫৮-৫৯, ৬৬, ৭২-৭৪, ১৬৯ এবং ১৮৪ পৃষ্ঠায়। বাশোর কবিতার বৈশিষ্ট্যের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে Blyth বলেন, বাশোর রচনায় Indian spirituality ও Chinese practicality-র সঙ্গে Japanese simplicity সমন্বিত হয়েছে (পৃ x)। 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত তৃতীয় হাইকু কবিতাটির রচয়িতা কে তা নির্ণয় করা যায় নি।

বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টান্ত-তিনটি হচ্ছে জাপানি কবিতার ভাবানুবাদ, গদ্যে। এগুলিতে হাইকু রচনার ছন্দ-রক্ষার কোনো প্রয়াস করা হয় নি। ছন্দ বাঁচিয়ে লিখলে হাইকু রচনার বাংলা রূপ হবে এ-রকম।—

পুরোনো ডোবা,
দাদুরী লাফালো যে,
জলেতে ধ্বনি।

এই 'কবিতাকণা'গুলির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, এগুলি দেখলে 'বেদের ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের শ্লোক মনে পড়ে'। বস্তুতঃ জাপানি হাইকু রচনা বৈদিক গায়ত্রী ছন্দের শ্লোকের সঙ্গেই তুলনীয়, ত্রিষ্টুভ্ শ্লোকের সঙ্গে নয়। গায়ত্রী শ্লোকেই থাকে তিন পঙ্ক্তি বা পদ, আর প্রতি পদে থাকে আটটি করে দল (syllable)। তৎসবিতুর্বরেণ্ইঅম্[১] ইত্যাদি গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্র সকলেরই সুপরিচিত। তাই এ স্থলে গায়ত্রী ছন্দের অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

অগ্নিমীলে। পুরোহিতম্
যজ্ঞস্য দে-। বমৃত্বিজম্
হোতারং র-। ত্নধাতমম্।

বলা বাহুল্য, এই গায়ত্রী শ্লোকও আয়তনে জাপানি হাইকু থেকে যথেষ্ট বড়ো। ত্রিষ্টুভ্ শ্লোক আরও বড়ো। এর প্রতি শ্লোকে সাধারণতঃ থাকে চার পদ এবং প্রতি পদে থাকে এগারো দল বা সিলেব্ল্। ঋক্‌সংহিতায় অবশ্য দুই, তিন এবং পাঁচ পদের ত্রিষ্টুভ্ শ্লোকও পাওয়া যায়। কিন্তু তা ব্যতিক্রম বলেই গণ্য। প্রতি শ্লোকে চার পদ থাকাই ত্রিষ্টুভের সাধারণ বিধি। তাই হাইকু শ্লোকের সঙ্গে গায়ত্রী শ্লোকের তুলনাই অধিকতর সমীচীন বা স্বাভাবিক। এমনও হতে পারে যে, গায়ত্রী শ্লোকের কথা বলাই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল, তবে ত্রিষ্টুভ্ নামটার আকর্ষণে তাঁর উক্তিতে কিছু ভ্রান্তি ঘটেছে।

১ ছন্দ-রক্ষার প্রয়োজনে 'বরেণ্যম্' শব্দটিকে 'বরেণ্ইঅম্' রূপে উচ্চারণ করতে হয়। নতুবা গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথম পদে আট দল থাকে না।

তানকা

তানকা[১] (*Tanka*) ৫+৭+৫+৭+৭ মাত্রার পঞ্চপদী বন্ধ। হাইকুর সঙ্গে সাতমাত্রার দুটি পদ যোগ করলেই তানকা হয়। হাইকু এবং তানকায় এইটুকু মাত্র পার্থক্য। তানকা বন্ধের রচনা জাপানি সাহিত্যে সাধারণতঃ ওয়াকা (*waka*) বা 'ক্ষুদ্র কবিতা' নামেই পরিচিত। হাইকু ও তানকা বন্ধের রচনাই জাপানি সাহিত্যে সর্বাধিক প্রচলিত। অথচ রবীন্দ্রনাথ তানকার দৃষ্টান্ত দেন নি ; এমন কি, তার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। তবে সত্যেন্দ্রনাথের দুটি রচনায় তানকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন—

অশ্রুর দেশে
হাসি এসেছিল ভুলে ;
সে হাসিও শেষে
মরণে পড়িল ঢুলে,
অশ্রু-সায়র-কূলে।

—'অভ্র-আবীর', তানকা-সপ্তক (প্রবাসী ১৩২০ আষাঢ়)

বলা প্রয়োজন যে, এ রচনাটিকে যথার্থ তানকা বলে গণ্য করা যায় না। কেননা, এটিতে তানকা বন্ধের মাত্রাপরিমাণ যথাযথভাবে রক্ষিত হয় নি। এটির মাত্রাসমাবেশ হচ্ছে ৬+৮+৬+৮+৮। অর্থাৎ তানকার তুলনায় এটির প্রতি পদে এক মাত্রা বেশি আছে। তা ছাড়া অশ্রুর্, অশ্রু এবং সায়র্ এই তিন শব্দে রুদ্ধদলও (অশ্, রুর্, য়র্) আছে। জাপানিতে রুদ্ধদল থাকে না, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। জাপানি তানকার নীতি পুরোপুরি বাঁচিয়ে বাংলায় তার রূপ হবে এ-রকম।—

কাঁদার' দেশে
হাসি যে এলো ভুলে ;
সেও তো শেষে
মরণে প'ল ঢুলে,
দুখের' নদী কূলে।

১. জাপানি ভাষায় ন্ বাংলা ন্-এর চেয়ে পূর্ণতর রূপে উচ্চারিত হয়। বস্তুতঃ ন্ একটি স্বতন্ত্র দল বলেই গণ্য হয়। তাই 'তান্কা' শব্দেও তিনটি দলই গণনা করতে হবে।

ছন্দের খাতিরে এখানে 'কাঁদার' ও 'দুখের' শব্দকে অকারান্ত করে উচ্চারণ করা প্রয়োজন। তা ছাড়া, এটিতে মিলও রাখা হয়েছে। জাপানি কবিতায় মিল থাকে না। বলা বাহুল্য, বাংলায় খাঁটি তানকা রচনা সহজসাধ্য নয় এবং তা বাংলা ভাষাপ্রকৃতির খুব অনুকূলও নয়।[১] তাই সত্যেন্দ্রনাথ জাপানি তানকাকে বাংলা ভাষার উপযোগী করে কিছু রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত এই নূতন তানকাকে বলা যায় 'বাংলা তানকা'। 'অভ্র-আবীর' কাব্যের 'বৈকালী' কবিতাটিও এই বাংলা তানকা বন্ধেই রচিত।

চোকা

চোকা (*Choka*) একটি বহুপদী বন্ধ। পাঁচ ও সাত মাত্রার অনির্দিষ্টসংখ্যক যুগ্মপদের পরে একটি অতিরিক্ত সাত মাত্রার পদ যোগ করলেই চোকা বন্ধ হয়। তানকার সঙ্গে চোকার তফাত এই যে, তানকায় পাঁচ ও সাত মাত্রার যুগ্মপদ থাকে মাত্র দুটি, আর চোকায় ও-রকম যুগ্মপদের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। গাণিতিক ভাষায় বলা যায়—

তানকা $= (৫ + ৭) \times ২ + ৭$ মাত্রা ;

চোকা $= (৫ + ৭) \times x + ৭$ মাত্রা।

চোকা বন্ধের কবিতাকে জাপানি ভাষায় **নাগা-উতা** (*naga-uta*) বা 'দীর্ঘ-কবিতা' বলেও বর্ণনা করা হয়। দীর্ঘ বলে গণ্য হলেও চোকা সাধারণতঃ খুব দীর্ঘ হয় না। দীর্ঘতম চোকাতেও দেড় শোর বেশি পদ বা পঙ্‌ক্তি দেখা যায় না। সুতরাং সব জাপানি কবিতাই ক্ষুদ্রাকার এ কথা বলা ঠিক নয়।[২] তবে এ কথা ঠিক যে, হ্রস্ব-কবিতা রচনাই সাধারণ জাপানি রীতি। তানকা

১ সত্যেন্দ্রনাথ অনেক জাপানি কবিতারই বাংলা পদ্যানুবাদ করেছেন। কিন্তু কোথাও মূল জাপানি ছন্দ অনুসরণের প্রয়াস করেন নি। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, মূল জাপানি ছন্দ ঠিকমতো রক্ষা করতে গেলে বাংলার স্বকীয় ছন্দপ্রকৃতি বজায় থাকে না।

২ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য বর্তমান সম্পাদকের "বাংলায় জাপানি ছন্দ" প্রবন্ধ : বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৯ মাঘ-চৈত্র, পৃ ২০৮।

জাপানি সাহিত্যের ক্ষুদ্র কবিতা আর হাইকু ক্ষুদ্রতম কবিতা। তানকা ও হাইকুই ও-সাহিত্যের প্রধান সম্পদ্।

রবীন্দ্রনাথ চোকার যে দৃষ্টান্তটি রচনা করেছেন সেটি কিন্তু আয়তনে খুবই ছোটো, তানকার সঙ্গে পাঁচ ও সাত মাত্রার দুটিমাত্র অতিরিক্ত পদ যোগ করেছেন। তাতে চোকার আয়তন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার একটু অবকাশ থেকে যায়। রবীন্দ্ররচিত দৃষ্টান্তটি এই—

সাহসী বীর
দেখেছি কত অরি
করেছে জয়।
দেখি নি তোমা সম
এমন ধীর—
জয়ের ধ্বজা ধরি
স্তবধ হয়ে রয়॥

দুটি বাড়তি পদ বাদ দিয়ে এটিকে অতি সহজেই তানকায় পরিণত করা যায়। যেমন—

সাহসী বীর
দেখি নি তোমা সম
এমন ধীর—
জয়ের ধ্বজা ধরি
রয়েছ তবু থির॥

বলা নিষ্প্রয়োজন, মিলগুলি বাংলার বাড়তি অলংকার। তা ছাড়া বীর, ধীর ও থির শব্দের হসন্ত উচ্চারণেও জাপানি রীতি লঙ্ঘিত হয়েছে।

সেদোকা

সেদোকা (*Sedoka*) (৫+৭+৭)×২ মাত্রার ষট্‌পদী বন্ধ। 'সেদোকা' শব্দের অর্থ শিরোভাগের (অর্থাৎ প্রথমার্ধের) পুনরাবর্তনকারী কবিতা। সুতরাং বাংলায় একে বলা যায় 'মূর্ধাবৃত্ত'। বস্তুতঃ তানকার শেষ তিন পদকে দ্বিগুণিত করলেই হয় সেদোকা। এই বন্ধের রবীন্দ্ররচিত দৃষ্টান্তটি এই।—

সাগরতীরে
শোণিতমেঘে হল
নিশীথ অবসান।
পূবের পাখি
পুরব মহিমারে
শুনায় জয়গান॥

সাগর, শোণিত প্রভৃতি শব্দকে যথাসম্ভব স্বরান্তরূপে উচ্চারণ করা প্রয়োজন। তা হলে জাপানি ধ্বনিপ্রকৃতির অনেকটা কাছাকাছি আসা যাবে। আগেই বলেছি, জাপানি শব্দের সব দলই স্বরান্ত, অনেকটা ওড়িয়া ভাষার মতো।

ইমায়ো

ইমায়ো (*Imayo*) ৭+৫+৭+৫ মাত্রার চৌপদী বন্ধ। আয়তনের হিসাবে এইজাতীয় রচনা হাইকু ও তানকার মধ্যবর্তী এবং ওই দু-রকম রচনার ন্যায় ক্ষুদ্র কবিতা বলেই স্বীকার্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইমায়ো বন্ধের যে দৃষ্টান্তটি রচনা করেছেন সেটি সেদোকা এবং চোকার দৃষ্টান্ত-দুটির চেয়েও দীর্ঘ, আট পদে বিস্তৃত। রবীন্দ্ররচিত দৃষ্টান্তটি এই।—

গেরুয়া বাস পরি
ধর্মগুরু
শিখাতে গিয়েছিল
তোমার দেশে।
আজি সে শিখিবারে
কর্মনীতি
তোমার দ্বারে ধায়
শিষ্যবেশে॥

বস্তুতঃ এই রচনাটি দুটি ইমায়োর আয়তন অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত না থাকায় ইমায়োকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতা বলেই ভ্রান্তি জন্মাতে পারে। আসলে ইমায়ো তানকার চেয়েও ছোটো। পক্ষান্তরে চোকাই হচ্ছে দীর্ঘতম জাপানি কবিতা। কিন্তু রবীন্দ্ররচিত দৃষ্টান্তটি থেকে মনে হতে পারে চোকা ইমায়োর চেয়েও স্বল্পায়তন।

তা ছাড়া, জাপানি বচনভঙ্গি বজায় রাখতে হলে বাস, তোমার ও ধার শব্দকে অকারান্তরূপে উচ্চারণ করা প্রয়োজন এবং ধর্ম কর্ম প্রভৃতি শব্দকেও ধরম, করম রূপে ভেঙে নিয়ে স্বরান্তরূপে পড়া দরকার। কেননা, পূর্বেই বলেছি জাপানি শব্দে প্রত্যেকটি দলই স্বরান্ত রূপে উচ্চারিত এবং এক-এক দল এক মাত্রা বলে স্বীকৃত।

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, জাপানি উচ্চারণ ও ছন্দোনীতি বাঁচিয়ে বাংলায় ছোটোখাটো দৃষ্টান্ত রচনা করা সম্ভব হলেও জাপানিদের মতো অবাধে কবিতা রচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ জাপানি উচ্চারণ ও ছন্দোনীতি বাংলাভাষার প্রকৃতিসম্মত নয়। তা ছাড়া, শক্তি ও বৈচিত্র্যের বিচারে জাপানি ছন্দের আপেক্ষিক দৈন্য ও দুর্বলতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

পরিশেষে এই কথা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ১৯০৪-০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভের পর যখন বিজয়ী জাপানের অভ্যুদয়গরিমা এশিয়ার পূর্বাকাশকে উষার আলোকে রঞ্জিত করে তুলেছিল, তখন জাপানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। জাপানি ছন্দে রচিত 'জাপানের প্রতি' নামের তিনটি কবিতাতে সেই শ্রদ্ধার প্রকাশ সুস্পষ্ট।

ছন্দের নিয়ম ও রসতত্ত্ব

শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক (১৩০৯ আষাঢ়-পৌষ) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত হয় 'স্মৃতি' নামে। 'ছন্দের নিয়ম ও রসতত্ত্ব' নিবন্ধিকাটি ওই গ্রন্থে সংকলিত একটি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ। 'স্মৃতি' গ্রন্থে পত্রটির মুদ্রিত তারিখ ১৩১৩ কার্তিক ৮। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূলপত্রে তারিখ আছে ১৩১৭ কার্তিক ৮। গ্রন্থে মুদ্রিত তারিখটি যে ভুল তা অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রমাণেও সমর্থিত হয়। পত্রটি লিখিত শিলাইদহ থেকে। কিন্তু গ্রন্থে মুদ্রিত তারিখে রবীন্দ্রনাথ যে শিলাইদহে ছিলেন না, তার প্রমাণ আছে। এই পত্রাংশটি এবং উক্ত মুদ্রণগত ভ্রান্তির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

'ছন্দের সার্থকতা' শীর্ষক পত্রাংশের ন্যায় এই পত্রাংশেরও আসল গুরুত্ব রবীন্দ্রস্বীকৃত ছন্দতত্ত্বগত, ছন্দের বিশ্লেষণগত নয়। সে হিসাবে এই দুটি রচনা ছন্দের অর্থ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় এবং ছন্দের প্রকৃতি ও গদ্যছন্দ প্রবন্ধ-দুটির প্রথমাংশের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত। এগুলি এবং অন্য নানা স্থানে ছড়ানো উক্তিকে একত্র সমন্বিত করলে ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক অভিমতের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

ছন্দের নিয়মের মধ্য দিয়েই নিয়মাতীত সৌন্দর্যের প্রকাশ, নিয়মবন্ধনের মধ্যেই পাওয়া যায় আনন্দময় মুক্তির স্বাদ— এই তত্ত্বটুকুই ব্যাখ্যাত হয়েছে এই রচনাটিতে। কবিচিত্তে অনুভূত একটি গভীর সত্য প্রকাশ পেয়েছে এই পত্রের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে। এই অনুভূত সত্যটি স্বভাবতঃই ধ্বনিত হয়েছে তাঁর গদ্য-পদ্য নানা রচনায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর দুটি উক্তি এখানে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে।—

১. মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।

—ভাষা ও ছন্দ, 'কাহিনী' (১৩০৬)

২. অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে
এ মোর ছন্দ-বন্ধনে।

—অধরা (১৩৪৬), 'সানাই'

সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ

জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের (১৯১২) 'সন্ধ্যাসংগীত'-শীর্ষক অধ্যায়টি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায়। 'সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ' ওই অধ্যায়েরই প্রাসঙ্গিক অংশ। এটি 'ছন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৬৯) প্রথম গৃহীত হয়।

'একদিন দেব তরুণ তপন' ইত্যাদি অংশটি বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের 'সুরবালা' -নামক তৃতীয় সর্গের প্রথম শ্লোক। এই সর্গটি 'বঙ্গসুন্দরী'

কাব্যের প্রথম সংস্করণে (১৮৭০) ছিল না। দশ বৎসর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কালে (১৮৮০) এটি ওই কাব্যে প্রথম সন্নিবিষ্ট হয়।

এই দৃষ্টান্তের ছন্দকে বলা হয়েছে 'তিনমাত্রামূলক' ছন্দ। যে ছন্দের প্রতি পূর্ণপর্বে ছয় মাত্রা এবং উপপর্বে তিন মাত্রা থাকে, তাকেই বলা হয়েছে 'তিনমাত্রামূলক'। এই তিনমাত্রামূলক ছন্দেরই অপর নাম 'ত্রৈমাত্রিক' বা 'অসম মাত্রা'র ছন্দ। দ্রষ্টব্য 'সংজ্ঞাপরিচয়'।

'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের 'উপহার' -নামক প্রথম সর্গ বাদে অন্য সমস্ত সর্গই এই তিনমাত্রামূলক ছন্দে রচিত। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির অর্থাৎ পূর্ণযতি-বিভাগের প্রথম অংশে বারো মাত্রা, দ্বিতীয় অংশে এগারো।[১] ছন্দ-পরিভাষায় এই অংশগুলিকে বলা যায় 'পদ'। প্রতি পদে দুই পর্ব এবং প্রতি পূর্ণপর্বে ছয় মাত্রা ; শেষ পর্ব অপূর্ণ। অর্থাৎ এই ছন্দের প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী এবং প্রত্যেক পদ দ্বিপর্বিক।

"বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক।"— রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে মনে হতে পারে 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যেই এ ছন্দ প্রথম প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এ ছন্দ আসলে নূতন নয়। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের রচনাতেও অনুরূপ ছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—

কি মেরুশিখর কিবা বিধুবর
বিবেচনা কর কি তরুতলে।
শিখরী অচল, এ দেখি সচল,
শশাঙ্ক সমল সকলে বলে॥ —রামপ্রসাদ, 'বিদ্যাসুন্দর'

কৃষ্ণচন্দ্রের 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন' ইত্যাদি সুপরিচিত রচনাটির ('সদ্ভাব-শতক', ১৮৬১) ছন্দও অনুরূপ। দুটিতেই পর্বে পর্বে মিল আছে। প্রাচীন ছান্দসিকরা এইজাতীয় ছন্দকে বলেন 'লঘু চৌপদী'। কিন্তু এ ছন্দ আসলে চৌপদী নয়, চৌপর্বিক। কেননা ছয় মাত্রার বিভাগগুলি পদ নয়, পর্ব। পদসংখ্যার বিচারে এ ছন্দ দ্বিপদী।

পর্বে পর্বে মিল রাখা এ ছন্দের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। পর্বগত মিলহীন

১ দ্রষ্টব্য : 'বিহারীলালের ছন্দ', দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

রচনার দৃষ্টান্ত আছে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়। যথা—

ভূতময় ছিল প্রাণাধিক যত,
মনোময় তারা হলো এক্ষণে।
ভুলি ভুলি করি ভুলিতে পারি নে,
থেকে থেকে সদা জাগিছে মনে ॥

—'বোধেন্দুবিকাস', পঞ্চম অঙ্ক, মন-এর গীত

বঙ্গসুন্দরীর ছন্দেও পর্বগত মিল নেই। কিন্তু প্রথম-তৃতীয় এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ পদে মিল রাখা হয়েছে। এটুকু ছাড়া এ ছন্দে কোনো নূতনত্ব নেই। কিন্তু এই পদগত মিল রাখাও এ ছন্দের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী' ইত্যাদি 'পুরস্কার'-নামক সুপরিচিত রচনাটি ('কাহিনী', ১৯০০)।

'একদিন দেব তরুণ তপন' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটির সম্পর্কে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, এক সময়ে এটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল। তাই নানা প্রসঙ্গে এটির কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। অল্প বয়সে তিনি এটিকে তিনমাত্রামূলক ছন্দের আদর্শ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। তার একটি কারণ এই যে, এটিতে একটিও যুক্তাক্ষর নেই বলে এর 'ছন্দসংগীত' অর্থাৎ শ্রুতিমাধুর্য অক্ষুণ্ণ আছে। 'মানসী' রচনার পূর্বে যুক্তাক্ষরের সহায়তায় শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টির কৌশল কবির আয়ত্ত হয় নি। তাই তখন যুক্তাক্ষর বর্জনের দিকেই ছিল তাঁর আগ্রহ। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'বিহারীলালের ছন্দ' দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং 'ছন্দবিচার' প্রথম পর্যায়, প্রথম তিন অনুচ্ছেদ।

সন্ধ্যাসংগীত কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর মুক্তবন্ধ (free form) ছন্দ। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'কবিতার ছাঁচ' অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ সম্পর্কে সমস্ত পূর্বসংস্কার ত্যাগ করে কবিতাকে সম্পূর্ণ নূতন সাজে সজ্জিত করেন। ছন্দোবন্ধের এই নিঃসংস্কার মুক্তরূপটাই সন্ধ্যাসংগীত কাব্যটিকে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। কবিতার বহিরঙ্গ সম্পর্কে এই স্বাধীনতা এক দিকে যেমন এই পর্যায়ের কবিতাগুলিকে একটি অভিনব স্বাতন্ত্র্য দান করেছে, অপর দিকে তেমনি পরবর্তী 'বলাকা-পলাতকা' পর্যায়ের মুক্ত কাব্যরূপের পূর্বাভাস সূচিত করেছে। এ বিষয়ের বিশদতর আলোচনা দ্রষ্টব্য পরবর্তী 'মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ'-শীর্ষক রচনায় (অনুষঙ্গ ১) পাঠপরিচয় অংশে।

অনুষঙ্গ ১

মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ

বাংলা ছন্দের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪-১৯১২) 'রাবণবধ' নাটকখানি (১২৮৮ কার্তিক) স্মরণীয় হয়ে আছে তার ছন্দোবৈশিষ্ট্যের জন্য। যে বিশেষ ছন্দোবন্ধটি পরবর্তী কালে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে খ্যাত হয়, গিরিশচন্দ্র তার প্রথম প্রয়োগ করেন এই রাবণবধ নাটকে। তার অল্পকাল পরে প্রকাশিত 'অভিমন্যু-বধ' নাটকেও (১২৮৮ অগ্রহায়ণ) এই নূতন ছন্দোবন্ধই অনুসৃত হয়। ১২৮৮ সালের মাঘ-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় এই নাটক-দুখানির যে সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাতে এই নূতন ছন্দোবন্ধ বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়। 'মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ' এই সমালোচনারই প্রাসঙ্গিক অংশ।

পত্রিকায় এই সমালোচনার লেখকের নাম ছিল না। তবে সমালোচনার ভাষা ও ভঙ্গি থেকে মনে হয় এই সমালোচনাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই লেখনী-প্রসূত। 'ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা', অলংকারশাস্ত্রোক্ত (মানে ছন্দশাস্ত্রোক্ত) ছন্দের পরিবর্তে 'হৃদয়ের ছন্দ' প্রচলনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং 'ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি' এই উক্তি স্বভাবতঃই তৎকালীন ছন্দ-পরীক্ষণরত রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'রাবণবধ' রচিত হবার কিছু-কাল আগে থেকেই তাঁর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্যায়ের (১৮৮৭-৮৯) কবিতাগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল। এ সময়েই রবীন্দ্রনাথ ছন্দোবন্ধ (verse form) বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তখনকার দিনে ছন্দোবদ্ধ কবিতা লেখার যেসব 'ছাঁচ' বা বন্ধ প্রচলিত ছিল, তিনি সেগুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হৃদয়ে যখন যে-ভাব যে রূপ বা আকার নিয়ে আসে তাকে সেই রূপ দিয়েই প্রকাশ করতে লাগলেন। এইজন্যই এজাতীয় ছন্দকে তিনি 'হৃদয়ের ছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন।

বাঁধা রীতির বন্ধন থেকে এই মুক্তিলাভের কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে (১৩১৯) লিখেছেন— 'এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম।

নদী যেমন কাটা খালের মতো সিধা চলে না, আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল।'— দ্রষ্টব্য 'সন্ধ্যাসংগীত-এর ছন্দ' প্রবন্ধ।

আরও পরবর্তী কালে আত্মপরিচয় (১৩৩৮ পৌষ) প্রসঙ্গে সন্ধ্যাসংগীতের এই **স্বৈরবন্ধ** বা **মুক্তবন্ধ** (free form) ছন্দের কথা মনে করেই তিনি বলেছিলেন—'আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া।' তার অল্পকাল পরে তিনি হেমন্তবালা দেবীকে এক পত্রে (১৩৩৯ কার্তিক ৪) লেখেন—"আমার বয়স যখন আঠারো তখন আমি প্রচলিত পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামতো ছন্দে কবিতা লিখতে সুরু করেছিলুম। আমার সেই ছন্দের কাব্যকে তৎকালীন সাহিত্যের প্রবীণ মুরুব্বিরা 'কাব্যি' বলে প্রচণ্ড বিদ্রূপ করেছিলেন।"— 'চিঠিপত্র', নবম খণ্ড (১৩৭১ বৈশাখ), ১০১-সংখ্যক পত্র, পৃ ১৭৬। বলা বাহুল্য, সন্ধ্যাসংগীতের 'লাগাম-ছেঁড়া' ছন্দই এই উক্তির লক্ষ্য। রচনাবলী-সংস্করণ সন্ধ্যাসংগীতের ভূমিকাতেও (১৩৪৬ আশ্বিন) তিনি এই কবিতাগুলির নূতন ছন্দসজ্জার কথা বলেছেন। এই নূতন ছন্দসজ্জার প্রসঙ্গটা পরে যথাস্থানে আবার উত্থাপন করা যাবে।

গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' প্রকাশের পূর্বে সন্ধ্যাসংগীত পর্যায়ের অন্ততঃ সাতটি মুক্তবন্ধ ছন্দের কবিতা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ-১২৮৮ কার্তিক)।[১] প্রথম তিনটির নাম যথাক্রমে 'দুই দিন' (১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ), 'দুঃখ-আবাহন' (১২৮৭ ফাল্গুন) এবং 'তারকার আত্মহত্যা' (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)। 'দুই দিন' কবিতার প্রথম স্তবক এই—

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহারজাল,
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন ;
মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতিমাতা শুভ্র বাষ্পজালে-গাঁথা
কুজ্ঝটি-বসনখানি দেছেন টানিয়া।
পশ্চিমে গিয়েছে রবি, স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
বিদেশে আসিনু শ্রান্ত পথিক একেলা।

১ দ্রষ্টব্য পুলিনবিহারী সেন : 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' প্রথম খণ্ড (আষাঢ় ১৩৮০), পৃ ৫৪-৫৫।

'তারকার আত্মহত্যা'-র শেষাংশটুকুও উদ্‌ধৃত করছি।—

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধারসাগরে—
গভীর নিশীথে
অতল আকাশে।
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কি রে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে
ওই আঁধারসাগরে
এই গভীর নিশীথে
ওই অতল আকাশে।

এর সঙ্গে তুলনীয় 'রাবণবধ' নাটকের প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি। রাবণের প্রতি নিকষার উক্তি—

ধর বৎস,
ধর উপদেশ, রাখ বাক্য জননীর।
প্রাণ কাঁদে, তাই বলি তোরে,
কেন প্রাণ হারাও আহবে ?
কর আপন কল্যাণ, রাখ জননীর মান।
ঠেকেছ, জেনেছ পুত্রশোক,
জেনে শুনে কেন— মহাজ্ঞানী তুমি—
হান সেই শেল মায়ের হৃদয়ে !
ফিরাইয়ে দেহ ভিখারীর ধন ভিখারীরে,
রাজধর্ম করহ পালন।

দেখা যাচ্ছে, উভয় ক্ষেত্রেই ছন্দশাস্ত্রোক্ত পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বন্ধের, এমন কি, মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর বন্ধের নির্দিষ্ট রীতি লঙ্ঘন করে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' অবলম্বন করা হয়েছে, উভয়ত্রই অনুসৃত হয়েছে কবির 'হৃদয়ের ছন্দ'। স্পষ্টতঃই সন্ধ্যাসংগীত কাব্য এবং 'রাবণবধ' নাটকে অনুসৃত ভাবানুসারী হৃদয়-ছন্দের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। একটিতে আছে লিরিক কবিতার উপযোগী হৃদয়ানুভূতির ছন্দ; আর অপরটিতে আছে রঙ্গমঞ্চে নাট্যসংলাপের উপযোগী হৃদয়াবেগের ছন্দ। তাই স্বভাবতঃই লিরিক কবিতার হৃদয়-ছন্দ হয়েছে

মিত্রাক্ষর (যদিও প্রয়োজনমতো মাঝে মাঝে মিল বর্জনের অধিকারও রাখা হয়েছে), আর নাটকের হৃদয়-ছন্দ হয়েছে অমিত্রাক্ষর (যদিও সুযোগমতো এখানে-সেখানে কিছু মিলও ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে)। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকীয় ছন্দকে শুধু 'নূতন অমিত্রাক্ষর' বলেই ক্ষান্ত হন নি, বলেছেন 'ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর'। সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দ অমিত্রাক্ষর নয়। তা সত্ত্বেও উভয় গ্রন্থের ছন্দোগত একটি সামান্য লক্ষণ আছে। সে লক্ষণ হল মিত্রাক্ষর-অমিত্রাক্ষর-নির্বিশেষে পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন ও হৃদয়-ছন্দের অনুবর্তন। মেঘনাদবধের ছন্দ অমিত্রাক্ষর হলেও পয়ারবন্ধের ছাঁচে ঢালা। রাবণবধের ছন্দও অমিত্রাক্ষর, কিন্তু পয়ারের ছাঁচটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাই এ ছন্দকে বলা হয়েছে 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর'। সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দেও পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বন্ধকে খাতির করা হয় নি। এই মুক্তবন্ধ রূপটাই উভয় গ্রন্থের ছন্দোগত প্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব, মিল রাখা বা না-রাখা নয়। সম্ভবতঃ এজন্যই সন্ধ্যাসংগীতের ভাঙাছন্দ-রচয়িতা তরুণ কবি রাবণবধের ভাঙা-ছন্দের আদর্শে উৎসাহিত হয়ে বলেছেন, 'গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম'।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বাংলা সাহিত্যে 'ভাঙা-অমিত্রাক্ষর' ছন্দ প্রবর্তনের কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্রের প্রাপ্য নয়, সে কৃতিত্বের যথার্থ অধিকারী কবি-নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪-৭৩)। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকে (১৮৬০) ভাঙা অমিত্রাক্ষরের আবির্ভাব। তার পরে এ ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ব্রজমোহন রায়ের (১৮৩১-৭৬) 'দানববিজয়' পালা নাট্যে। কিন্তু সচেতন ও ব্যাপকভাবে এ ছন্দের প্রথম প্রযোক্তা হলেন কবি-নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪)। এ ক্ষেত্রে রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের অগ্রবর্তী। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' প্রকাশের তারিখ ১৮৮১ নভেম্বর ৫, প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৮১ জুলাই ৩০। আর রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটক প্রকাশের তারিখ ১৮৮১ জুলাই ২৮, প্রথম অভিনয়ের তারিখ আরও পূর্ববর্তী। 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের ভূমিকাতে এই নূতন অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনের যৌক্তিকতা সবিস্তারে বিবৃত হয়, 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' নামটিও বোধ হয় ওই ভূমিকাতেই প্রথম প্রযুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, এই নাটকের তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'নিভৃতনিবাস' কাব্যের (১৮৭৮) কিছু অংশও ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছিল। তাই স্বীকার

করতে হবে 'গৈরিশ ছন্দ' নামটা অযৌক্তিক এবং ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে বর্জনীয়।[১]

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম অভিনীত হয় (১৮৭৫ মার্চ) বেঙ্গল থিয়েটারে। এই অভিনয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাজকৃষ্ণ তাঁর হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, মধুসূদনের চতুর্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষর ছন্দ অভিনেতাদের 'বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত হইয়া আমাদের কর্ণে কেমন আর-একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল।' এই নূতন আভিনয়িক ছন্দের আদর্শেই হরধনুর্ভঙ্গ রচিত হয়। পক্ষান্তরে গিরিশচন্দ্র ছিলেন ওই বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত আভিনয়িক ছন্দের বিরোধী। তাই তিনি তাঁর মেঘনাদবধ নাটকের প্রস্তাবনায় (প্রথম অভিনয়কালে পঠিত, ১৮৭৭ ফেব্রুআরি ২) উক্ত আভিনয়িক ছন্দে 'যতি' রক্ষিত হয় নি বলে কটাক্ষপাত করে সগর্বে ঘোষণা করেন—

হলে কাব্য অভিনয়, জীবন সঞ্চার হয়,
কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জন?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, সে যতিরে বলিদান
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন!

বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদবধ নাটকে অমিত্রাক্ষর পয়ার বন্ধই অনুসৃত হয়। রাবণবধ নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন এ বিষয়ে তাঁর মত-পরিবর্তনের ফল বলেই মনে হয়। মেঘনাদবধ নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে।[২]

হরধনুর্ভঙ্গ নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর প্রবর্তিত হয় রাবণবধ নাটকের অতি

১ এ কথা অবশ্য সত্য যে, ভাঙা অমিত্রাক্ষরের জনপ্রিয়তার মূলে আছে গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিভা। তাই এ ছন্দের নাম হয়েছে 'গৈরিশ ছন্দ'। কিন্তু এই নাম অনৈতিহাসিক ও ভ্রান্তিজনক। তা ছাড়া এই নামে পূর্বগামীদের প্রতি, বিশেষতঃ রাজকৃষ্ণের প্রতি অবিচার করা হয়।

২ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন: 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', ১৩৫২ বৈশাখ, পৃ ১২০-২৭; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'রাজকৃষ্ণ রায়', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৫০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৩ ভাদ্র, পৃ ৪০-৪৬ এবং দেবীপদ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'গিরিশ-রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, মে ১৯৭১: "গৈরিশ ছন্দ", পৃ ১১-১৯, "ভূমিকা", পৃ ২৯ ও মূলগ্রন্থ, পৃ ১৪৭-৪৮।

অল্পকাল পূর্বে। তাই স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে— ভারতীতে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্রের নাটক-দুটির সমালোচনা কার লেখা, রবীন্দ্রনাথের না রাজকৃষ্ণের ? হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের ভূমিকার সঙ্গে এই সমালোচনাটি মিলিয়ে পড়লে এমন মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, রাজকৃষ্ণই ওই সমালোচনার লেখক। এই অনুমানের সমর্থনে কিছু যুক্তি দেখানোও অসম্ভব নয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এটি রবীন্দ্রনাথেরই লেখা ; রাজকৃষ্ণের নয়। "কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকারশাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়। ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিয়া আসিতেছি।"—এই উক্তিটি বিচার করে দেখা যাক। রাজকৃষ্ণের আগ্রহ শুধু ভাঙা অমিত্রাক্ষরের প্রতি, ভাঙা মিত্রাক্ষরের প্রতি নয় ; আর তাও নাট্যরচনায়, কাব্যরচনায় নয়। তাঁর 'নিভৃতনিবাস' কাব্যের কিছু অংশ ভাঙা অমিত্রাক্ষরে রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু খণ্ডকাব্যে এ ছন্দ 'একঘেয়ে' লাগে বলে কাব্যরচনায় ওই ছন্দের প্রয়োগ পরিত্যক্ত হয়। অথচ এই সমালোচনা প্রকাশের পরে তাঁর আরও তিনখানি নাটকে (১৮৮২-৮৪) ভাঙা অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ দেখা যায়। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আগ্রহ ভাঙা মিত্রাক্ষরের প্রতি, ভাঙা অমিত্রাক্ষরের প্রতি নয় ; তাও কাব্যরচনায়, নাট্যরচনায় নয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কোনো নাট্যরচনায় ভাঙা অমিত্রাক্ষর প্রযুক্ত হয় নি। ভারতীর সমালোচনায় গিরিশচন্দ্রের নূতন অমিত্রাক্ষর প্রশংসিত হয়েছে বটে, কিন্তু এ ছন্দের আভিনয়িক উপযোগিতা সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা হয় নি। রাজকৃষ্ণ কিন্তু এ ছন্দকে বারবারই 'আভিনয়িক ছন্দ' বলে অভিহিত করেছেন। এক স্থানে স্পষ্ট করেই বলেছেন—'উক্ত ছন্দকে আমরা ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা আভিনয়িক ছন্দ বলি।' ভারতীর সমালোচনায় এই মনোভাবের আভাসমাত্রও পাওয়া যায় না। এই ছন্দের প্রতি রাজকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্বের কারণ এ ছন্দ অভিনেতাদের 'বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত' ; আর ভারতীর সমালোচকের পক্ষপাতিত্বের কারণ এ ছন্দ মূলতঃ 'হৃদয়ের ছন্দ' অর্থাৎ কবির হৃদয়ভাবের অনুগত। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয় এই যে, পরবর্তী কালে গদ্যছন্দের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকথিত 'ভাবের ছন্দ', আর 'এই হৃদয়ের ছন্দ' স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। পার্থক্য শুধু এই যে, আলোচ্যমান 'হৃদয়ের ছন্দ' পুরোপুরি মাত্রাসংখ্যাত আর 'ভাবের ছন্দ' সর্বতোভাবেই মাত্রাসংখ্যানিরপেক্ষ। প্রথমটি পদ্যকবিতার বাহন, আর

দ্বিতীয়টি গদ্যকবিতার। কিন্তু উভয়ের মূলপ্রকৃতি এক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রকৃত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচনায় (ভারতী ১২৮৪ শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন) হৃদয়ের কথা, হৃদয়ের কবিতা, হৃদয়ের গীতি এবং দ্বিতীয় সমালোচনায় (ভারতী, ১২৮৯ ভাদ্র) হৃদয়ের সহজ কথা ইত্যাদি উক্তি পাওয়া যায়। আর উভয়ের মধ্যবর্তী এই সমালোচনায় (ভারতী, ১২৮৮ মাঘ) পাই 'হৃদয়ের ছন্দ'। এই সারূপ্য আকস্মিক বলে মনে করা কঠিন। মেঘনাদবধের উক্ত সমালোচনা-দুটির সঙ্গে রাবণবধ-সমালোচনার অন্যবিধ সাদৃশ্যও আছে। এ স্থলে রাবণবধ-সমালোচনার প্রথমাংশ থেকে একটিমাত্র মন্তব্য উদ্‌ধৃত করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।—

> "ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়, যে লক্ষ্মণকে আমরা রামায়ণে শৌর্যের আদর্শ স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম, যে লক্ষ্মণকে আমরা কেবল মাত্র মূর্তিমান্ ভ্রাতৃস্নেহ ও নিঃস্বার্থ উদারতা ও বিনয় বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি সেই লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধকাব্যে একজন ভীরু, স্বার্থপূর্ণ গোঁয়ার মাত্র দেখিলে আমাদের বুকে কি আঘাতই লাগে? কেনই বা তা হইবে না? সুখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ আমাদের প্রাণে সে আঘাত দেন নাই।"

এই মন্তব্য কি অনিবার্যরূপেই ভারতীতে প্রকাশিত মেঘনাদবধের রবীন্দ্রকৃত দুটি বিরূপ সমালোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না? এসব তথ্য বিবেচনায় এ অনুমান করাই সংগত মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথই গিরিশচন্দ্রের উক্ত নাটক-দুটির সমালোচক, রাজকৃষ্ণ কিংবা অন্য কেউ নয়।

এ প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, সন্ধ্যাসংগীতে যে মুক্তবন্ধ হৃদয়ের ছন্দ প্রবর্তিত হয়, প্রভাতসংগীতেও তা অনুবৃত্ত হয়। পরবর্তী কালে 'বন্দী বীর' প্রভৃতি কোনো কোনো কবিতাতেও এই ভাঙা মিত্রাক্ষরের অল্পাধিক প্রয়োগ দেখা যায়। অবশেষে এই মুক্তবন্ধ ছন্দ পূর্ণশক্তিতে প্রযুক্ত হয় বলাকা ও পলাতকা কাব্যে। এই দুই কাব্যের ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'বেড়াভাঙা' পয়ার ('গদ্যছন্দ', পঞ্চম বিভাগ)। মনে রাখা প্রয়োজন, এই বেড়াভাঙা পয়ার প্রথম দেখা দেয় সন্ধ্যাসংগীত কাব্যে লাগাম-ছেঁড়া হৃদয়ের ছন্দ রূপে, আর এই বেড়াভাঙা বা লাগাম-ছেঁড়া হৃদয়ের ছন্দই পরবর্তী কালে পুনশ্চ প্রভৃতি গদ্যকাব্যে আত্মপ্রকাশ করে মাত্রাসংখ্যানিরপেক্ষ ভাবের ছন্দ রূপে।

ভারতীর সমালোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, লেখক অমিত্রাক্ষর 'হৃদয়ের ছন্দের' অর্থাৎ ভাঙা অমিত্রাক্ষরের প্রতিও বিরূপ ছিলেন না। যদি রবীন্দ্রনাথই উক্ত সমালোচনার লেখক হয়ে থাকেন তবে তাঁর রচনাতেও তো এ ছন্দের নিদর্শন থাকা প্রত্যাশিত। সে নিদর্শন আছে মানসী কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটিতে (১৮৮৭ অগ্রহায়ণ)। ভারতীর সমালোচনা থেকে এই কবিতা রচনার কাল খুব দূরবর্তী নয়। লক্ষণীয় বিষয়, এ কবিতার ছন্দ লিরিক-রচনা-সুলভ হৃদয়ভাবেরই অনুগত, নাট্যরচনা-সুলভ 'বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত' নয়। এ কবিতার ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'চোদ্দো-অক্ষরের গণ্ডিভাঙা পয়ার' ('গদ্যছন্দ', পঞ্চম বিভাগ)। তবে এ পয়ার অমিত্রাক্ষর, বলাকা-পলাতকার আঠারো মাত্রার বেড়াভাঙা পয়ারের মতো মিত্রাক্ষর নয়। দুঃখের বিষয় তৎকালীন রবীন্দ্রসাহিত্যে এ-রকম অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ রচনার দৃষ্টান্ত একটির বেশি পাওয়া যায় না।[১]

তবে জীবনের একেবারে শেষ পর্বে রচিত তাঁর অনেকগুলি মুক্তবন্ধ ছন্দের কবিতায় মিল বর্জনের নিদর্শন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'নবজাতক' কাব্যের 'রাত্রি' (১৯৩৯ জুলাই) এবং 'সানাই' কাব্যের 'পরিচয়' (১৯৩৯ জুন), এই দুটি কবিতার নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, জীবনের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক প্রবণতা ছিল 'লাগাম-ছেঁড়া' বা ভাঙা মিত্রাক্ষরের প্রতি। সন্ধ্যাসংগীতেই তার প্রথম প্রকাশ। এজন্যই তিনি বলেছেন—"সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।" এই সাজ ভাঙা মিত্রাক্ষরের সাজ। এ ছন্দ তৎকালে বাজারে চলিত ছিল না, এ কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু এই মুক্তবন্ধ মিত্রাক্ষর ছন্দ যে সন্ধ্যাসংগীতেই প্রথম প্রবর্তিত হল তা নয়। মধুসূদনের গদা ও সদা, সূর্য ও মৈনাক গিরি, মেঘ ও চাতক প্রভৃতি অনেকগুলি নীতিগর্ভ কবিতাতেই এ-জাতীয় ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

১ গণ্ডিভাঙা অমিল পয়ার অর্থাৎ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রসঙ্গে কবি নিজে বলেছেন—"ও-ছন্দের কবিতা আরও রচনা করেছিলুম। কিন্তু সেগুলি আর প্রকাশ করা হয় নি।"—দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন : 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ১৯৪-৯৫ কিংবা 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা', পৃ ২৭৩

'ছবি ও গান' কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ

প্রথম পর্যায়

'ছবি ও গান' কাব্য প্রকাশের তারিখ ১২৯০ ফাল্গুন (১৮৮৪ ফেব্রুআরি)। গ্রন্থের উৎসর্গপত্র ও ভূমিকা ('বিজ্ঞাপন') থেকে জানা যায়, এই কাব্যে সংকলিত মোট ত্রিশটি কবিতার মধ্যে শেষ তিনটি (নিশীথ-জগৎ, নিশীথ-চেতনা ও অভিসার) বাদে বাকি সবগুলি কবিতাই আগের বৎসর (১২৮৯) বসন্ত-কালে রচিত। তার মধ্যে পাঁচটি ১২৯০ সালে (জ্যৈষ্ঠ-পৌষ) ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১]

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের (১৩১৯) 'ছবি ও গান' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "প্রভাতসংগীতে একটা পর্ব শেষ হইয়াছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আর-এক রকম করিয়া শুরু হইল।" এই উক্তি কবির ছন্দ-বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধেও সমভাবে সত্য। ছন্দশিল্পী হিসাবে কবির স্বকীয়তা-প্রকাশের প্রথম পর্ব শুরু হয় সন্ধ্যাসংগীত (১২৮৯ আষাঢ়) পর্যায়ের কবিতা রচনার সময়ে (১২৮৭-৮৮)। প্রভাতসংগীতের (১২৯০ বৈশাখ) কবিতাগুলিও প্রায় সম-কালেরই (১২৮৮-৮৯) রচনা। সন্ধ্যাসংগীতের ন্যায় এই কাব্যেও মুক্তবন্ধ ছন্দ রচনার পালা চলতে থাকে। সুতরাং সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীত রচনার কালকে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথেরা স্বাধীন ছন্দ রচনার প্রথম পর্ব (১২৮৭-৮৯)।

'ছবি ও গান' কাব্যে (রচনাকাল ১২৮৯ বসন্ত) দেখা দেয় স্বাধীন ছন্দ রচনার নূতন প্রচেষ্টা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, রচনাকালের বিচারে ছবি ও গানের পালা প্রথম পর্বের পরবর্তী নয়। কারণ ছবি ও গানের রচনাকাল প্রভাতসংগীত রচনার শেষাংশের (১২৮৯ ফাল্গুন-চৈত্র) সমকালীন। কিন্তু ছন্দশিল্পের বিচারে ছবি ও গানে যে নূতন পর্যায়ের সূত্রপাত হয় তাতে সন্দেহ নেই। এই নূতন ছন্দোরীতির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের পর্বে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাগত ছন্দোবন্ধের সংস্কার ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে ছন্দরচনায় প্রবৃত্ত হন। তখনও তিনি মাত্রা-স্থাপনের পূর্বাগত প্রথা অনুসরণ করেই চলেছিলেন। অথচ তৎকাল-প্রচলিত

১ দ্রষ্টব্য পুলিনবিহারী সেন : 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' প্রথম খণ্ড, ১৩৮০ আষাঢ়, পৃ ১০৬।

মাত্রাস্থাপন-রীতির কৃত্রিমতা সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কৃত "সিন্ধুদূত" কাব্যের সমালোচনায় (১২৯০ শ্রাবণ)। দ্রষ্টব্য "বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ" নিবন্ধের পাঠ-পরিচয়। এই সমালোচনায় বলা হয়েছে—"ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।··· আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই।" এই শেষ কথাটির অর্থ এই যে, পূর্বাগত সাধু ছন্দে আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত শব্দের শেষ হস্ বর্ণটিকে হস্ বলে গণ্য না করে অকারান্ত বলেই গণ্য করা হয়। যেমন, 'মনের কি দোষ আছে'— আমাদের উচ্চারণে মনের ও দোষ শব্দ হসন্ত, অথচ ছন্দের বিচারে ওই শব্দ-দুটির হসন্ত রূপটি অস্বীকৃত হয় ('আমরা হসন্ত শব্দকে আমল দিই না'), অর্থাৎ ওই শব্দ-দুটিকে অকারান্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়। তাই ওই দুই শব্দে যথাক্রমে তিন ও দুই মাত্রা গণনা করা সম্ভব হয়। এভাবে গণনা করা হয় বলেই উক্ত ছত্রটিতে আট মাত্রা পাওয়া যায়। এখানেই ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ ও ছন্দপাঠের বিরোধ। তার মানে বাংলা সাধু ছন্দ ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-অনুযায়ী নয়, অর্থাৎ সে ছন্দ কৃত্রিম। পক্ষান্তরে, রামপ্রসাদের 'মন্ বেচারির্ কি দোষ্ আছে' ছত্রটিতে সর্বত্রই হসন্তের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে, আর ওই মর্যাদা রক্ষা করেই এ ছত্রটিতে আট মাত্রা পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই ছন্দ ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসারেই নিয়মিত। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।"

বিশেষভাবে স্মরণীয় বিষয় এই যে, ভারতীতে (১২৯০ শ্রাবণ) এই অভিমত প্রকাশের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন (১২৮৯ ফাল্গুন-চৈত্র)। এই ছন্দের তৎকালীন কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে 'ছবি ও গান' কাব্যে। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই কাব্যের অন্তর্গত 'স্বাভাবিক ছন্দ' পর্যায়ের একটিমাত্র কবিতাই ভারতীতে প্রকাশিত হয় আর তাও হয় স্বাভাবিক ছন্দ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশের পরের মাসে (১২৯০ ভাদ্র)। কবিতাটির নাম 'কে'। এটি পরে ছবি ও গান কাব্যের প্রথমেই স্থান পায়। এটির একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

সে ঢেউয়ের মতো ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে,
হাসি তার রেখে গেছে রে।
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ঢেউয়ের চাঁদের প্রভৃতি ছয়টি শব্দেই অন্তিম হস্ বর্ণের মর্যাদা হানি করা হয় নি, অর্থাৎ ওগুলিকে অকারান্ত ধরে নিয়ে ছন্দের মাত্রা পূরণ করা হয় নি। একমাত্র ব্যতিক্রম 'তার'। এই শব্দটির র-কে অকারান্ত ধরে নিয়ে তাকে একমাত্রা মূল্য দেওয়া হয়েছে। এইজন্যই ছবি ও গান কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন—"হসন্ত বর্ণকে অকারান্ত করিয়া পড়িলে কোনো কোনো স্থলে ছন্দের ব্যাঘাত হইবে।" এখানে 'অকারান্ত করিয়া পড়িলে' কথার অর্থ— সাধু ছন্দের ভঙ্গিতে শব্দের অন্তিম হস্ বর্ণকে অকারান্ত বলে গণ্য করলে এবং তদনুসারে ছন্দের মাত্রা রক্ষা করলে। ছবি ও গান কাব্যের 'বিরহ' কবিতার দুটি বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি।—

১. ধীরে ধীরে 'প্রভাত' হল, আঁধার মিলায়ে গেল,
উষা হাসে কনকবরণী।

২. বহিছে 'প্রভাত' বায়, আঁচল লুটিয়ে যায়,
মাথায় ঝরিয়ে পড়ে ফুল।

এই দৃষ্টান্তে 'প্রভাত' শব্দের উচ্চারণগত ও মাত্রামূল্যগত পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথম প্রভাত-এর উচ্চারণ স্বাভাবিক, এটির মাত্রামূল্য দুই। আর দ্বিতীয় প্রভাত-এর উচ্চারণ কৃত্রিম, তার মাত্রামূল্য তিন। কারণ প্রথম দৃষ্টান্তে 'প্রভাত' শব্দের হসন্ত-মর্যাদা স্বীকৃত, ফলে ত-এর স্বাতন্ত্র্যও নেই, কোনো মাত্রামূল্যও নেই। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় 'প্রভাত' শব্দকে হসন্ত বলে গণ্য করা হয় নি, অর্থাৎ ত-কে স্বতন্ত্র বর্ণ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং তাকে এক মাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে।

এই হল রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা তখনকার প্রচলিত সংস্কারের অনুরূপ। পরবর্তী কালে তিনি অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে। তদনুসারে স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণে প্রভাত

শব্দের 'ভাত' এই রুদ্ধদলটি সংকুচিত, তাই রামপ্রসাদী (অর্থাৎ প্রাকৃত) ছন্দে 'ভাত' দলটি এক মাত্রার বেশি মূল্য পায় না, পক্ষান্তরে সাধু ছন্দের কৃত্রিম উচ্চারণে 'ভাত' দলটি প্রসারিত হয়, ফলে এ ছন্দে এটিকে দুই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়। উদ্‌ধৃত দুই দৃষ্টান্তে 'প্রভাত' শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্যের প্রতি একটু মনোযোগ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'সাধু ছন্দে হসন্ত শব্দের মাত্রানিরূপণ' -শীর্ষক পত্র (অনুষঙ্গ ২) এবং পাদটীকা।

'ছবি ও গান' কাব্যের অন্ততঃ এগারোটি কবিতায় (কে, দোলা, আদরিনী, খেলা, বিদায়, বিরহ, পাগল, মাতাল, বাদল, আচ্ছন্ন, অভিমানিনী) রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলেই হসন্ত শব্দে রামপ্রসাদী ভঙ্গিতে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসারে ছন্দের মাত্রাসাম্য রক্ষা করেছেন। এইজন্যই তিনি বলেছেন— "কোনো কোনো গানে ছন্দ নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।" তা ছাড়া আরও একটু কারণ আছে। উক্ত এগারোটি কবিতায় তিনি যে সর্বত্র সমভাবে হসন্ত শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়ন্ত্রিত করেছেন তা নয়। বস্তুতঃ অনেক স্থলেই তিনি কাব্যের প্রয়োজন অনুসারে হসন্ত শব্দের কৃত্রিম ও স্বাভাবিক উভয়বিধ উচ্চারণের সমাবেশ ঘটিয়াছেন। উদ্‌ধৃত দুটি পঙ্‌ক্তির প্রতি একটু মন দিলেই তা বোঝা যাবে। একই কবিতায় 'প্রভাত' শব্দের দ্বিবিধ প্রয়োগ লক্ষণীয়। তা ছাড়া, প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই দেখছি 'প্রভাত' শব্দে ধরা হয়েছে দুই মাত্রা, অথচ 'আঁধার' ও 'কনক' শব্দে তিন মাত্রা। 'বিদায়' কবিতা থেকে আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

১. হাত দুটি তার ধ'রে দুই হাতে
মুখের পানে চেয়ে সে রহিল ;
কাননে বকুল-তরুতলে
একটিও সে কথা না কহিল।

২. গভীর রাতে বাতাসটি নেই, নিশীথে সরসীর জলে
কাঁপে না বনের কালো ছায়া ;
ঘুম যেন ঘোমটা-পরা বসে আছে ঝোপে-ঝাপে,
পড়ছে বসে কী যেন এক মায়া।

কোনো বিশেষ ছন্দ-সংস্কারের বশবর্তী না হয়ে এ দুটি অংশ পড়তে হবে

সহজ স্বাভাবিক ভাবে। সহজ উচ্চারণের প্রতি কান রেখে বিচার করলে বোঝা যাবে হসন্ত বা হস্‌মধ্য শব্দের রুদ্ধদলগুলি কোথাও সংকুচিত ও একমাত্রক, কোথাও প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক। এই হিসাবে প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যাবে দশ-দশ মাত্রার দুই পদ আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যাবে আট-আট-দশ মাত্রার তিন পদ। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে-সকল পাঠকের কান আছে তাঁহারা ছন্দ খুঁজিয়া লইবেন, দেখিতে পাইবেন বাঁধাবাঁধি ছন্দ অপেক্ষা তাহা শুনিতে মধুর।" বাঁধাবাঁধি ছন্দ পাঠে মানুষ প্রচলিত সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়। যেখানে বাঁধাবাঁধি ছন্দ থাকে না, সেখানে পাঠককে একমাত্র কানের অর্থাৎ সহজ ধ্বনিরসবোধের উপরে নির্ভর করিতে হয়; তাই এসব স্থলে পাঠকের উপরেই ছন্দ খুঁজে নেবার বরাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সহজ শ্রুতি-বোধ সুলভ নয়। বোধ করি সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে এ-রকম নির্দিষ্ট রীতিহীন ছন্দ রচনার প্রয়াস আর করেন নি, একমাত্র গীতিরচনা ছাড়া।

রচনাবলী-সংস্করণ (১৩৪৬ আশ্বিন) 'ছবি ও গান' কাব্যের ভূমিকাতে কবি মন্তব্য করেছেন, এই কাব্যে ভাবপ্রকাশ— "সহজ হয় নি। কিন্তু সহজ হবার চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্যে চলতি ভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল।" এই যে মেলামেশা, তা শুধু চলতি ও সাধু ভাষার মেলামেশা নয়, চলতি ও সাধু ছন্দের মেলামেশাও বটে। কিন্তু তা সহজ হয় নি, যা হয়েছে তাও হয়েছে 'এলোমেলো' ভাবে। পরবর্তী কালে এই সহজ ছন্দোরীতি যে কবির কানকে তৃপ্ত করতে পারে নি, তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে ছবি ও গান কাব্যের বর্জিত কবিতার তালিকায়। সে সময় ছবি ও গানের যে নয়টি কবিতা বর্জিত হয়, তার মধ্যে সাতটিই (আদরিনী, খেলা, বিদায়, বিরহ[১], মাতাল, বাদল, আচ্ছন্ন) উক্তপ্রকার বাঁধাবাঁধিহীন সহজ ছন্দে রচিত। ছন্দোগত দুর্বলতা যে এই বর্জনের অন্যতম প্রধান কারণ

১ পরবর্তী কালে রচনাবলী সংস্করণে একমাত্র 'বিরহ' কবিতাটি বাদে বাকি ছয়টি কবিতাই গৃহীত হয়েছে।

(একমাত্র না হলেও), তাতে সন্দেহ নেই। যে-সকল পাঠকের কান আছে, তাঁরা আশা করি স্বীকার করবেন যে, অনেকগুলি বর্জিত কবিতাতেই উক্ত সহজ ছন্দ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

দেখা গেল, ছবি ও গানের কয়েকটি কবিতায় কবি সহজ হবার চেষ্টায় এবং ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে সাধু ও প্রাকৃত (রাম-প্রসাদী বা স্বাভাবিক) রীতির ছন্দের মেলামেশা ঘটাতে দ্বিধা করেন নি। এসব ক্ষেত্রে কবি একই কবিতায়, এমন কি, একই পঙ্‌ক্তিতে ছন্দের বিভিন্ন রীতি প্রয়োগের স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। তাই এজাতীয় স্বাধীন ছন্দকে বলতে পারি **স্বৈরবৃত্ত** বা **মুক্তবৃত্ত** (free style) ছন্দ। সন্ধ্যাসংগীত পর্বে কবি একই কবিতায় ছন্দের বিভিন্ন বন্ধ প্রয়োগের স্বাধীনতা নিয়েছিলেন। তাই সেজাতীয় স্বাধীন ছন্দকে বলেছি **স্বৈরবন্ধ** বা **মুক্তবন্ধ** (free form) ছন্দ। ছবি ও গান কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় (যেমন 'পাগল' কবিতায়) উভয়বিধ স্বাধীনতাই সমন্বিত হয়েছে। অর্থাৎ সেসব কবিতা একাধারে মুক্তবৃত্ত ও মুক্তবন্ধ।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ছবি ও গান কাব্যে কবি সোজাসুজি রাম-প্রসাদী (অর্থাৎ লৌকিক) ছন্দের অনুসরণ করেন নি, প্রচলিত সাধু ছন্দের কাঠামোতেই প্রয়োজনমতো বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসারে মাত্রাসমাবেশ করেছেন। ফলে কোনো কোনো কবিতায় সাধুরীতিরই প্রাধান্য, প্রাকৃত রীতি দেখা দিয়েছে মাঝে মাঝে— যেমন 'বিদায়' ও 'প্রভাত' কবিতায়। আর-এক শ্রেণীর কবিতায় প্রাকৃত বা স্বাভাবিক রীতিরই প্রাধান্য, সাধুরীতির প্রয়োগ বিরল— যেমন 'পাগল' ও 'মাতাল' কবিতায়। এই দ্বিতীয় প্রকার স্বাভাবিক ছন্দের সুষ্ঠুতর ও সুগঠিত রূপ দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যে (১৩১৪ আষাঢ়)।[১]

বাংলার স্বাভাবিক ছন্দের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১২৯০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতীতে বলেছিলেন—"ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে"। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি তখনই বাংলা স্বাভাবিক ছন্দ নিয়ে পরীক্ষায় রত ছিলেন। সে পরীক্ষার ফল দেখা গেল কয়েক মাস পরে প্রকাশিত 'ছবি ও

১ দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন : "দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ", উদয়ন ১৩৪০ আশ্বিন।

গান' কাব্যে (১২৯০ ফাল্গুন)। তাতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরিভাবে রামপ্রসাদের অনুসরণ করেন নি ; প্রচলিত সাধু ছন্দেই প্রয়োজনমতো মাঝে মাঝে রামপ্রসাদী রীতিতে ছন্দের মাত্রারক্ষা করেছেন। তারই ফলে উদ্ভূত হল একজাতীয় স্বৈরবৃত্ত বা মুক্তবৃত্ত ছন্দ। কিন্তু এই স্বৈরবৃত্ত রীতি রবীন্দ্রনাথের কানের প্রসন্নতা অর্জন করতে পারে নি। তাই পরবর্তী কালে তিনি এ পথে আর চলেন নি। তবু স্বীকার করতে হবে রবীন্দ্রনাথের এই পরীক্ষা ব্যর্থ হয় নি। কেননা, ছবি ও গান কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় বা কবিতাংশে অবিমিশ্র রামপ্রসাদী ছন্দের এমন অস্খলিত ও বলিষ্ঠ প্রয়োগ দেখা যায় যা এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিকে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পাগল' কবিতার শেষাংশের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই অংশে চলতি ভাষা ও ছন্দ এলোমেলো পদক্ষেপে প্রবেশ করে নি, প্রবেশ করেছে সুবিন্যস্ত ও দৃঢ় পদক্ষেপে। বস্তুতঃ এই অংশটি স্বাভাবিক চলতি ছন্দের একটি নিখুঁত নিদর্শন। এই অংশের প্রথম চার পঙ্‌ক্তি এই—

যেখান দিয়ে যায় সে চলে সেথায় যেন ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে,
ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে
লতায় যেন কুসুম ফোটে ফোটে।
বসন্ত তার সাড়া পেয়ে সখা ব'লে আসে ধেয়ে,
বনে যেন দুইটি বসন্ত।
দুই সখাতে ভেসে চলে যৌবন-সাগরের জলে,
কোথাও যেন নাহি রে তার অন্ত।

এই যে অমিশ্র চলতি রীতির ছন্দ, একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ'। এটাই রামপ্রসাদী ছন্দ। আধুনিক পরিভাষায় একে বলি দলবৃত্ত (syllabic) রীতির ছন্দ। লক্ষ করার বিষয়, 'পাগল' কবিতার শেষ অংশটুকুতে শব্দমধ্যবর্তী বা শব্দান্তস্থিত হস্‌বর্ণকে কোথাও অকারান্ত বলে গণ্য করে মাত্রামূল্য দেওয়া হয় নি। আরও লক্ষণীয় এই যে, ওই অংশটুকু সাধু রীতির ত্রিপদী বন্ধের ছাঁচে ঢালা। শুধু প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদে মিল রাখা হয় নি, বাকি সবটুকু অংশেই পদগত মিল আছে। তাই

বন্ধের বিচারে বলতে হয় 'পাগল' কবিতার উক্ত অংশটুকু দলবৃত্ত ত্রিপদী বন্ধে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, এই দলবৃত্ত বা চলতি রীতির ছন্দ সাধু রীতির ছন্দের চেয়ে 'শুনিতে মধুর'।

রবীন্দ্রনাথ যে ছবি ও গান কাব্যেই দলবৃত্ত ছন্দের প্রথম প্রয়োগ করলেন, তা নয়। তার পূর্বেও তাঁর কোনো কোনো রচনায় (যেমন বাল্মীকিপ্রতিভা বা কালমৃগয়ায়) এ ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়।[১] কিন্তু সেসব রচনা উঁচু সুরে বাঁধা নয়। সেসব রচনায় এ ছন্দকে লৌকিক কায়দায় হালকা ভাবের বাহন করেই রাখা হয়েছিল। এই কাব্যেই প্রথম দেখা গেল বাংলা দেশের এই আটপৌরে লঘু ছন্দকে সুগঠিত রূপ দিয়ে তাকে কবির গভীর অনুভূতি ও উচ্চ ভাবের বাহন হবার মর্যাদা দেওয়া হল। এ হিসাবে এই কাব্যেই পরবর্তী 'খেয়া' প্রভৃতি কাব্যের পূর্বাভাস সূচিত হল। আর, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদের যোগ্যতম উত্তরসূরী।

ছন্দের ইতিহাসে এই হল ছবি ও গান -এর প্রধান গৌরব। তবে মনে রাখা উচিত যে, এই গৌরব এ কাব্যের বিশুদ্ধ দলবৃত্ত ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, নবোদ্‌ভাবিত মুক্তবৃত্ত ছন্দের উপরে নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়

'ছবি ও গান' কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে কবির এই মন্তব্যটুকু হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত একটি পত্রের (১৯৩১ নভেম্বর ১৫। ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ ২৯) প্রাসঙ্গিক অংশ। দ্রষ্টব্য 'চিঠিপত্র' নবম খণ্ড (১৩৭১ বৈশাখ ২৫), ৫৯-সংখ্যক পত্র।

এই পত্রাংশের বক্তব্য দুটি। এক, 'ছবি ও গান' কাব্যের "ভাঙা ছন্দ' আসলে ছন্দঃপতন নয়। অর্থাৎ এ ভাঙা ছন্দ কবির অজ্ঞতা বা অক্ষমতা -জনিত নয়, ইচ্ছাকৃত। কারণ কবি 'বালক-বয়সে স্পর্ধার সঙ্গে বাঁধা ছন্দের শাসন অস্বীকার করেই কবিলীলা শুরু' করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও দু-একটি উক্তি উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে। সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে (১৩৩৮ পৌষ ১১) পাঠের জন্য লিখিত 'প্রতিভাষণে' ('আত্মপরিচয়', পঞ্চম প্রবন্ধ) তাঁর প্রথম বয়সের ছন্দচর্চা সম্বন্ধে তিনি বলেন—

১ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন : 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', ১৩৫২ বৈশাখ, পৃ ১৮-২১।

"আট-অক্ষর ছয়-অক্ষর দশ-অক্ষরের চৌকো চৌকো কত রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশ জনের সামনে।... শুরু হল আমার ভাঙা ছন্দে টুকরো কাব্যের পালা উল্কাবৃষ্টির মতো... এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত।"

'আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া', কবির এই উক্তিও উল্লিখিত বিবরণেরই অনুবৃত্তি।[১] কবির এই ছন্দভাঙার বিশদ পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যাসংগীতের মুক্তবন্ধ এবং ছবি ও গানের মুক্তবৃত্ত ছন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে।

আলোচ্যমান পত্রাংশের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, রীতিভঙ্গের প্রতি মজ্জাগত ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রচলিত ছন্দোবন্ধ বা ছন্দোরীতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করেন নি।

তাই তিনি বলেছেন—"বাঁধনে ধরা দিতে আপত্তি করি নে, যদি ধরা না দেবারও স্বাধীনতা থাকে।" বস্তুতঃ রবীন্দ্রছন্দ-বিবর্তনের প্রতি পর্বেই দেখা যায় এই বাঁধন-পরা ও বাঁধন-খোলার লীলা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'ছন্দভাঙাগড়ার খেলা' দিয়েই তাঁর কবিজীবনের আরম্ভ। তার মানে ভাঙার সঙ্গে গড়ার খেলাও ছিল, আসলে ভেঙে নূতন করে গড়ার খেলা। গড়া না থাকলে শুধু ভাঙায় কখনও খেলা হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাঙা ছন্দের মধ্যেও নূতন ছন্দের পূর্বাভাস নিহিত থাকে। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, এই তিনখানি কাব্যের প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। সন্ধ্যাসংগীতে ছন্দের বন্ধ ভাঙার দিকেই ঝোঁক বেশি, কিন্তু প্রচলিত বন্ধ অনুসরণের কিংবা নূতন বন্ধ গড়ার প্রয়াস যে একেবারেই নেই তা নয়। প্রভাতসংগীতে ছন্দের সুগঠিত বন্ধের প্রতি মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি। তা ছাড়া, এই দুই কাব্যে ছন্দের প্রচলিত বন্ধকেই অগ্রাহ্য করা হয়েছে, মাত্রাবিন্যাসের রীতিকে নয়। এই রীতিলঙ্ঘনের প্রয়াস দেখা গেল 'ছবি ও গান' কাব্যে। আবার এই কাব্যেই এক দিকে মাত্রাস্থাপনের নূতন রীতি

---

১ হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ ২৯), রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব (১৩৩৮ পৌষ ১১) উপলক্ষে রচিত 'প্রতিভাষণ' এবং 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকা (১৩৩৮ পৌষ) খুব কাছাকাছি সময়ের লেখা। তাই এই তিনটি রচনায় ভাষা ও ভাব-গত অনেকখানি সমতা লক্ষিত হয়।

প্রতিষ্ঠার আর অন্য দিকে পূর্বতন বন্ধ অনুসরণের প্রয়াসও স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরবর্তী কালে বলাকা-পলাতকায় যখন মুক্তবন্ধ ছন্দ চরম উৎকর্ষে উপনীত হল, তখনও সঙ্গে সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ছন্দোবন্ধ রচনার ধারা বিরত হয় নি। এমন কি, 'পুনশ্চ' প্রভৃতি কাব্যে যখন গদ্যকবিতা রচনায় প্রতি কবির মন সর্বাধিক নিয়োজিত, তখনও সুসমঞ্জস ছন্দোবন্ধের প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা দেখা যায় নি। এভাবে ছন্দ ভাঙা ও গড়ার দুই ধারা চিরকালই প্রবাহিত হয়েছে সমান্তরাল রেখায়। ছন্দ-ভাঙাগড়ার প্রতি কবির এই সমান আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তাঁর ছন্দশিক্ষা ও ছন্দচর্চার আদিপর্বেই।

মোট কথা, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের ছন্দসমৃদ্ধ কাব্যরচনায় যে অজস্র ছন্দোবন্ধ ও বিভিন্ন ছন্দোরীতির বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়, তার মধ্যে অনেক-গুলিরই প্রাথমিক অঙ্কুরিত রূপ উদ্‌গত হয়েছিল তাঁর কবিজীবনের প্রথম প্রহরেই (১২৮১-৯০। ১৮৭৪-৮৩)।

নির্দেশিকা

মুখবন্ধ

বর্তমান সংস্করণে নির্দেশিকা বিভাগটিকে অধিকতর ব্যবহারোপযোগী করার প্রয়াস করা গেল। প্রথমতঃ, এই বিভাগের আরম্ভেই 'রচনার নাম-সংকলন', 'দৃষ্টান্ত-সংকলন' ও 'উদ্ধৃতি-সংকলন' নামে তিনটি নূতন উপবিভাগ যুক্ত হল। দ্বিতীয়তঃ, পরবর্তী 'শব্দসংকলন' অংশটিকে পূর্ণতর রূপ দিয়ে 'ছন্দ', 'ব্যক্তি ও সাহিত্য' এবং 'বিবিধ' নামে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হল। তবে পারিভাষিক, অপারিভাষিক ও অন্য সর্ববিধ নামশব্দ নির্বিচারে ও নিঃশেষে সংকলন করা এই অংশের লক্ষ্য নয়। এই শব্দসংকলনের লক্ষ্য গ্রন্থখানিকে জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে সুগম ও সহজব্যবহার্য করা— শুধু ছন্দ-গ্রন্থ হিসাবে নয়, সাহিত্য-গ্রন্থ হিসাবেও বটে। কেননা, এই বইএর সাহিত্যমূল্যের দিক্‌টাও উপেক্ষণীয় নয়। এই বই থেকে শুধু যে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তারই পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, অন্য সব বইএর মতো এখানেও তাঁর মনের বিশিষ্টতা ও বিচিত্রগামিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দসংকলনকালে সে দিক্‌টার প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

তবে স্বভাবতঃই এ ক্ষেত্রে ছন্দচিন্তার দিক্‌টাই প্রাধান্য পেয়েছে। তা হলেও ছন্দ-বিষয়ক সব শব্দের সব পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা গেল। কারণ তাতে পাঠকদের বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন, পয়ার প্রভৃতি কতকগুলি বহুব্যবহৃত শব্দের সব পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ পাঠকের পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে করা যায় না। তাই বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রয়োগগত গুরুত্ববিবেচনায় শুধু নির্বাচিত পৃষ্ঠাঙ্কগুলিই উল্লেখ করা গেল। তা ছাড়া, সর্বাধিক গুরুত্বসূচক পৃষ্ঠাঙ্কগুলি মুদ্রিত হল স্থূল লিপিতে। আর, পাদটীকাভুক্ত শব্দগুলি নির্দিষ্ট হল পৃষ্ঠাঙ্কের ঊর্ধ্বকোণে মুদ্রিত পাদটীকার সংখ্যাক্রমসূচক অঙ্কচিহ্নের দ্বারা।

রচনার নাম-সংকলন

দৃষ্টান্ত-সংকলন

এই তালিকাটি একই সঙ্গে গ্রন্থোক্ত দৃষ্টান্তগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়সূচী ও নির্দেশিকা-রূপে পরিকল্পিত। পরিচয়সূচীতে মুখ্যতঃ বাংলা ছন্দের রীতি, ছন্দের হ্রস্বতম যতিবিভাগ (রবীন্দ্র-পরিভাষায় ছন্দের রূঢ়িক উপাদান, চলন, ভূমিকা) এবং স্থলবিশেষে ছন্দোবন্ধের নাম (একপদী, দ্বিপদী, পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী) উল্লিখিত হল। এই উপলক্ষে প্রযুক্ত কয়েকটি সংজ্ঞাশব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ নিয়ে ব্যাখ্যাত হল অতি সংক্ষেপে।

রবীন্দ্রনাথের মতে (পৃ ১১৭) ভাষারীতিভেদে বাংলা ছন্দের রীতি দু-রকম— ১. **সাধু রীতি** : সংস্কৃত বা সাধু বাংলায় প্রচলিত ; ২. **প্রাকৃত রীতি** : প্রাকৃত বা চলতি বাংলায় প্রচলিত। সাধুরীতিরও দুই শাখা— ১. এক শাখায় রুদ্ধদলের (closed syllable-এর) উচ্চারণ অবস্থানির্বিশেষে সর্বত্র বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক ; ২. অন্য শাখায় রুদ্ধদলের উচ্চারণ অবস্থাভেদে কোথাও সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক এবং কোথাও বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক। রবীন্দ্রনাথ এই দুই শাখার কোনো নাম দেন নি। বর্তমান সম্পাদকের মতে এই দুই রীতির নাম যথাক্রমে **কলাবৃত্ত** (moric) ও মিশ্রকলাবৃত্ত, সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত** (composite)। নীচের তালিকায় সাধুরীতির এই দুই শাখার পরিচয়-প্রসঙ্গে 'সাধু' বিশেষণটিকে উহ্য রেখে শুধু কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত নামই প্রয়োগ করা গেল।

এখানে বলা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে (পৃ ১৭২) বাংলা ছন্দের যে তৃতীয় শাখাটির কথা উল্লেখ করেছেন সেটি বস্তুতঃ একটি স্বতন্ত্র শাখা বলে স্বীকার্য নয়। সেটি আসলে সাধু মিশ্রবৃত্ত বা কলাবৃত্ত বর্গেরই অন্তর্গত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও রচনায় এ-জাতীয় ছন্দের প্রয়োগ বড়ো দেখা যায় না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো রচনায় অগ্রজের আদর্শ অনুসরণ করেছেন— তবে কলাবৃত্ত রীতিতে, অগ্রজের ন্যায় মিশ্রবৃত্ত রীতিতে নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে (পৃ ১৬৫) বাংলা ছন্দের আদিম ও রূঢ়িক উপাদান দুই ও তিন মাত্রার বিভাগ। এই বিভাগ অনুসারে তিনি বাংলা সাধুরীতির ছন্দকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— সম চলনের (দুই মাত্রার) ছন্দ, অসম চলনের (তিন মাত্রার) ছন্দ এবং বিষম চলনের (দুই-তিনের মিলিত মাত্রার) ছন্দ

(পৃ ৩৭, ৫৫)। অসম ও বিষম চলনের সব ছন্দই রচিত হয় কলাবৃত্ত রীতিতে (পৃ ১১৯), আর সমচলনের সব ছন্দ কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত উভয় রীতিতেই রচিত হয় (পৃ ১১৮)। পয়ার (৮+৬) ও মহাপয়ার (৮+১০) সম চলনের ছন্দ। তাই এই দুই ছন্দোবন্ধের কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত, এই দুই রূপই দেখা যায়।

প্রাকৃত রীতির ছন্দের মূল উপাদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমতে কিছু অনিশ্চয়তা দেখা যায়। কারণ তাঁর মতে (পৃ ১৮১) এই রীতিতে মূল বিভাগের বা চলনের 'মাপ' দুই দলমাত্রা (syllabic unit) হলেও তার 'ওজন' অর্থাৎ ধ্বনিপরিমাণ তিন কলামাত্রা (moric unit)। কিন্তু এ-জাতীয় ছন্দের বিশ্লেষণকালে তিনি কখনও প্রাধান্য দিয়েছেন দুই মাত্রার মাপকে, কখনও তিন মাত্রার ওজনকে। বর্তমান সম্পাদকের মতে প্রাকৃত রীতির ছন্দে দলমাত্রার মাপটাই প্রধান, ধ্বনিপরিমাণগত ওজনের হিসাব নিষ্প্রয়োজন। তাই যেসব স্থলে রবীন্দ্রনাথ দুই মাত্রার মাপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সেসব স্থলে এ রীতিকে **দলবৃত্ত** (syllabic) নামে নির্দেশ করা গেল, অন্যত্র এ রীতির ছন্দ আখ্যাত হল **প্রাকৃত ত্রৈমাত্রিক** নামে (পৃ ১৯৩)।

যেসব দৃষ্টান্তের ছন্দোগত বা বিশ্লেষণগত কোনো গুরুত্ব লক্ষিত হয় সেগুলির নির্দেশক পৃষ্ঠাঙ্কগুলি স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত হল।

---

১ এই দৃষ্টান্তটিকে 'নদীতীরে | দুই কূলে | কূলে' রূপেও (অর্থাৎ সমচলনের ভঙ্গিতেও) পড়া যায়। আর বোধ হয় এরূপ পাঠের প্রতিই এই দৃষ্টান্তটির প্রবণতা কিছু বেশি। তুলনীয়: 'বারে বারে যায়'।

১ লক্ষণীয় : এখানে 'বিংশতি' শব্দে ধরা হয়েছে চার মাত্রা, যদিও মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এই শব্দে তিন মাত্রা গণনাই প্রত্যাশিত। পরবর্তী 'শৃঙ্খলে' শব্দে কিন্তু যথারীতি তিন মাত্রাই ধরা হয়েছে।

২ এই দৃষ্টান্তটিকে ৩+৬ মাত্রায় ভাগ করার চেয়ে ৩+৪ | ২ মাত্রায় ভাগ করা অধিকতর সংগত বলে বোধ হয়।

১ পরবর্তী 'বারি ঝরে' ও 'মন্দ মন্দ' ইত্যাদি দুটি রূপান্তর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে এই ছড়াটি প্রাকৃতরীতির (দলবৃত্ত) পয়ার বলেই স্বীকৃত হয়েছে।

১ এই দুটি পঙ্‌ক্তি 'কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার' ইত্যাদি গানটি (গীতবিতান, প্রেম) থেকে গৃহীত। পাঠভেদ : গানে আছে 'তোমার', কিন্তু এখানে আছে 'আমার'।

২ এই পঙ্‌ক্তিটি ধ্বনিভারহীন মিশ্রবৃত্তরূপেই পরিকল্পিত। প্রমাণ, পরবর্তী 'চৈতন্য নিমগ্ন হল' ইত্যাদি তার ধ্বনিভারময় প্রতিরূপটি। অন্যথায় এই পঙ্‌ক্তিটিকে কলাবৃত্ত বলাই সংগত হত।

১ 'রাজা শব্দের এক কলামাত্রা কম আছে। এই দৃষ্টান্তের শেষাংশে ('শমন-ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম') প্রতি পর্বেই আছে পুরো ছয় মাত্রা। রবীন্দ্রনাথ এই পঙ্‌ক্তিটিকে 'সাধু ভাষায়' রচিত বলেই ধরে নিয়েছেন। সে হিসাবেই 'রাজা' শব্দে এক কলামাত্রা কম। বস্তুতঃ এটিকে 'বাংলা প্রাকৃত ভাষায়' (অর্থাৎ দলবৃত্ত রীতিতে) রচিত বলেও ধরা যায়। তা হলে 'রাজা' শব্দের মাত্রা (অবশ্য দলমাত্রা) কম আছে বলারও প্রয়োজন হয় না।

১ এই পঙ্‌ক্তিটি কলাবৃত্ত রীতিতে পড়লে পর্বগত সমতা থাকে না, প্রথম পর্বে মাত্রাবৃদ্ধি দোষ ঘটে। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে পড়লেও পর্বের মাপে সমতা থাকে না, প্রথম পর্বেই ঘটে মাত্রাহানি দোষ। 'হৃৎপটে আঁকা' লিখলে কলাবৃত্ত রীতিতে ছন্দ ঠিক থাকে, আর মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছন্দ ঠিক থাকে 'হৃৎপত্রে এঁকেছি' লিখলে।

উদ্‌ধৃতি-সংকলন

শব্দ-সংকলন

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার বিশিষ্টতা ও বিচিত্রতার কথা মনে রেখে এই অংশটুকু একাধারে সটীক নির্দেশিকা ও পরিভাষাকোষ (glossary) রূপে পরিকল্পিত হল। তাই সর্বত্র সমভাবে বর্ণক্রম অনুসরণ না করে শ্রেণীবদ্ধভাবে বিষয়-বিন্যাসের নীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আর কোনো কোনো বিষয়কে অনিবার্যরূপেই প্রসঙ্গভেদে একাধিক শ্রেণীতে স্থান দিতে হয়েছে। আশা করি এই মিশ্রনীতি অনুসরণের ফলে নিষ্ঠাবান্ পাঠক ও গবেষকের পক্ষে গ্রন্থকারের বিবর্তমান চিন্তাধারা অনুধাবন সহজতর হবে। দ্রুতবোধের সহায়তাকল্পে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বসূচক পৃষ্ঠাঙ্কগুলি স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত হল। রবীন্দ্র-প্রযুক্ত বিশেষ সংজ্ঞাশব্দগুলি তারকাচিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট হল। আর সম্পাদক-প্রযুক্ত কয়েকটি সংজ্ঞাশব্দ নির্দিষ্ট হল ছুরিকাচিহ্নের দ্বারা। সংকেত : দ্র = দ্রষ্টব্য, তু = তুলনীয়।

১ 'কলা' শব্দের আসল অর্থ অংশ (part), সাধারণতঃ অতি ক্ষুদ্র (minute) অংশ বা কণা (particle)। ছন্দ-পরিভাষায় উচ্চারিত ধ্বনির ক্ষুদ্রতম অংশ, অর্থাৎ একটি হ্রস্বস্বরের সমপরিমাণ ধ্বনি (mora)। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে একমাত্র কলা-ই ছন্দের মাত্রা (unit of measure) রূপে প্রযুক্ত হয়। তাই কলা ও মাত্রা অভিন্নার্থক শব্দ, অর্থাৎ পরস্পরের প্রতিশব্দ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

২ বাংলা ছন্দ-রচনায় কলা ও দল, এই দু-রকম মাত্রার প্রয়োগ দেখা যায়। তাই বাংলায় 'কলা' শব্দকে 'মাত্রা'-র প্রতিশব্দ বলে গ্রহণ করা যায় না। অর্থাৎ বাংলায় কলামাত্রা ও দলমাত্রা, এই দু-রকম মাত্রা স্বীকার করা আবশ্যক।

৩ রবীন্দ্রনাথ 'কলা' শব্দটিকে উচ্চারিত ধ্বনির ক্ষুদ্রাংশ অর্থে প্রয়োগ না করে ছন্দ-পঙ্‌ক্তির ক্ষুদ্র যতিবিভাগ অর্থাৎ উপপর্ব বা পর্ব অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আর কারও লেখায় এই অর্থে 'কলা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না।

১ ঝুল্লণা ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে অনুসারে এ ছন্দের প্রতি দলে থাকে ৩৭ মাত্রা : বিন্যাসক্রম ১০+১০+১৭ এবং অনুরূপ ছুটিমাত্র দল (টীকাকারের ভাষায় 'দলঘর') নিয়ে এ ছন্দ গঠিত হয়। তাই স্বভাবতঃই দল বলতে এখানে শ্লোকের অর্ধাংশ বোঝায়। দ্র দল (প্রাচীন) ও দণ্ডকল শব্দের পাদটীকা।

১ দ্রষ্টব্য : একতালা, কাওয়ালি, চৌতাল, ঝাঁপতাল, দাদরা, ধামার।

২ দণ্ডকল ছন্দের সংজ্ঞাসূত্র অনুসারে এ ছন্দের প্রতি দলে (টীকাকারের ভাষায় প্রতি'পাদে') থাকে ৩২ মাত্রা (বিন্যাসক্রম অনুল্লিখিত) এবং চার দল নিয়ে গঠিত এ ছন্দের শ্লোকবন্ধে থাকে মোট ১২৮ মাত্রা। তাই সহজেই বোঝা যায়, দল বলতে এখানে বোঝায় শ্লোকের চতুর্থাংশ,—অর্ধাংশ নয়। দ্র দল (প্রাচন) ও ঝুলণা শব্দের পাদটীকা।

১ 'দল' শব্দের ধাতুগত মুখ্য অর্থ অংশ, খণ্ড, বিভাগ। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে 'দল' শব্দটি ব্যবহৃত হয় পূর্ণযতি-সূচিত শ্লোকাংশ (অর্ধাংশ বা চতুর্থাংশ) অর্থাৎ ছন্দের পাদ বা পঙ্‌ক্তি অর্থে। যেমন— ঝুল্লণা ছন্দে দুই দল, তাই এ ছন্দের দল মানে শ্লোকের অর্ধাংশ ; কিন্তু দণ্ডকল ছন্দে দল আছে চারটি, তাই এ ছন্দের প্রসঙ্গে দল মানে শ্লোকের চতুর্থাংশ। অর্থাৎ ঝুল্লণা ছন্দ দ্বিদল আর দণ্ডকল চতুর্দল। তাই বৈদিক গায়ত্রী ছন্দকেও ত্রিদল বলে বর্ণনা করতে কোনো বাধা নেই।

দ্র ঝুল্লণা ও দণ্ডকল শব্দের পাদটীকা।

২ বাংলা ছন্দ-আলোচনায় দল শব্দটি তার ধাতুগত অর্থ অনুসারেই স্বাভাবিক উচ্চারণ-সূচিত শব্দাংশ অর্থাৎ সিলেব্‌ল্ অর্থে প্রযুক্ত হয়। তাই বিন্‌. দু, শক্‌. তি. মান্ ও পু. রস্‌. কৃ. ত শব্দকে যথাক্রমে দ্বিদল, ত্রিদল ও চতুর্দল শব্দ বলে বর্ণনা করা যায়। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন : "সিলেব্‌ল্‌কে 'দল' বলি কেন ?" শীর্ষক প্রবন্ধ, সাপ্তাহিক 'অমৃত', ১৩৮২ ভাদ্র ১২ ও ১৯।

১। দ্রষ্টব্য : অবয়ব, চরণ, চাল, পদ, প্রদক্ষিণ, long division।

১ দ্রষ্টব্য : কলা, গণ, চলন, ধ্বনিগুচ্ছ, পদক্ষেপ, ভাগ, যতিবিভাগ, সংঘটন, bar, short division, sound group

১ দ্রষ্টব্য : ছেদ, ফাঁক ৩, বিচ্ছেদ, বিরতি, বিরাম, বিশ্রাম।

১ দ্রষ্টব্য : প্রবোধচন্দ্র সেন -প্রণীত 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ (১৩৮১), পৃষ্ঠা ৪৫১-৫২

ব্যক্তি ও সাহিত্য

১. প্রাচীন চৈনিক কবি য়ুয়ান চেন রচিত একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। এই অনুবাদটি আর্থার ওয়ালে প্রণীত *Chinese Poems*-নামক সঙ্কলনগ্রন্থেও (George Allen & Unwin Ltd, প্রকাশিত, ১৯৪৬) স্থান পেয়েছে : পৃ ১৯২।

পত্রিকা

বিবিধ

—